সর্বনাশিনী
সায়ন্তনী পূততুণ্ড

আবেদন

নুক্, কিন্ডেল, কবো বা ট্যাব ছাড়া ই-বই পড়ার অদম্য আগ্রহ থেকেই এই ইপাব তৈরি যা খুব সহজেই হাতের স্মার্টফোনে যে কোন অবসরেই পড়ে ফেলা যায়। আলাদা করে ই-বুক রিডার কেনার কোন প্রয়োজন নেই বা পিডিএফের মত জুম করে ডান-বা দিকে সরিয়ে পড়ারও দরকার নেই।

কিন্তু অন্তর্জালে পছন্দের বাংলা বইয়ের পিডিএফ যাও বা পাওয়া যায়, ইপাব অপ্রতুল। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও প্রচারের জন্য তাই নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় (ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টুইটার, লিঙ্কডইন ইত্যাদিতে) এই ইপাব ছড়িয়ে দিতে হবে।

প্রচ্ছদ, প্রকাশনা, উৎসর্গ ও ভূমিকা (যদি কিছু থাকে) ইত্যাদি প্রথমদিকের পাতাগুলো দেখতে না পেলে ঠিক বই বই ভাবতে অসুবিধা হয়, তাই তথাকথিত এই অপ্রাসঙ্গিক পাতাগুলিও রাখা হয়েছে।

অন্তর্জাল থেকে পছন্দের বইয়ের পিডিএফ নামিয়ে টেক্সটে রূপান্তরিত করা- এ কাজে ভি-ফ্ল্যাটের এখনো কোন জুড়ি নেই। এবার একে ওয়ার্ড বা অন্য কিছুতে এডিট করে ক্যালিবার এর সাহায্যে ইপাব। এটাই সহজ পদ্ধতি।।

ভি-ফ্ল্যাটের সাহায্যে পিডিএফ থেকে তৈরি, ভুল থাকলে জানান। বইটির বিষয়বস্তু ইন্টারনেটের বিভিন্ন ওয়েবসাইটে প্রকাশ্যেই উপলব্ধ। সমালোচনা, মন্তব্য, প্রতিবেদন, শিক্ষাদান, বৃত্তি এবং গবেষণার মতো অলাভজনক শিক্ষামূলক বা ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য, বাণিজ্যিকভাবে বিতরণের জন্য কখনোই নয়।

সর্বনাশিনী
সায়ন্তনী পূততুণ্ড

(এক)

কিছু কিছু রাত অত্যন্ত অভিজাত। শান্ত, সুগন্ধী। নিস্তরঙ্গ নৈঃশব্দের চাদর গায়ে দিয়ে নীরবে ঘুমিয়ে থাকে। কখনও কখনও অবশ্য মুখচোরা বৃষ্টি রিমঝিম করে ভিজিয়ে দেয় তার অন্ধকার বুক। তখন সেই নির্লিপ্ত বুকে অনেকরকম শব্দ ও গন্ধের আস্বাদ পাওয়া যায়। কখনও দ্রিমিদ্রিমি মাদল বাজে, কখনও জলতরঙ্গের মিষ্টি ঝঙ্কার বেজে ওঠে। অন্ধকারের ভেতরেই মাটির সোঁদা গন্ধ আর ভেজা ঘাসের সৌরভ ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে। এক অব্যক্ত আঁধার প্রেমিকের মতো পরম আদরে বুকে জড়িয়ে ধরে বৃষ্টিকে। চারিদিকে শুধু টুপটাপ, রিমঝিমের মূর্ছনা চলতে থাকে।

আবার কিছু রাত স্বভাবতই বন্য প্রকৃতির। সেখানে আলো-আঁধারির বিপজ্জনক খেলা চলতে থাকে। কিছুটা প্রকাশ্য, কিছু অপ্রকাশ্য। বৃষ্টিপাত হলেও তা অত্যন্ত দুর্দম, দুর্দান্ত। সেখানে প্রেমিকের আদরের মতো রোম্যান্টিসিজম নেই বরং রিরংসার আদিম আগুন উদ্ধত লেলিহান শিখায় দাউদাউ করে জ্বলছে। সেখানেও শব্দ আছে, কিন্তু তা সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী! সে শব্দ প্রাণে আরাম দেয় না, চূড়ান্ত দহনে জ্বালিয়ে মারে।

ঠিক তেমনই কিছু শব্দ এখন এই ঘর থেকে ভেসে আসছে। নরম সাদা ধবধবে বিছানাটা থেকে-থেকে যেন শিউরে-শিউরে উঠছে। মাঝে-মধ্যেই একটা প্রবল শীৎকার বিপজ্জনকভাবে কর্ণেন্দ্রিয়কে উত্তেজিত করে তুলছে। ঘন নিঃশ্বাসের শব্দ এতটাই আক্রমণাত্মক যে মনে হয়, দুটো কালান্তক প্রাগৈতিহাসিক সরীসৃপ বুঝি পরস্পরকে আক্রমণ করেছে। পারলে গিলেই খাবে! দুটো নগ্ন শরীর নীল আলোর আভায় মিলেমিশে যাচ্ছে প্রেমে কিংবা যুদ্ধে!

ঘরের একপাশে একটা টেবিলের ওপরে পাতা আছে দাবার ছক। নরম নীলাভ আলোর মোহময়ী রেখা চেসবোর্ডের সাদা কালো মসৃণ খোপের ওপর পড়েই পিছলে যাচ্ছে। সাদা-কালো ঘুঁটিগুলো স্বল্প অথচ মোলায়েম আলো পেয়ে চিকচিকিয়ে উঠছে! খেলা এখনও শেষ হয়নি। ঘুঁটিগুলো অমীমাংসিত, অবিন্যস্তভাবেই পড়ে রয়েছে।

কিন্তু দৃশ্যটা ভারী অদ্ভুত! একটা অত্যন্ত বিপজ্জনক মুহূর্তে এসে স্থগিত হয়েছে খেলাটা! বিপদটা অবশ্য খুব সহজে চোখে পড়ে না। তবে একটু খুঁটিয়ে দেখলেই বোঝা যায় যে সাদা রঙের রাজার অজান্তেই বিপজ্জনকভাবে তার দিকে এগিয়ে আসছে কালো রঙের রানি! সাদা ঘোড়া, হাতি অন্যান্যদিকে আক্রমণ করতে ও ঠেকাতে এতটাই ব্যস্ত যে তাদের নজরেই পড়েনি যে রাজা অরক্ষিত ও বিপন্ন!

ওদিকে বিছানায় রাজা প্রায় রানিকে আদরে আদরে বিধ্বস্ত করে তুলছে। রানিও হার মানবে না। একের পর এক লাভ বাইটে অস্থির পুরুষ। দাবার মতোন এই খেলাটাও এখনও অমীমাংসিত। কে জিতবে বোঝা মুশকিল! পুরুষটি যতই নারীর ওপরে কব্জা করতে চাইছে, নারীটি মোহিনী অথচ কামাতুর হাসি হেসে অধরা রহস্যের মতো পিছলে যাচ্ছে। তার শীৎকারের শব্দ, খিলখিল হাসি ঘনিয়ে আসা সর্বনাশের অশনি সঙ্কেত দেয়। পুরুষটি সবলে তাকে দমন করার চেষ্টা করে। কিন্তু এ নারী অবদমিত হতে জানে না! সে সপাটে একটা মোচড় দিয়ে উঠে বসেছে পুরুষের ওপর! রাজা নয়, রানিই এ খেলার চালিকাশক্তি! সেটা এই বুভুক্ষু পুরুষটাকে বোঝানো দরকার।

নারীটি শাণিত দৃষ্টিতে অপলকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে পুরুষটির দিকে! এই মুহূর্তে কী অসহায় লাগছে লোকটাকে! একটা বেঢপ ভুঁড়িওয়ালা থলথলে মাংসপিণ্ড ছাড়া ওকে আর কিছু বলা যায় না। বিবস্ত্র পুরুষ এত কুৎসিতও হতে পারে! এখন কুতকুতে চোখে ভীষণ কামনার আর্তি নিয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে। দেখলেই ঘেন্না করে! চেহারার মতো লোকটার স্বভাবটাও অত্যন্ত কুৎসিত! মেয়ে দেখলেই কামড়াতে আসে। মেয়ে মানেই যেন মাংস! ভোগ্যবস্তু! এরা এমনই হয়! এরা চিরকালই এমন! “প্লিজ বে-বি!”

লোকটা কাতরে উঠল। মেয়েটি জানে ও আর বেশিক্ষণ নিজেকে ধরে রাখতে পারবে না। ওর সে ক্ষমতাই নেই। চাইলে এখনই পরিতৃপ্ত করতে পারে পুরুষটিকে। বৃষ্টির মতো ঝরে পড়ে মিটিয়ে দিতে পারে সব তৃষ্ণা। কিন্তু করবে না। ওকে বুঝতে হবে যে দাবার ছকে কালো রানি চিরদিনই সাদা রাজার চেয়ে শক্তিশালী! গায়ে অসুরের মতো জোর থাকলেই সব যুদ্ধ জেতা যায় না।

মেয়েটি হেসে উঠে তার নরম ঠোঁট লোকটির পুরু ঠোঁটের ওপরে নামিয়ে আনল। একটা সুদীর্ঘ চুম্বন! তার সাপের মতো বিস্রস্ত কোঁকড়া কোঁকড়া সুগন্ধী চুল কিছুক্ষণের জন্য ঢেকে দিল লোকটার মুখ। রোমশ হাত দুটো খেলে বেড়াচ্ছে পেলব, মসৃণ দেহের বিপজ্জনক ভাঁজগুলোয়। কোমল পিঠের ওপরে প্রবল চাপ অনুভব করল মেয়ে। সে একটুও বিচলিত না হয়ে আস্তে আস্তে গ্রাস করতে লাগল কঠিন পৌরুষকে। অদ্ভুত একটা দুলুনি! যেন একটা বেসামাল জাহাজ সমুদ্রের দুরন্ত ধাক্কায় থেকে থেকে দুলে উঠছে। একটা জ্বালা শরীর থেকে ক্রমাগত মনের দিকে যাচ্ছে। নারী অগ্নিগর্ভা! পুরুষ অধৈর্য! এখন তার রিক্ত হওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে। ক্রমাগতই দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হচ্ছে সে!

অথচ মেয়েটি তাকে কিছুতেই সম্পূর্ণ গ্রহণ করছে না। অজগর যেমন শিকারকে সযত্নে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরে একটু একটু করে তার জীবনীশক্তি ও সমস্ত লড়াই শেষ করতে থাকে— এবং অবশেষে শিকার যখন চরম যন্ত্রণায় মৃত্যু প্রার্থনা করছে, তখন অল্প অল্প করে গিলতে শুরু করে, অবিকল ঠিক তেমনই করছে সে! রমণের সৌন্দর্যের পাশাপাশি প্রতিটা পদক্ষেপের যন্ত্রণাও বুঝিয়ে দিচ্ছে।

"কাম্ অন্ হানি!" অধৈর্য মানুষটা স্খলিত স্বরে বলে, "এবার তো এসো।" মেয়েটা ফের হেসে উঠল। মেঝের ওপর ঝনঝনিয়ে বুঝি আছড়ে পড়ল বেলোয়ারি ঝাড়। হাসির মধ্যে সুর আর মাদকতার মাত্রা প্রবল।

আবার দুলুনিটা ফিরে এল। আরও প্রবলভাবে। আবেগে, অসহায়তায় চোখ বুজল পুরুষ। দুলছে সে! সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে পড়া জাহাজের মতো কাঁপছে। আস্তে আস্তে সব কিছু ঝাপসা হয়ে আসছে একটু একটু করে। চেতনা প্রায় শেষ বিন্দুতে গিয়ে ঠেকেছে। আর নিয়ন্ত্রণে নেই সে। বেসামাল ঘোড়ার মতো হৃৎপিণ্ডটা দামাল হয়ে উঠেছে! সমস্ত সংসার লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে একটু একটু করে!

পুরুষটি লক্ষ্যও করেনি মেয়েটির ঠোঁটে একটা তীক্ষ্ণ হাসি ভেসে উঠল। কী ভীষণ নিষ্ঠুর সে হাসি! যে কথাটা অসমাপ্ত খেলার শেষে বলা উচিত ছিল, এই মুহূর্তে সেটাই বলল সে। আস্তে আস্তে নাগিনীর মতো হিসহিসিয়ে উচ্চারণ করল,

– "চেকমেট!"

মেয়েটার চোখে হিংস্র উল্লাস নেচে ওঠে। সে জানে চেসবোর্ডের খেলা শেষ হোক বা না হোক, এবার এই খেলাটা শেষ হবে! গত তিনমাস ধরে এই খেলা চলছিল। এবার তার অন্তিমপর্ব। বোকা পুরুষটা জানে না দাবায় সবচেয়ে শক্তিশালী ঘুঁটিটি রাজা নয়! রানি! আর একটু পরেই নিজের চোখের সামনে নিজেরই প্রেমিককে তিলে তিলে মরতে দেখবে সে! এই নিয়ে তৃতীয়বার!

অন্ধকার চৌখুপি ঘরে মাথা নীচু করে বসেছিল লোকটা।

ওর একেবারে মাথার ওপরে টিমটিম করে জ্বলছে বাল্ব। তাতে মানুষটার শীর্ণকায় চেহারাটা আলো-ছায়ায় মাখামাখি হয়ে আরও পাংশুটে হয়ে গিয়েছে। একেবারে টিপিক্যাল শুকনো ছুঁচো মার্কা চেহারা। ছোটখাট নুয়ে পড়া দেহ! দু পাশে ঝোলা গোঁফ এখন আরও বেশি ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে ঝুলে পড়েছে। হাত-পা কাঠি কাঠি! সবচেয়ে ভয়ঙ্কর তার গাত্রবর্ণ! দুনিয়ায় অনেক কালো মানুষ আছে, কিন্তু এরকম বিতিকিচ্ছিরি রকমের কালো খুব কমই দেখা যায়। চামড়া নয়, প্রাচীন বাড়ির স্যাৎলা পড়া, নোনাধরা দেওয়াল! মানুষ নয়, মানুষের প্রেতাত্মা! এই মুহূর্তে ওকে দেখলে কেউ বলবে, যে এই লোকটাই গত কয়েকমাস ধরে তিলোত্তমার বুকে ত্রাস হয়ে ঘুরছিল!

এই অতি সাধারণ দর্শন, লো প্রোফাইলের মানুষটি এখনও পর্যন্ত প্রায় হাফ-ডজন রেপ-মার্ডার করেছে এবং কাজ সারার পর প্রত্যেকবার ভিকটিমের মুখ অ্যাসিড দিয়ে পুড়িয়ে দিত সে। পুলিশ রীতিমতো ল্যাজে-গোবরে হয়ে শেষমেষ কেসটা সি.আই.ডি'কে দিয়ে দিয়েছিল। অনেক হাঙ্গামার পর শেষপর্যন্ত এই সাইকোটিকে বাগে এনেছে সি.আই.ডি, হোমিসাইড। কিন্তু কিছুতেই পাওয়া যাচ্ছে না তার স্বীকারোক্তি! এই হাড়-পাঁজরা সর্বস্ব ক্রিমিনালের মধ্যে যে এত শক্তি আছে তা কে জানত! একেবারে বজ্র-কঠিন শক্তিতে মুখ এঁটে বসে আছে সে। প্রচুর কচুয়া ধোলাইয়ের পরও মুখ খোলার নাম নেই!

বাইরে হঠাৎই পুলিস বুটের ভারী শব্দ! একাধিক ভারী জুতো দ্রুত এবং সাবলীল ছন্দে এদিকেই হেঁটে আসছে। লোহার দরজাটা আচমকা খুলে যাওয়ার সজোর আওয়াজে সচকিত হয়ে মুখ তুলে তাকাল সে। এতক্ষণ ধরে এই শব্দটা শুনে শুনে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। তবু কৌতূহলবশতই চোখ কুঁচকে দেখার চেষ্টা করল অতিথিদের। এখন তার ওপর হাত সাফ করতে আবার নতুন কে এল!

"স্যার, ভীষণ মোটা চামড়া এটার।" একটা কণ্ঠস্বর সজোরে বলে ওঠে,—"পিটিয়ে পিটিয়ে পেটাই পরোটা বানিয়ে দিয়েছি। তবু মুখ খুলছে না! অসম্ভব নির্লজ্জ পাবলিক!"

এইবার আগন্তুকরা আলোর তলায় এসে দাঁড়াল। এদের মধ্যে দু'জনকে সে আক্ষরিক অর্থেই হাড়ে হাড়ে চেনে। কারণ এতক্ষণ ধরে এরাই তার হাড় ভাঙার তাল করছিল। বাকি দু'জনের মধ্যেও একজনের মুখ চেনা। লম্বা চেহারার ফর্সা সুদর্শন যুবকটিই তাকে গ্রেফতার করেছে। কিন্তু পাশের জন!

ও কী মানুষ...! না অপূর্ব সুন্দর একটা মূর্তি!

একজোড়া তীক্ষ্ণ চোখ তাকে ভালোভাবে মেপে নিল। কানে এল মোলায়েম অথচ উষ্ণ, গম্ভীর কণ্ঠস্বর, "এ কী! পুরো বেগুনপোড়া বানিয়ে ফেললে যে! মারের চোটে ওর সারা গায়ে কালশিটে পড়ে গেছে নাকি!"

—"কালশিটে নয়।' ফর্সা চেহারার সুদর্শন অফিসার হেসে ফেলেছে। হাসতে হাসতেই বলল, "অরিজিনাল কমপ্লেকশন স্যার। একদম হলমার্ক!"

—"অরিজিনাল বলছ?" গম্ভীর কণ্ঠ অবিচলিত ভাবেই বলে, "একটু অ্যাসিড টেস্ট করে দেখা যাক?"

ইঙ্গিতটা বুঝে নিয়ে বলল অফিসারটি—"নিয়ে আসব?"

— "একদম। ল্যাব থেকে একদম নির্ভেজাল জিনিস নিয়ে এসো অর্ণব। ডঃ চ্যাটার্জীকে বলাই আছে! জাস্ট বললেই ক্রেটটা দিয়ে দেবেন। ওর অ্যাসিডটা তেমন জোরাল ছিল না! ভিকটিমের শুধু মুখই পুড়েছে। আর বিশেষ কিছু হয়নি। আসল অ্যাসিড কাকে বলে সেটাও ওর দেখা উচিত।"

"ওকে স্যার।"

ফর্সা অফিসার, তথা অর্ণব মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল। সম্ভবত হুকুম তামিল করতেই গেল। বাকিদের তথাকথিত 'স্যার' একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়লেন লোকটার সামনে। অন্য দু'জন তার পেছনে সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে আছে। আসামীর দিকে কিছুক্ষণ একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে বুকপকেট থেকে বের করে আনলেন সিগারেটের প্যাকেট। নিজে একটা স্টিক তুলে নিয়ে প্যাকেটটা এগিয়ে দিলেন ওর দিকে। ফের সেই শান্ত, সান্দ্র কণ্ঠস্বর শুনতে পেল সে, – "নিবি?"

কোনোমতে মাথা নেড়ে "না" বলল লোকটা। অ্যাসিড শব্দটা শুনেই ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়েছে। এরা কি তার ওপরে অ্যাসিড ঢালবে নাকি! এতদিন সে সুন্দরী মেয়েদের মুখের ওপর অ্যাসিড ঢেলে চরম আনন্দ পেয়েছে। মনে মনে বলেছে, "পোড়, মাগী পোড়! সুন্দর মুখের জন্য এত নখরা! এবার পোড়া মুখ নিয়ে নরকে যা!"

কিন্তু এবার কি তবে তারই পোড়ার পালা! সে অবশ্য মেয়েগুলোকে মারার পর অ্যাসিড ঢেলেছিল। এরা তাকে জীবন্তই পোড়াবে না তো!...

বুকের মধ্যে ভয় আঁচড় কাটছে। রীতিমতো ঘেমে নেয়ে একসা হচ্ছে সে! তবু সামনে বসে থাকা মানুষটার দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছিল না! চোখ ফেরানো যায় না! এই হচ্ছে পুরুষ! এই হচ্ছে যৌবন! যৌবনের ঔদ্ধত্য, উল্লাস যেন ফেটে পড়ছে। যখন ও সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল, তখন মনে হচ্ছিল আর্ট গ্যালারিতে যে মূর্তিগুলোকে দেখে সাহেব-মেমরা আহ্লাদে গলে যায়, সেই মূর্তিই বুঝি জ্যান্ত হয়ে এসে দাঁড়াল! লোকে বলে ভগবানের হাতে নাকি বিশেষ সময় নেই। নিজের চেহারা বারবার আয়নায় দেখে তারও ধারণা তেমনই হয়েছিল! কিন্তু এখন সে ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণিত হল। যদি ওপরওয়ালা এতই ব্যস্ত, তবে এই জিনিস তাঁর হাত থেকে বেরোয় কী করে!

ঈষৎ বাদামী মসৃণ ত্বক, দীর্ঘ ঋজু উদ্ধৃত দেহ, অসম্ভব ধারালো মুখের আদল বোধহয় একেবারে মেপে মেপে তৈরি করা হয়েছে! কোথাও একটু বেশি বা একটু কম নেই! চওড়া কাঁধ, সুগঠিত গ্রীবা, বুক আর চওড়া কব্জি কী প্রচণ্ড পুরুষালি ! কোমর নিখুঁত সরু! চোখদুটো শান্ত, অথচ প্ৰচণ্ড তীক্ষ্ণ! লোকটা মন্ত্রমুগ্ধের মতো দেখছিল তাকে। কী পুরুষ ! শার্টের ওপর থেকেই এমন! না জানি শার্টের তলায় কত কারুকার্য আছে! সে নিজে যদি এমন সিংহের মতো পুরুষ হতে পারত তবে জীবনটাই হয়তো অন্যরকম হত। বৌ তার কথায় ওঠ-বোস করত, বিছানা গরম করে দিত! মেয়েরা পেছন পেছন ঘুরঘুর করত। তার সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য পাগল হত অনেক সুন্দরী! এতগুলো খুন করতে হত না...!

সে ঢোঁক গিলে বলার চেষ্টা করে, "স্যার, আপনাদের কিছু ভুল হচ্ছে............ আমি কিছু করিনি!"

ফস করে জ্বলে উঠল লাইটার। সামনের মানুষটি ধীরে সুস্থে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে নিঃশব্দে বেশ কয়েকবার ধোঁয়া ছাড়লেন। তারপর খুব ঠান্ডাভাবেই বললেন, "দ্যাখ তোতারাম, এই ডায়লগ শুনিয়ে লাভ নেই। এখনও সময় আছে, সব খুলে বল্। নয়তো আমাদের আরও একটা ভুল হবে। সেটা তোর পক্ষে খুব একটা ভালো হবে না।"

সে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে মানুষটার দিকে। সুগঠিত লম্বাটে মুখ, চোখদুটোয় সামান্য রাগী রাগী দৃষ্টি। চোয়ালের দৃঢ়তায় স্পষ্ট, এ খুব সহজ মানুষ নয় । একদম ঠান্ডা মাথার মক্কেল! যা বলছে, করেও ফেলতে পারে। বুকের ভেতরে ভয়টা ফের গুড়গুড় করে ওঠে! সত্যিই কি অ্যাসিড মারবে নাকি!...

– "ছ' ছ'টা রেপ এবং মার্ডার!" স্যার একটু ঝুঁকে বসলেন। নীচু স্বরে কেটে কেটে বললেন, "আমার জুনিয়রের ধারণা এটা স্রেফ সাইকো কিলিং! খুন আর রেপের নেশায় করা। কিন্তু আমার থিওরি একটু আলাদা! ঐ মেয়েগুলো তোর মতো একটা রোড-রোমিওকে পাত্তা দেয়নি বলেই ওদের ওপর মর্দানগি ফলিয়েছিস তুই! তোর মেল-ইগো হার্ট হয়েছে বলে স্রেফ মেরে ফেললি! তাই না?"

লোকটা কেঁপে ওঠে! যে সত্যটা একমাত্র সে নিজে ছাড়া আর কেউ জানে না, সেটা এই মানুষটা এমন অবলীলায় বুঝে ফেলল কী করে! সে বিস্ময়বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে! হ্যাঁ! আজ পর্যন্ত সবাই তার পৌরুষকে অবমাননা করেছে। তার বৌও রাতের বেলা ধামসে ধুমসে শেষপর্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে যায়! উঠতে বসতে খিস্তি মারে—'ল্যাওড়া বোকাচোদা কোথাকার!' ঐ মেয়েগুলোও তার পৌরুষকে বারবার প্রত্যাখ্যান করেছে। কেউ কদর করেনি তার! সেজন্যই...!

ওর মুখের দিকে একঝলক তাকিয়েই 'স্যার' বুঝলেন ঢিলটা মোক্ষম জায়গায় লেগেছে। তার তরুণ, সুন্দর মুখ কঠিন হয়ে ওঠে। আস্তে আস্তে বললেন, "মর্দানগি! মেল ইগো! আচ্ছা!"

কথাটা বলেই দীর্ঘ টানটান দেহটা ফের চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। পিছনে তখনও দুই অফিসার দাঁড়িয়ে। তাদের দিকে বজ্রকণ্ঠে নির্দেশ গেল, "দু'জন লেডি অফিসারকে ডেকে

নিয়ে আসুন তো। বলবেন, যেন অবশ্যই ওঁরা গ্লাভস পরে আসেন। এ ব্যাটা জবানবন্দি দিক আর না দিক, ওর মেল ইগো বরবাদ করেই ছাড়ব। পৌরুষ মারাচ্ছে শালা!"

"ইয়েস স্যার!" দু'জনের মধ্যে একজন দ্রুতবেগে বেরিয়ে গেল বাইরে।

ইতিমধ্যেই অর্ণব নামক অফিসারটি একটা বড়সড় ক্রেট নিয়ে এসে ঢুকল। লোকটা সভয়ে লক্ষ্য করে অফিসাররা ওর মধ্যে হাত ঢুকিয়ে বের করে আনলেন গোটা কয়েক বড় বড় বাল্বের মতো কী যেন! তার ভেতরে যে তরল কিছু একটা আছে সেটা স্পষ্ট! অ্যাসিড বাল্ব নয় তো! কী সর্বনাশ! এই অফিসারটি কি নিজেও উন্মাদ!

তার মনের কথা বোধহয় উলটোদিকের মানুষটিও বুঝলেন। একটা দুষ্টু হাসি তার মুখে ভেসে ওঠে। সিগারেটটা ফেলে দিয়ে আস্তে আস্তে বললেন তিনি,—"ঠিকই ধরেছিস! তুই আর কত বড় সাইকো! আজ আরও বড় সাইকো দেখে নে!"

– "স্যার!"

ততক্ষণে দু'জন লেডি অফিসারও এসে হাজির। সশব্দে দীর্ঘ মানুষটিকে স্যালুট ঠুকল তারা। তাদের দেখেই 'স্যার' বললেন, "এই তো। মিস বোস আর মিস ঘোষ! আপনাদের মধ্যে কার একটা চমৎকার গন্ডারের চামড়ার লেডিজব্যাগ দরকার? এখানে ফ্রি তে পাওয়া যাচ্ছে।" লেডি অফিসার দু'জন পরম বিস্ময়ে পরস্পরের দিকে তাকায়। লোকটা অবশ্য সে বিস্ময়ের কারণ বুঝল না। কিন্তু অর্ণব ব্যাপারটা বুঝতে পেরে হাসি চাপার চেষ্টা করে। স্যার লেডি অফিসারদের নাম ফের গুলিয়ে ফেলেছেন! এই দু'জনের কারোরই পদবী বোস বা ঘোষ নয়! স্বাভাবিকভাবেই ওরা অবাক হয়ে ভাবছে, এই মিস বোস আর মিস ঘোষটা কে! স্যারের অবশ্য সেদিকে কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি ইশারায় লেডি অফিসারদের কাছে ডাকলেন। খুব নিস্পৃহস্বরে বললেন, "এই লোকটার চামড়া গন্ডারের চামড়ার থেকেও মোটা! আপনারা দায়িত্ব নিয়ে ওর চামড়াটা গা থেকে খুলে নিন। তারপর সেটা থেকে চমৎকার ব্যাগ হবে। গ্লাভস পরে এসেছেন তো?" নির্দেশমতো

প্রশ্নটা করার কোনও দরকার ছিল না। দুই মহিলা অফিসারই গ্লাভস পরে এসেছে।

— "ফ্যান্টাস্টিক!" তার চোখের তারায় কৌতুক নেচে ওঠে, "দাঁড়ান একটা টেস্ট করে দেখি।"

বলতে বলতেই তিনি বিদ্যুৎগতিতে তুলে নিলেন একটা বাল্ব। পরক্ষণেই লোকটার দিকে ধাঁ করে অভ্রান্ত লক্ষ্যে ছুঁড়ে দিলেন। যে লোকটা এতক্ষণ এত মারেও টু শব্দটি করেনি সে এবার ভয়ের চোটে লাফিয়ে উঠে প্রাণান্তকর চিৎকার করে উঠেছে। বালবটা সাঁই করে তার মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে সোজা পেছনের দেওয়ালে ধাক্কা খেল! একটা সজোর শব্দ! তার সঙ্গে একরাশ উত্তপ্ত ধোঁয়া! চোখমুখ যেন জ্বলে গেল লোকটার। অ্যাসিড! নিঃসন্দেহে এটা অ্যাসিডই! অন্য কিছু নয়

সে অজান্তেই দু' হাতে মুখ ঢেকে ফেলেছিল।! পা দুটো থরথর করে কাঁপছে! শুধু পা নয়, গোটা দেহটাই বাঁশপাতার মতো হী হী করে কাঁপছে তার। একটুর জন্য বেঁচে গিয়েছে। সে যদি আরও কয়েক ইঞ্চি লম্বা হত তবে এতক্ষণে মুখ জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যেত।

—"ধু..স!" স্যার ব্যাজার মুখে বললেন, "ফস্কে গেল! এত বেঁটে হতে তোকে কে বলেছিল বে।"

"জিনিসটা কিন্তু সলিড!" পিছন থেকে অর্ণব ভয়ে ভয়ে বলে, —"আরেকটা ট্রাই করবেন স্যার?"

–"নাঃ, ফাস্ট বোলারের কাজ নয়। মুরলীথরন স্টাইল লাগবে।" বলতে বলতেই তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন লেডি অফিসারদের দিকে, "চলে আসুন। টিপ করার জন্য এর থেকে ভালো জিনিস আর পাবেন না! দেখেছেন তো কেমন সুন্দর কালো চামড়া। পুরোটাই তুলে নিতে পারেন। বেশি হয়ে গেলে আমাদের জন্যও একটু রাখবেন। আজকাল টেকসই লেদার বুটের খুব অভাব!"

কথাটা ছুঁড়ে দিয়েই স্মার্টভঙ্গিতে বুটের খটখট শব্দ তুলে চলে যাচ্ছিলেন তিনি। লেডি অফিসাররা ততক্ষণে অ্যাসিড বাল্ব তুলে নিয়েছে। লোকটা কিছু বোঝার বা বলার আগেই তার দিকে ফের রে রে করে ধেয়ে এল কয়েকটা। গায়ে না লাগলেও আশপাশ ঘেঁষে চলে গেল। সে ততক্ষণে প্রায় শুয়ে পড়েছে! দু'হাতে মুখ চেপে প্রায় চিৎকার করে কেঁদে উঠল, "যাবেন না স্যার! বলছি! স...ব বলছি! প্লিজ, বাঁ...চা...ন!"

চলে যেতে গিয়েও একটু থমকে দাঁড়ালেন স্যার। সামান্য ঘাড় ঘুরিয়ে মনোরম গ্রীবাভঙ্গি করে তার দিকে তাকালেন। ঠোঁটে ভেসে উঠল সেই পেটেন্ট দুষ্টু হাসি। গম্ভীর স্বরে

বললেন, "বাঃ অর্ণব! অ্যাসিড টেস্ট তবে কাজে এল দেখছি! তোতারাম এতক্ষণে কথাসরিৎসাগর হয়েছে!"

একপাশে নির্বাক দর্শক হয়ে দাঁড়িয়েছিল অন্য দুই পুরুষ অফিসার। তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন তিনি, "আর কী! লিখে নাও স্টেটমেন্ট। আপাতত এ কেস এখানেই ক্লোজড। এমন চার্জশিট ফাইল করবে যেন হারামজাদার ফাঁসি ছাড়া আর কোনও রাস্তা খোলা না থাকে। আর যি একটাও মিথ্যে কথা বলে, তবে মিস ঘোষ আর মিস বোস এখানেই। আছেন। ওঁরা ওর চামড়া ছাড়িয়ে আমড়া গাছে শুকোতে দেবেন। ভালো। লেদারের জিনিস আজকাল দুষ্প্রাপ্য হয়ে যাচ্ছে।"

লোকটার মুখ ততক্ষণে শুকিয়ে আমসি! সে ঢোঁক গিলল। স্যার দুই লেডি অফিসারের দিকে তাকিয়ে ভারী মিষ্টি একটা হাসি উপহার দিয়ে বললেন,—"হি ইজ অল ইওরস! গোলমাল করলেই বেগুনপোড়াকে সোজা মাইক্রোওয়েভে ঢুকিয়ে দেবেন। গট ইট?"

"ইয়েস স্যার।"

মহিলা অফিসার দু'জন মুখ টিপে হাসছে। তাদের দিকে হাত নেড়েই গটগট করে দ্রুত ছন্দে বেরিয়ে গেলেন তিনি। পেছন পেছন অর্ণব ও অনেকক্ষণ ধরেই সে কী যেন বলার জন্য উশখুশ করছে। বলব বল করেও বোধহয় বলতে পারছে না। একবার মুখ খুলছে, পরক্ষণেই চুপ করে যাচ্ছে।

তার 'স্যার', তথা অফিসার অধিরাজ ব্যানার্জী সম্ভবত ব্যাপারটা আন্দাজ করে হাঁটতে হাঁটতেই বলল, "পেটে কিছু থাকলে বলেই ফেলো অর্ণব নয়তো বদহজম হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা!"

এবার একটু সাহস করে বলেই বসল অর্ণব, "ইয়ে... মানে, আপনি মিস গুপ্ত আর মিস হাজরাকে একেবারে ঘোষ-বোস বানিয়ে দিলে স্যার!"

ফিক্ করে হেসে ফেলল অধিরাজ, "তাতে কী হল? এখানে থোড়াই কৌন বনেগা ক্রোড়পতি খেলা হচ্ছে যে ঠিক বললেই সাত কোটি মিলবে!"

"কিন্তু অতগুলো অ্যাসিড বাল্ব!" সে বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে ফেলে, "ডঃ চ্যাটার্জী এককথায় দিয়ে দিলেন! আমি তো ভাবতেই পারিনি যে আপনি সত্যিই লোকটাকে বাল্ব

ছুঁড়ে মারবেন! যদি গায়ে লেগে যেত?

"আমি চাইলে নিশ্চয়ই লাগত।" অধিরাজ স্মিত হাসল, "আমার এত খারাপ দিনও আসেনি যে একটা আস্ত লোকের মাথা মিস করব। টিপটা যেখানে করেছিলাম, সেখানেই লেগেছে।"

—"কিন্তু লেডি অফিসাররা তো আপনার মতো জেনে বুঝে মিস করবে না স্যার। তার ওপর আপনি আবার হাওয়া দিয়ে এলেন! রোখের মাথায় যদি সত্যি সত্যিই গায়ে মেরে দেয়?"

সে নির্বিকারভাবে বলল, "মারলে মারবে। সমস্যাটা কী?"

—"এ যে খাঁটি অ্যাসিড! লোকটা তো!"

"তুমিও সত্যি অর্ণব!" অধিরাজ এবার সজোরে হেসে ওঠে, —"টাকলুকে চেনো না তুমি? কিপটে নম্বর ওয়ান! অত দামি জিনিস এমনিই দিয়ে দেবে! স্রেফ একটাই অ্যাসিড বাল্ব ছিল ওখানে! ওটায় মার্ক করা ছিল। আর ওটাই আমি ভেঙেছি।" -

– "তবে!" অগাধ বিস্ময়ে অর্ণবের মুখ দিয়ে যেন শব্দ বেরোয় না, —"বাকিগুলো!"

"বাকিগুলোও খাঁটি জিনিস! ডঃ চ্যাটার্জীর ল্যাব থেকে কখনও নকল জিনিস বেরোয় না!" সে হাসতে হাসতে জানায়, "একদম আসল, বিশুদ্ধ ও চমৎকার এইচ টু ও! অর্থাৎ জল!" -

অর্ণব হাসবে না কাঁদবে ভেবে পাচ্ছিল না। ভয় দেখানোর কী অভিনব পদ্ধতি। শুধু ঐ শুঁটকো ক্রিমিনালই নয়, সে নিজেও রীতিমতো ঘাবড়ে গিয়েছিল। আর ডঃ চ্যাটার্জীই বা কী! একবারের জন্যও বুড়ো বলেনি যে এগুলো সব জল! উলটে বলল, "সাবধানে নিয়ে যাও কীর্তিমান! কোনওভাবে একটা যদি বাই এনিচান্স পায়ের ওপর পড়ে, জুতুয়া শুদ্ধ ছিচরণখানাই কিন্তু অদৃশ্য হয়ে যাবে!"

সেই থেকে ভয়ে কাঁটা হয়েছিল সে! কিন্তু এবার তার বেজায় রাগ হয়। ছেলেমানুষ পেয়ে এরকম ভুলভাল জুজুর ভয় দেখানোর মানে কী! এ কী জাতীয় ভুতুড়ি!

আপনমনেই হাঁটতে হাঁটতে ভেতরে ভেতরে গরগর করছিল অর্ণব। রিভেঞ্জ... রিভেঞ্জ! টাকলু বুড়োর আবার মেপে মেপে জল খাওয়ার অভ্যাস। পাছে অন্য কেউ জল খেয়ে

নেয়, তাই ল্যাবের তাকে রাখা জলের শিশিতে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের নকল লেবেল সাঁটিয়ে সবাইকে ধাপ্পা দেয়! এরপর কোনওদিন আসল হাইড্রোক্লোরিকের সঙ্গে জলের শিশি পালটা-পালটি করে না রেখেছে...!

অত্যন্ত ভয়ঙ্কর প্রতিশোধস্পৃহায় একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল সে। সম্বিত ফিরল অধিরাজের মোবাইলের রিংটোনে। সেতারের ঝঙ্কারে 'দেশ' রাগ বাজছে।

"এ.ডি.জি শিশির সেন!"

অধিরাজ ডিসপ্লেতে চোখ রেখেই একটু উত্তেজিত স্বরে বলল। এ.ডি.জি অর্থাৎ অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর জেনারেল অব পুলিস, শিশির সেন ফোন করছেন! ওঁর ফোন মানেই ফের কিছু গুরুতর ঘটেছে! নতুন কোনও কেস...?

অর্ণবের সমস্ত স্নায়ু টানটান হয়ে যায়। শিশির সেনের ফোন মানেই বিপদ! চ্যালেঞ্জিং কেস! এবার আবার কী মারাত্মক অপরাধ ঘটল শহরের বুকে!

অধিরাজ তাড়াতাড়ি ফোনটা রিসিভ করতেই ওপ্রান্ত থেকে ভেসে এল এ.ডি.জি সেনের ইস্পাতকঠিন শীতল কণ্ঠস্বর।

—"ব্যানার্জী ! ইমিডিয়েটলি চলে এসো। 'সর্বনাশিনী' স্ট্রাইকস এগেইন! কেসটা এবার আমাদের হেফাজতে!"

(তিন)

—"অ্যানাদার ডেথ ফোরকাস্ট! এই নিয়ে তিন নম্বর! খুন কে হবে জানা গেছে। কিন্তু ভগবানই জানেন লাশটা কবে বা কোথায় পাওয়া যাবে! এইভাবে একটা খুনীকে ট্র্যাক করা যায়!"

এ.ডি.জি শিশির সেনের কপালে সুস্পষ্ট চিন্তার ভাঁজ। ঘরে চিল্ড এসির শীতল আমেজ স্বত্ত্বেও তিনি রীতিমতো ঘামছেন। রুমালে বারবার মুখ মোছার ফলে ফর্সা মুখ লাল হয়ে গিয়েছে। মুখ দেখেই বোঝা যায়, প্রবল চাপে আছেন। একটু অসহিষ্ণু ভঙ্গিতেই বললেন

—"এরকম খুনী আমি নিজের কেরিয়ারে বাপের জন্মেও দেখিনি! প্রত্যেকবার খুন করার আগে ফেসবুকে ফোরকাস্ট করছে মেয়েটা!" বলতে বলতেই মাথা নাড়লেন তিনি, "সরি, সরি! মেয়ে কিনা স্পষ্ট জানি না। পুরুষও হতে পারে। কিন্তু ফেসবুক প্রোফাইলে একটা মেয়ের ছবিই দেওয়া আছে! পুলিশও সন্দেহ করছে যে, কোনও মেয়ে এর সঙ্গে ডেফিনিটলি যুক্ত আছে। আর সে কি না একটা লোকের মরার আগেই মৃত্যুর ফোরকাস্ট করে বসে থাকে! অথচ কেউ কিছু করতেই পারছে না! এ তো ওপেন চ্যালেঞ্জ! ব্যানার্জী, মিডিয়া এরপর স্রেফ পুলিশ আর প্রশাসনের মুখে কালি মাখাবে।"

অধিরাজ নির্বাক অথচ শান্ত দৃষ্টিতে এ.ডি.জি সেনের দিকে তাকিয়ে আছে। তার মুখে অবশ্য কোনও উত্তেজনার চিহ্ন নেই। সে বেশ কিছুদিন ধরেই 'সর্বনাশিনী'র কেসটা ফলো করছে। টেলিভিশনে, সোশ্যাল মিডিয়ায় এখন এই নাম বহুচর্চিত! এরকম ঘটনার সাক্ষী আগে কখনও হয়নি এ শহর। পুলিশ যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে, কিন্তু এ রহস্যের তল পায়নি। শেষপর্যন্ত তারা হাত তুলে নিয়ে সি.আই.ডি, হোমিসাইডকে কেসফাইল দিয়ে দিতে বাধ্য হল।

লোকটা বা মেয়েটা কে তা কেউ জানে না! তার নাম, ধাম, ঠিকানা, কিছুই জানা নেই। থাকার মধ্যে আছে শুধু অপূর্ব এক কৃষ্ণাঙ্গীর ছবি দেওয়া একটি প্রোফাইল! ফেসবুক প্রোফাইলটির নাম 'সর্বনাশিনী'! কালো হলে কী হবে! এমন অপূর্ব সুন্দরী নারী খুব কমই চোখে পড়ে। আর কী চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়ার মতো দেহসৌষ্ঠব তার! প্রথমে সকলেই

ভেবেছিল এটা একটা ফেক প্রোফাইল! কিন্তু মেয়েটির অ্যালবামে তার এমন একাধিক ব্যক্তিগত ফটো আছে যেগুলো সচরাচর ফেক প্রোফাইলে থাকে না। অনেক পুরুষই সে সৌন্দর্য দেখে কুপোকাত হয়েছিল।

তখন কে জানত যে এই সৌন্দর্যের পেছনে সত্যি সত্যিই সর্বনাশ লুকিয়ে রয়েছে!

আজ থেকে প্রায় বছরখানেক আগে কলকাতা পুলিস বাইপাসের শুনশান এলাকায় একটা মৃতদেহ উদ্ধার করে। মৃতদেহটিকে দেখলেই বোঝা যায় যে মৃত ব্যক্তি খুব সাধারণ মানুষ নয়। লাশের পরনের দামি পরিচ্ছদ, হাতের লাখখানেকের বিদেশী ঘড়ি, দামি রত্নখচিত আংটি, দামি মোবাইল এবং সর্বোপরি মানুষটির অভিজাত চেহারা স্পষ্ট বলে দেয় যে লোকটি রীতিমতো অর্থবান! অথচ সেই লোকটির লাশ এরকম বেওয়ারিশ অবস্থায় ঝোপের মধ্যে পড়ে আছে!

পুলিশ মোবাইলের সাহায্যেই মৃত ব্যক্তির পরিচয় খুঁজে বের করে। ভদ্রলোকের নাম সঞ্জীব রায়চৌধুরী। সাঙ্ঘাতিক নামকরা বিজনেস টাইকুন না হলেও, যথেষ্টই বিত্তবান। এককথায় টাকার কুমীর বলা যায়। তাঁর স্ত্রী'র কাছ থেকে জানা গেল, যতটা গুণবান ব্যবসায়ী তিনি ছিলেন, ঠিক ততটাই সর্বগুণসম্পন্ন চরিত্রহীন! মদ, মাংস আর মেয়ের একনিষ্ঠ সাধক! তাঁর জীবনে একের পর এক নারী এসেছে। মেয়েদের ব্যাপারে তিনি উদারহস্ত তবে সম্প্রতি কোনও এক সুন্দরীর খপ্পরে পড়ে স্ত্রীকে ডিভোর্স দেওয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলেন। কিন্তু বিবাহবিচ্ছেদ হওয়ার আগেই তাঁর জীবনের সঙ্গেই বিচ্ছেদ হয়ে গেল! অবশ্য তাতে যে স্ত্রী বিশেষ দুঃখিত নন তা বুঝতে পুলিশের অসুবিধে হয়নি। ভদ্রমহিলা স্পষ্টাস্পষ্টি জানিয়েই দিলেন, কোন সুন্দরীর সঙ্গে তাঁর স্বামীর সম্পর্ক ছিল, তা তিনি জানেন না। সবাই জানে যে মিঃ রায়চৌধুরী কিছুদিনের জন্য বিজনেস টিপে গিয়েছিলেন। অবশ্য তাঁর স্ত্রী'র সন্দেহ, বিজনেস ট্রিপ নয়, মৃত্যুর সময়ে সঞ্জীব তাঁর সেই গোপন প্রেমিকার সঙ্গেই ছিলেন। এবং সেই সুন্দরীই তাঁকে যমালয়ে পাঠিয়েছে।

স্বাভাবিকভাবেই পুলিশ ভিকটিমের স্ত্রীয়ের ওপরেই সন্দেহের তীর বহাল রেখেছিল। বলাই বাহুল্য, যে অবিশ্বাসী স্বামী পরনারীতে আসক্ত, তাঁকে কোনও স্ত্রী-ই ধুপ-ধুনো দিয়ে

পুজো করবে না। তার ওপর ডিভোর্স হলে মিসেস রায়চৌধুরীকে পথে বসতে হত। সুতরাং বিরাট দুটো মোটিভ তাঁর কাছে ছিল। প্রতিশোধ আর অগাধ অর্থ!

এই অবধি পুলিশের তদন্ত কোনওরকম বাধা পায়নি। তারা খুনের থিওরি নিয়েই এগোচ্ছিল। যদিও লাশে অস্বাভাবিক মৃত্যুর কোনও চিহ্ন ছিল না। তবু একটা খটকা তো ছিলই! সঞ্জীব রায়চৌধুরীর মতো লোকের যদি স্বাভাবিক মৃত্যু হত তবে দেহটা অমন বেওয়ারিশ পড়ে থাকত না! তাঁর সঙ্গে গাড়ি ছিল। সেটা কোথায় গেল! লুটপাটের কেস হলে তাঁর দেহে দামি দামি জিনিস থাকার কথাও নয়। তাছাড়া ট্যুরের নাম করে তিনি ছিলেনই বা কোথায়! সত্যিই কি বাইরে কোথাও ছিলেন? না গল্পটা তাঁর স্ত্রী'র স্বকপোলকল্পিত?

পুলিশ যখন এইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বেড়াচ্ছিল, ঠিক তখনই ফরেনসিক রিপোর্ট তাদের মাথায় দ্রাম করে এক হাতুড়ির বাড়ি বসিয়ে দিল! ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ স্পষ্ট জানালেন, সঞ্জীব রায়চৌধুরীর মৃত্যুর মধ্যে কোনও অস্বাভাবিকতাই নেই! তাঁর মৃত্যুর কারণ ম্যাসিভ লিভার ড্যামেজ, অ্যাকিউট হেপাটিক ও রেনাল ফেইলিওর। তাঁর পাকস্থলীতে কোনওরকম খাদ্য ছিল না। দেহের কোথাও কোনওরকম বিষের অস্তিত্বও পাওয়া যায়নি। সঞ্জীবের যে অতিরিক্ত পরিমাণে মদ্যপানের নেশা ছিল,

তা প্রায় সর্বজনবিদিত। তাই একজন ক্রনিক মাতালের ক্ষেত্রে এইধরনের মৃত্যু মোটেই অস্বাভাবিক নয়। পুলিস যখন লাশ পায়, তার প্রায় ছিয়ানব্বই ঘণ্টা আগেই তিনি মারা গিয়েছেন।

এইরকম রিপোর্টের পরে পুলিশের আর বিশেষ কিছু করার থাকে না। ভিকটিমের স্বাভাবিক মৃত্যু হলে কারোর ওপর কেস করা যায় না। সঞ্জীবের স্ত্রীও খুব একটা উৎসাহ দেখাননি। ফলস্বরূপ কেসটা চাপা পড়ে যায়।

কিন্তু ঘটনা আদৌ এখানেই থেমে থাকল না।

এর ঠিক তিনমাস পরে ফের সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে! এবার দেহটা একটা আবর্জনার স্তূপে পাওয়া গেল। ভিকটিম মাঝারি মানের রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী অর্জুন শিকদার। তিনিও সঞ্জীব রায়চৌধুরীর মতোই নারীপ্রেমিক ও অতিরিক্ত মদ্যপানে অভ্যস্ত।

ওঁর স্ত্রী'র বিবৃতির সঙ্গে সঞ্জীববাবুর স্ত্রী'র বক্তব্যের অদ্ভুত মিল! অর্জুনও নাকি কোনও অজ্ঞাত ট্যুরে ছিলেন! এবং কোনও 'দিলতোড়' সুন্দরী তাঁকেও কব্জা করে ফেলেছিল। মৃত্যুর কারণ এবারও এক! ম্যাসিভ লিভার ড্যামেজ, অ্যাকিউট হেপাটিক ও রেনাল ফেইলিওর! মৃত্যু হয়েছে যথারীতি মৃতদেহ আবিষ্কারের আনুমানিক পাঁচদিন আগে।

ফরেনসিক অবশ্য এবার একটি নতুন তথ্য জুড়ল। সঞ্জীবের ক্ষেত্রে হয়তো বিষয়টা তেমন খুঁটিয়ে দেখা হয়নি। এবার মৃতের দেহে বেশ কিছু 'লাভ-বাইটে'র দাগ পাওয়া গেল। বিশেষজ্ঞ জানালেন- ভোগ-চিহ্নগুলো খুব পুরোনো নয়। অর্জুন সেক্সুয়ালি অ্যাকটিভ ছিলেন এবং সম্ভবত মৃত্যুর আগে কোনও নারীর সঙ্গে দৈহিকভাবে মিলিত হয়েছিলেন।

এবার পুলিসের বেশ সন্দেহ হল। হুবহু একই ঘটনা দু'জনের সঙ্গে কী করে ঘটে? এটা কি নেহাতই কাকতালীয়? পুলিসের তদন্তকারী অফিসারের ব্যাপারটা ঠিক হজম হল না। 'ভিসেরা' টেস্ট হল ভিকটিমের। কিন্তু এমনই কপাল যে এবারও কোনও বিষের অস্তিত্ব নেই! লোকটার মৃত্যু সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলেই মেনে নিতে হল! ফরেনসিক এবারও ফেল মারল।

তবুও পুলিস অফিসার হাল ছাড়লেন না। তাঁর মাথায় অনেক প্রশ্ন ঘুরছিল। বিষের অস্তিত্ব নেই ঠিকই, কিন্তু দু'জনের মৃত্যুই অদ্ভুতভাবে একরকম! দু'জনেই রীতিমতো ধনবান। দু'জনের বাড়িতেই বিক্ষুব্ধ স্ত্রী উপস্থিত! দু'জনেই মৃত্যুর আগে ট্যুরে গিয়েছিলেন। সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে এখানে কোনও রহস্যময়ী নারীর উপস্থিতির। অন্তত অর্জুনের ক্ষেত্রে ফরেনসিক রিপোর্ট তেমনই বলছে। কে সেই সুন্দরী। দু'জন কি আলাদা, নাকি একই মহিলা? কিংবা দুই ব্যবসায়ীর মধ্যে কি কোনও সম্পর্ক আছে? কিংবা দুই ক্ষুব্ধ স্ত্রীয়ের মধ্যে কোনও যোগসাজশ?

প্রত্যেকটা সম্ভাবনা যাচাই করে দেখলেন তদন্তকারী অফিসার। কিন্তু অন্ধকার কমার বদলে গাঢ় হল আরও বেশি। ভিকটিম দু'জনের মধ্যে কোনও সংযোগ ছিল না। কেউ কাউকে চিনতেনই না! দুই স্ত্রীয়ের মধ্যে কোনও লিঙ্ক নেই! ফরেনসিকও নতুন কোনও তথ্য দিতে পারছে না! সুপারি র‍্যাকেট সম্পূর্ণ নীরব। দুই ব্যবসায়ীর গত কয়েকমাসের ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্টে কোনও সন্দেহজনক লেন-দেন নেই! তার আগে অবশ্য কিছু মহিলাদের নামে

ট্রানজাকশান পাওয়া গেল। কিন্তু সে নেহাতই সামান্য। উক্ত মহিলাদের খুঁজে বের করাও হল। তারা সবাই পেশায় কলগার্ল। একদম প্রফেশনাল! এদের মধ্যে কাউকে বিয়ে করার জন্য ঐ দুই ব্যবসায়ী উঠে পড়ে লাগবেন বলে মনে হয় না। তাছাড়া প্রত্যেকেই জানাল, কারোর সঙ্গেই স্টেডি অ্যাফেয়ারে যাননি ওঁরা। গত ছ'মাসে ব্যবসাক্ষেত্র আর সংসারের বাইরে কোনও মোটা টাকা খরচও হয়নি। খবরি নেটওয়ার্ককে অ্যাক্টিভ করে দেওয়া হল। কিন্তু তারাও অনেক চেষ্টা করে কিছুই বের করতে পারল না।

পুলিস অফিসারটি মহা ধন্দে পড়লেন। স্পষ্ট বুঝতে পারছেন যে এর পেছনে কোনও গোলমাল আছে। কিন্তু সেই ধাঁধাটি সম্পূর্ণ পর্দানসীন। যদি এক্সট্রা ম্যারিটাল অ্যাফেয়ারের অ্যাঙ্গেলেও ভাবা যায়, তবুও কোনও মোটিভ নেই! সচরাচর সুন্দরী মহিলারা অর্থবান পুরুষদের টার্গেট করে থাকে তাদের টাকা হাতানোর জন্য। কিন্তু এখানে তেমন কোনও ব্যাপারই দেখা যাচ্ছে না। বরং দু' ক্ষেত্রেই পুরুষ দু'জন ক্ষেপে উঠেছিলেন প্রেমিকাকে বিয়ে করার জন্য। সেক্ষেত্রে নারীটি বিরাট সম্পত্তির অধিকারিণী প্রায় হতেই যাচ্ছিল। তার আগেই লোকদুটোকে সে মারবে কেন! সোনার ডিম দেওয়া হাঁসের পেট কেউ কাটে না। তাছাড়া মারলই বা কী দিয়ে? ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ সে বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব!

ভাবতে ভাবতেই যখন তিনি গলদঘর্ম হয়ে উঠেছেন এবং তদন্ত প্রায় ডেড-এন্ডে পৌঁছেছে, তখনই এক খবরি অদ্ভুত একটা খবর দিল। অফিসারকে বলল, "খবরটা কতখানি কাজে লাগবে জানি না স্যার। কিন্তু বোধহয় দুই ভিকটিমের মধ্যে কিছু কানেকশন আছে। আপনাকে হোয়াটস-আপে একটা ফেসবুক লিঙ্ক পাঠাচ্ছি। একটু দেখুন তো।"

কিছুক্ষণ পরেই এসে পৌঁছল সেই ফেসবুক লিঙ্ক। অফিসার খুলে দেখলেন সেটা 'সর্বনাশিনী' নামের এক অদ্ভুত সুন্দরীর ফেসবুক প্রোফাইল। টাইমলাইনে পোস্ট করা আছে মাত্র কয়েকটা শব্দ, "আর.আই.পি অর্জুন শিকদার!"

প্রথমে অবশ্য আসল ব্যাপারটা বোঝেননি তিনি। তবে অবাক হয়েছিলেন। অর্জুন শিকদারের যা চরিত্র, তাতে কোনও মহিলাই তাঁর মৃত্যুতে দুঃখিত হবে বলে মনে হয় না। অবশ্য ইনিই যদি সেই রহস্যময়ী প্রেমিকা হয়ে থাকেন তবে আলাদা কথা। তিনি উত্তেজিত

হয়ে খবরিকে পালটা ফোন করে বললেন, "গ্রেট জব! এই মেয়েটার সঙ্গে অর্জুন শিকদারের অ্যাফেয়ার ছিল কি না খোঁজ নিতে পারবি?"

খবরি জবাবে বলল, "সে খোঁজ তো নিয়ে নেব। কিন্তু স্যার, পোস্টটা ঠিকমতো দেখেছেন কি?"

"মানে?" ভদ্রলোক বিস্মিত, "আর.আই.পি মার্কা পোস্টটার কথা বলছিস তো? দেখেছি। কেউ খুব দুঃখ পেয়েছে।" -

"ভালো করে দেখুন স্যার! ওটা সাধারণ আর.আই.পি মার্কা পোস্ট নয়। যেদিন পোস্টটা পড়েছে সেই ডেটটা দেখুন।" খবরি জানায়, "ডেটটা অর্জুন শিকদারের মৃত্যুর অন্তত সাতদিন আগের! ওটা দুঃখের পোস্ট নয়। ডেথ ফোরকাস্ট!"

"কী!"

শব্দটা এত জোরে বলেছিলেন অফিসার যে গোটা থানাই প্রায় কেঁপে উঠেছিল। রুদ্ধশ্বাসে বললেন তিনি, "কী বলছিস? অর্জুন শিকদারের মৃত্যুর সাতদিন আগের পোস্ট! সে কী!"

- "হ্যাঁ স্যার।" ও প্রান্ত থেকে খবরির অপেক্ষাকৃত নীচু স্বর ভেসে এল – "শুধু তাই নয়। স্ক্রল করে একটু নীচে নামুন। সঞ্জীব রায়চৌধুরীর আর.আই.পি মার্কা পোস্টও আছে। সেটাও ভদ্রলোকের মৃত্যুর ঠিক আট দিন আগে পোস্ট করা। মানে ওটাও ডেথ ফোরকাস্ট!" -

অফিসারের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে। ফোনটা কেটে দিয়ে কিছুক্ষণ স্তম্ভিতের মতো বসে রইলেন। তারপর পাগলের মতো তন্নতন্ন করে ঘেঁটে দেখলেন 'সর্বনাশিনী'র প্রোফাইল! হ্যাঁ, খবরির প্রত্যেকটা কথাই অক্ষরে অক্ষরে সত্যি! সঞ্জীব রায়চৌধুরীর আর.আই.পি পোস্টও আছে এবং সেটা সত্যিই তাঁর মৃত্যুর প্রায় আটদিন আগে পোস্ট করা হয়েছে। এ প্রোফাইলটা এই দু'জনের মৃত্যুতে আদৌ শোকপ্রকাশ করেনি বরং তাদের মৃত্যুর আগাম ঘোষণা করেছে। ডেথ ফোরকাস্ট! কী সাংঘাতিক!

পুলিস এতদিন সম্পূর্ণ অন্ধকারে ছিল। এবার একটা লিড পেয়ে উঠে পড়ে সবেগে তদন্ত করতে শুরু করল। তাদের সাইবার সেল 'সর্বনাশিনী'র আই.পি অ্যাড্রেস ট্র্যাক

করার জন্য আদা নুন খেয়ে লেগে পড়ে। প্রোফাইলে মেয়েটির যত ছবি ছিল সব প্রত্যেকটি পুলিস স্টেশনে পাঠানো হল। খবরিদের হাতে হাতে ঘুরতে লাগল তার ছবি।

কিন্তু শেষমেষ কিছুই হল না। ছবির মেয়েটিকে খুঁজে পাওয়া গেল না কোথাও! সাইবার সেল তার আই.পি অ্যাড্রেস ট্র্যাক করতে গিয়ে রীতিমতো হিমশিম খেল। কারণ বেশির ভাগ পোস্টই হয় কোনও অখ্যাত সাইবার কাফে থেকে হয়েছে, নয়তো মোবাইল থেকে! পুলিস সেই সাইবার কাফেগুলোতেও ঢুঁ মারল, কিন্তু যথারীতি কোনও লিড পেল না। আর যে যে মোবাইল থেকে স্টেটাস আপডেট বা পোস্ট হয়েছে, আই.পি অ্যাড্রেসের মাধ্যমে সেগুলোকে ট্র্যাক করতে গিয়ে সাইবার সেলের পুরো 'সসেমিরা' অবস্থা। কোনটারই অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না! সাইবার সেল সঞ্জীব ও অর্জুনের ফেসবুক অ্যাকাউন্টও তন্নতন্ন করে ঘেঁটে দেখল। তাদের ফ্রেন্ডলিস্টে কিন্তু আদৌ সর্বনাশিনীর প্রোফাইল নেই। চ্যাট হিস্ট্রি ঘেঁটেঘুঁটেও সন্দেহজনক অন্য কোনও প্রোফাইল পাওয়া গেল না।

এই কেসটা নিয়ে মিডিয়া প্রচুর হল্লা করেছিল। এখনও করছে। অনেকেই এটাকে 'পারফেক্ট ক্রাইম' বলছে। অনেকে পুলিসের চোদ্দ গুষ্টির তুষ্টি করেছে। কিন্তু অধিরাজ জানে যে 'পারফেক্ট ক্রাইম' বলে কিছু হয় না। ওটা ক্রিমিনালের ভ্রান্ত একটা ধারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। পুলিসকেও দোষ দেওয়া যায় না। তাদের হাতে তদন্ত করার মতো পর্যাপ্ত কোনও এভিডেন্সই ছিল না। এরকম অবস্থায় তাদের ফ্রাস্ট্রেটেড হওয়াটাই স্বাভাবিক। তবু হাল ছাড়েনি তারা। নিয়মিতভাবে প্রোফাইলটার ওপর নজর রেখে বসেছিল। আর আজ হয়তো...!

- – "এই দেখো।" শিশির সেন ওঁর ল্যাপটপটা অধিরাজের দিকে ঘুরিয়ে দিলেন; "নেক্সট আপডেট দিয়েছে সর্বনাশিনী। সেই একই স্টাইল! আর.আই.পি পোস্ট!"

অর্ণবের শিড়দাঁড়া বেয়ে একটা হিমেল স্রোত নেমে গেল। কী সর্বনেশে খেলায় মেতেছে এই প্রোফাইল! সর্বনাশিনীর আর.আই.পি পোস্ট মানে আরেকটা মানুষের আগাম মৃত্যুর সঙ্কেত! এখনও লোকটা মরেনি ঠিকই, তবে খুব শিগগিরিই মরবে! আর কী করে যে মরছে তা ঈশ্বরই জানেন!

সে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেখল পোস্টটায় গোটা গোটা অক্ষরে লেখা আছে, "আর.আই.পি বিজয় জয়সওয়াল!"

"বিজয় জয়সওয়াল!" অর্ণব স্খলিত স্বরে বলল, "নিশান জুয়েলার্সের মালিক নয় তো?"

– "নিঃসন্দেহে তিনিই।", শিশির সেন জানালেন, "পোস্টটা ঘণ্টাখানেক আগে, অর্থাৎ বিকেল পাঁচটায় পড়েছে। পুলিস তৎক্ষণাৎ বিজয় জয়সওয়ালের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয়। জানা গেল, যথারীতি তিনিও ট্যুরের নাম করে হাওয়া হয়ে গেছেন। তাঁর জীবনেও কোনও অজ্ঞাত প্রেমিকা ছিল এবং অ্যাজ ইউজুয়াল, ওঁকেও ফোনে পাওয়া যাচ্ছে না!"

অর্ণব চিলড এসির ঠান্ডার মধ্যেও ঘেমে নেয়ে একসা হতে থাকে। এবারের শিকার হাই প্রোফাইল। বিপদ বুঝেই পুলিস কেসটা সি.আই.ডিকে ট্রান্সফার করেছে। অর্থাৎ স্রেফ ঘাড় থেকে বোঝা নামিয়েছে।

"ব্যানার্জী!" এ.ডি.জি বিপন্ন চোখদুটো তুলে অধিরাজের দিকে তাকিয়েছেন,—"যে করেই হোক, এবারের খুনটা আটকাও। আমি জানি না কোন্ অজ্ঞাত উপায়ে সে ফরেনসিক্‌কে বিভ্রান্ত করছে। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস এগুলো সব খুন। ওপরমহল থেকে ট্রিমেন্ডাস প্রেশার আসছে। এই লোকটা যথেষ্ট প্রভাবশালী। ওর লাশ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারি না আমরা।" -

অধিরাজ খুব শান্তভাবেই বলল, "আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট স্যার। তবে হয়তো এখনই ভয় পাওয়ার কিছু হয়নি। পোস্টটা মাত্র একঘণ্টা আগে পড়েছে। যতদূর আমি কেসটা সম্বন্ধে জানি, এই ফোরকাস্টটা মৃত্যুর অন্তত সাত-আট দিন আগে হয়। সুতরাং আশা করতে বাধা নেই যে বিজয় জয়সওয়াল এখনও জীবিতই আছেন। আর তাঁকে খোঁজার জন্য বেশ কিছুটা সময় হয়তো আমরা পাব।"

"তাহলে খোঁজো!" টেবিলের ওপর একটা চাপড় মেরে বললেন এ.ডি.জি সেন, "যে করেই হোক জ্যান্ত বের করো লোকটাকে। তার সঙ্গে খুনীকেও। আকাশ চিরে বের করবে না পাতাল খুঁড়ে তা আমি জানতে চাই না। বাই হুক অর ক্রুক লোকটাকে বাঁচাও। তোমার হাতে খুব বেশি সময় নেই ব্যানার্জী। যত তাড়াতাড়ি পারো, কাজ শুরু করে দাও।"

"ইয়েস স্যার।"

অধিরাজ আর অর্ণব এ.ডি.জি সেনের ঘর থেকে নীরবেই বেরিয়ে এল। —'সর্বনাশিনী'র প্রোফাইলের সবকটা ছবির প্রিন্ট আউট দিয়ে দিয়েছেন শিশির সেন। অধিরাজ সেগুলোই খুব মন দিয়ে দেখছে। অর্ণব লক্ষ্য করে তার চোখদুটো অন্যমনস্ক। কপালে সামান্য ভাঁজ। ছবিগুলো দেখতে দেখতেই হাঁটছে। কিন্তু ভঙ্গীটা চিন্তান্বিত।

- "স্যার?"

"উঁ?" অধিরাজ যেন সম্বিত ফিরে পায়। এবার অর্ণবের দিয়ে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে একটু আত্মমগ্নভাবেই বলল, "এই একটা ছবি ছাড়া খুনীর ব্যাপারে কোনও ক্লু, কোনও এভিডেন্সই নেই! পুলিস অলরেডি ছবিটাকে সার্কুলেট করেছে। তবু আমরাও আমাদের মতো করে চেষ্টা করব। পুলিসের থেকে আমরা আরও বিপজ্জনক অবস্থায় অর্ণব। আগের দুটো কেসে ভিকটিম মৃত ছিল। কিন্তু আমার ধারণা এবার ভিকটিম এখনও বেঁচে আছে। আর এই স্কোপটা পেয়েও যদি আমরা তাঁকে বাঁচাতে না পারি, তবে প্রেস্টিজে পুরো গ্যামাক্সিন!" -

অর্ণবের কপালে চিন্তার ভাঁজ, "কিন্তু শুরু কোথা থেকে করব স্যার? পুলিস যেখানে দাঁড়িয়েছিল, আমরাও ঠিক সেখানেই দাঁড়িয়ে।"

—"উঁহু!" সে মাথা নাড়ে, "এবার আরও একটা ক্লু আমাদের হাতে আছে। বিজয় জয়সওয়ালের বাড়িতে যাও। ওঁর একটা ফটো নিয়ে এসো। এই মেয়েটার সঙ্গে এবার জয়সওয়ালের ফটোও সার্কুলেট করাব। প্রত্যেকটা পুলিশ স্টেশনে ফ্যাক্স করে দুটো ছবিই পাঠিয়ে দাও মেয়েটাকে যদি না-ও পাই, জয়সওয়ালকে পাওয়ার চান্স আছে আমাদের ইনফর্মার নেটওয়ার্ককে অ্যাক্টিভ করে দাও। সবার হাতে যেন ছবিই থাকে। আর...!"

দুটো বলতে বলতেই অধিরাজ হঠাৎই দুম করে বেমক্কা একটা প্রশ্ন করে বসে —"আচ্ছা অর্ণব, যদি তোমায় এক্সট্রা-ম্যারিটাল অ্যাফেয়ার করতে হয়, তবে প্রেমিকাকে নিয়ে কোথায় যাবে?"

"অ্যাঁ!" অর্ণব প্রায় আকাশ থেকে পড়ে, "এক্সট্রা-ম্যারিটাল অ্যাফেয়ার!"

"কেন?" ঠোঁটের কোণে মৃদু দুষ্টু হাসিটা ফের ঝিলিক দিয়ে উঠেছে—"তুমি পরকীয়া করতে পারো না? সমস্যা কোথায়? এখন তো বৈধ হয়ে গিয়েছে!"

-“স্যার! আ...মি!”

সে আর কী বলবে বুঝে পায় না! রীতিমতো ঘাবড়ে গিয়েছে। এখনও পর্যন্ত বেচারি একটা স্বকীয়াই করে উঠতে পারল না, তো পরকীয়া কীভাবে করবে!

—“কেন? তোমার লাইফে কেউ নেই?” অধিরাজ চোখ কুঁচকে তাকিয়েছে তার দিকে। দু' চোখে স্পষ্ট কৌতুক, “স্পেশ্যাল কেউ? স্পেশ্যাল বন্ধু-টন্ধু ?”

এবারে পুরো বাউন্সার! অর্ণব থতমতো খেয়ে কী বলবে বুঝে পায় না। বোকার মতো বলে বসল, “আমার তো শুধু আপনি আছেন স্যার।”

— “আমি!” কিছুক্ষণ হাঁ করে অর্ণবের দিকে তাকিয়ে থেকে শেষমেষ হেসেই ফেলল সে, “জিনিয়াস! রিয়েলি জিনিয়াস অর্ণব! তবে ঠিকই আছে। এখন ওটাও বৈধ।”

অর্ণব বুঝল কী চরম বোকামি করে বসেছে। লজ্জায় লাল হয়ে মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলল, “স্যার, আমি তা বলিনি... মানে... তা বলতে চাইনি...!”

অধিরাজ হাসতে হাসতেই বলে, “রিল্যাক্স। টেনশন না করে ছবি দুটোকে কলকাতার যত হোটেল বা রিসর্ট আছে, ছোট-মাঝারি-বড় সব জায়গায় ঘোরাও। দীঘা, বিশেষ করে মন্দারমণি পুলিসকে অ্যালার্ট করো।। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আমি জানতে চাই যে উক্ত দুই ব্যক্তির মধ্যে কাউকে। সেখানে দেখা গিয়েছে কি না।”

– “কিন্তু জয়সওয়াল তো বাইরে কোথাও যেতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বা বিদেশে। লোকটার প্রচুর টাকা। হয়তো সুইৎজারল্যান্ডে বা মরিশাসে বসে হাওয়া খাচ্ছেন!”

“না অর্ণব। তাতে দুটো টেকনিক্যাল প্রবলেম আছে।” অধিরাজ একটু আত্মবিস্মৃত স্বরে বলল, “প্রথমতো সুইৎজারল্যান্ড বা মরিশাসে যেতে হলে পাসপোর্ট ভিসা লাগে। আগের দুটো কেসে দু'জন ভিকটিমের পাসপোর্টই বাড়িতে পেয়েছে পুলিস। আর ভিসা করালে তার একটা রিপোর্ট লাগে। ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট থেকে শুরু করে অনেকরকম ডিটেলস লাগে। তেমন কিছু করলে পুলিস ঠিকই জানতে পারত।” -

—“নকল পাসপোর্ট বা নকল নামে ভিসাও তো হতে পারে।” অর্ণব আমতা আমতা করে বলে, “যে পাবলিক এক্সট্রা-ম্যারিটাল অ্যাফেয়ার করছে, আর প্রেমিকাকে নিয়ে বেড়াতে যাচ্ছে, সে থোড়াই ঢাক পিটিয়ে নিজের পরিচয় দিয়ে বেড়াবে!”

"গুড থিঙ্কিং।" সে মাথা ঝাঁকাল, "কারেক্ট। হতে পারে। সেক্ষেত্রেও টাকা তো লাগবে। অথচ দুটো লোকের ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্টে তেমন কোনও সন্দেহজনক ট্রানজাকশান নেই। পুলিস লোকদুটোর নামে-বেনামে যত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে, ক্রেডিট, ডেবিট কার্ডের ডিটেলস সব তন্নতন্ন করে ঘেঁটেছে। কিস্যু নেই! পাসপোর্ট, ভিসা নাহয় বাদ দিলাম, অন্তত প্যাসেজমানি এবং অন্যান্য খরচের টাকাটা বের করল কোথা থেকে?"

"টাকা হয়তো মেয়েটি দিয়েছে। প্রেমিকের জন্য এইটুকু তো করতেই পারে।"

— "বাপ রে!" অধিরাজ তার কাঁধ চাপড়ে দেয়, "তুমি তো রীতিমতো এক্সট্রা-ম্যারিটাল অ্যাফেয়ারের এক্সপার্ট হয়ে গেলে গুরু! সত্যিই কি কোনও পরকীয়া করোনি? নাকি চুপ চাপ ফুলে ছাপ মারছ?"

এর উত্তরে বিব্রত হয়ে হেঁ হেঁ করে দন্তকান্তি দেখানো ছাড়া আর কোনও উপায় থাকে না। বলাই বাহুল্য, অর্ণবও তাই করল। অধিরাজ মৃদু হেসে বলে,—"তোমার থিওরি ধরো মেনেই নিলাম। পাসপোর্ট, ভিসা, টাকা পয়সার ব্যাপার গোল্লায় যাক! ধরো, সমস্ত কিছু ম্যানেজ করে দু'জন লোকই বিদেশে প্রেম করতে গিয়েছিলেন এবং যখন তাঁরা প্রেমিকার সঙ্গে ইন্টু পিন্টু করছিলেন তখনই প্রেমিক চন্দ্রবিন্দু হয়ে গেলেন। অথবা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ফরেনসিক রিপোর্ট অনুযায়ী যা তা অসুখ নয়, একেবারে লিভার ড্যামেজ! অ্যাকিউট হেপাটিক ও রেনাল ফেইলিওর। এইরকম মারাত্মক অসুখ হলে প্রথমেই ইনশিওরেন্স কোম্পানিকে স্মরণ করতে হবে! শুধু তাই নয়, যে লোকের পটল তোলার চান্স আছে তেমন সিরিয়াস মেডিক্যাল সিচ্যুয়েশনে প্রথমেই এমব্যাসি বা কনসুলেটকে খবর দিতে হবে। সেখানে আর নকলি পাসপোর্ট-ভিসা চলবে না। এমব্যাসি রোগীর দায়িত্ব নেবে এবং ফ্যামিলিকে খবর দেবে। আর যদি পটল তোলে তাহলে তো আরও বিপদ! এমব্যাসির পারমিশন, একটা অবশ্যম্ভাবী অটোপ্সি, সাত ঘাটের জল খেতে খেতে বডি নিয়ে আসার প্রসিডিওর—এত কাণ্ড হবে আর তার কোনও ট্রেসই থাকবে না! কেউ কিছু জানবে না? এটা কি আদৌ সম্ভব? আর লোকদুটোর বড়িতে কোনও অটোপ্সির চিহ্ন ছিল না।"

– "তার মানে ওরা দেশের বাইরে যায়নি।" অর্ণব একটু চিন্তা করে বলল,—"কিন্তু দেশের ভেতরে শিমলা, মুসৌরি, দিল্লী, গোয়া, যে কোনও জায়গাতেই থাকা অসম্ভব নয়।"

"যদি কলকাতার বাইরেই থাকবে তবে মৃতদেহটাকে কলকাতায় ডাম্প করার মানে কী! যেখানে মরেছে, সেখানে ফেলে দিলেই তো ল্যাটা চুকে যায়। তা না করে কিলার ঘাড়ে করে ডেডবডিটাকে কলকাতায় এনে ফেলল! আর যদি তর্কের খাতিরে ধরে নিই দুই মক্কেল যখন কলকাতায় ফিরলেন, তখনও মরেননি—গুরুতর অসুস্থ ছিলেন, সেক্ষেত্রেও তাঁর কোনও নার্সিংহোমে ভর্তি না হয়ে চুপচাপ বসে মরাই ঠিক করলেন। ও কী দেবদাস পেয়েছ নাকি, যে প্রেমের জন্য লিভার পচিয়ে গাছতলায় মরবে!" অধিরাজ মাথা নাড়ছে, —"কোনও লজিক নেই! তাছাড়া দু'জনেই গাড়িতে বেরিয়েছিলেন। সেই দুটো গাড়ি গেল কোথায়?"

অর্ণব এবার পুরো ব্যাপারটা বুঝল। সত্যিই ব্যাপারটা রীতিমতো গোলমেলে! এবং এই মুহূর্তে তারা সম্পূর্ণ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে।

"বড়জোর দীঘা বা মন্দারমণিতে যাওয়া সম্ভব। পুলিস একটু অ্যালার্ট থাকুক, কিন্তু আমার মনে হয় ওঁরা ওখানেও নেই।" অধিরাজ আপনমনেই বিড়বিড় করে, সম্ভবত জয়সওয়াল এই সর্বনাশিনীর সঙ্গে সর্বনেশে সওয়াল-জবাবটা কলকাতাতেই করছেন। কিন্তু প্রশ্ন হল কোথায়! কোথায় হতে পারে...! কোথায় হওয়া সম্ভব!" -

বলতে বলতেই হঠাৎ তার চোখের দৃষ্টি তীব্র হয়ে ওঠে। কী ভেবে সচকিত হয়ে ডাকল, "অর্ণব!" "স্যার?"

"এখনই বিজয় জয়সওয়ালের বাড়ি যাও। মিসেস জয়সওয়ালকে জিজ্ঞাসাবাদ করো। আই থিঙ্ক, ইনিও গাড়িতেই বেরিয়েছিলেন। ওঁর গাড়ির নম্বরটা নিয়ে ট্র্যাফিক পুলিসকে অ্যালার্ট করো। ওদের সমস্ত সিগন্যালের সিসিটিভি ফুটেজ দেখতে বলো। কোনও না কোনও ফুটেজে নিশ্চয়ই গাড়িটাকে দেখতে পাবে। ভদ্রলোকের ঘর তন্নতন্ন করে খোঁজো। আমার ধারণা ওঁর পাসপোর্টটা ওখানেই আছে। মিসেস জয়সওয়ালকে জিজ্ঞাসা করবে যে মিঃ জয়সওয়ালের কলকাতায় কটা ফ্ল্যাট বা বাড়ি, ফার্মহাউস আছে। সেগুলোতেও সার্চ অপারেশন চালাও। দরকার পড়লে শোরুমে ভদ্রলোকের কেবিনটাও সার্চ করো।

কোথাও কিচ্ছু বাদ দেবে না! কাগজের টুকরো, পলিথিন, যা দেখবে, এভিডেন্স ব্যাগে তুলে আনবে। সাইবার সেলকে ওঁর ফোনের লাস্ট লোকেশন, আর সর্বনাশিনীর লেটেস্ট আই.পি অ্যাড্রেসটা ট্র্যাক করতে বল। আমিও একবার দেখি, পুলিস কেন এই প্রোফাইলের আইপি অ্যাড্রেস পাওয়া সত্ত্বেও কিছু করতে পারেনি!”

– “ওকে স্যার।”

– “আর এই সব ইনফর্মেশন আমার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চাই অর্ণব।” অধিরাজের দু চোখে দুশ্চিন্তা, “আপাতত সর্বনাশিনীকে চেজ করছি না। মনে রেখো, আমাদের এখন একটাই উদ্দেশ্য। বিজয় জয়সওয়ালকে যে করেই হোক, জীবিত অবস্থায় পাওয়া। যে লোক অলরেডি দু-দুটো খুন করে ফেলেছে, যা প্রায় পারফেক্ট ক্রাইমের পর্যায়ে পড়ে, সে কাঁচা কাজ করার লোক নয় এবং যখন ডেসপারেটলি ডেথ ফোরকাস্ট করছে, তার মানে একদম ফুল টাইট প্রস্তুতি নিয়েছে। এ কেস সাধারণ নয়। এটা আমাদের অ্যাসিড টেস্ট!”

অর্ণব বিনা বাক্যব্যয়ে দ্রুতপদে নিজের কাজগুলো বুঝে নিতে চলে যায়। অধিরাজ সর্বনাশিনীর ছবিটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। অদ্ভুত সুন্দরী! যদিও একটু নিগ্রোবটু ধরনের চেহারা। একরাশ কোঁকড়া কোঁকড়া চুল জলপ্রপাতের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছে নীচের দিকে। ঈষৎ তীর্যক চাউনি। এককথায় মদিরাক্ষী। মুখের আদল চমৎকার। হাসিটা ভারী আলো ঝলমলে সরল! এককথায় কালো বিদ্যুৎ!

ছবিটা দেখতে দেখতেই তার মনে হল, ছবির মেয়েটাকে খুব চেনা চেনা ঠেকছে। এই মুখ সে আগেও কোথাও দেখেছে। এই হাসি, এই চোখ, এই কোঁকড়া-কোঁকড়া চুল! অত্যন্ত পরিচিত!”

দেখেছে তো বটেই! অধিরাজের চোখ কুঁচকে যায়। সে নিশ্চিত এই চেহারাটা দেখেছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, কোথায়?

(চার)

বাইরে তখন প্রচণ্ড জোরে বৃষ্টি হচ্ছিল। একটু আগেই ঝড় রীতিমতে তাণ্ডব করে গিয়েছে। ফলস্বরূপ হয়তো কোথাও ইলেক্ট্রিকের তার ছিড়ে পড়েছে। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ডুবে গিয়েছে গোটা চত্বর। তার মধ্যেই সৃষ্টি মুখরতা। একটানা বৃষ্টিপাতের শব্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে গুড়গুড়িয়ে উঠে মেঘ। ঝলসে ঝলসে ওঠে বিদ্যুতের প্রখর ভ্রূকুটি। তার তীব্র আলো জানলার কাচের ওপর পড়ে চমকে চমকে উঠছে।

অন্ধকারের মধ্যেই নিজের ঘরের বিছানায় গুটিশুটি মেরে বসেছিল মেয়েটি। অন্ধকারকে সে এখনও ভয় পায়। ছোটবেলায় তার ধারণা ছিল, অন্ধকার বুঝি একজাতীয় রাক্ষস। সুযোগ পেলেই ধরে গিলে নেবে। যে মূর্তিমান তমিস্রা ছোটবেলা থেকেই তাকে তাড়া করে আসছে, প্রত্যেকবার ভয় দেখিয়ে এসেছে, আজও তার খেলা শেষ হয়নি! আজও সে প্রতি পলে পলে তার অন্ধ চোখ নিয়ে সামনে আসে।

অথচ এখন তার অন্ধকারে বসে থাকার কথা নয়। ওদের হাউজিং কমপ্লেক্সে যে পাওয়ার ব্যাক-আপ আছে, তা পাশের ঘরের বন্ধ দরজার তলা দিয়ে ভেসে আসা এক চিলতে বৈদ্যুতিক আলোর উপস্থিতিতেই বোঝা যায়। অন্ধকারকে ভয় পাচ্ছে, তবুও এক অদ্ভুত জেদে ঘরে আলো জ্বালেনি সে। অ্যালিস বলে, ভয়কে সবসময় চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিতে হয়। তার মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। নয়তো ভয় তাকে হারিয়ে দেবে। তাই দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে অন্ধকারের মুখোমুখি বসিয়েছে।

“আমি পারব... আমি পারব... পারতেই হবে!”

আপনমনেই বিড়বিড় করতে করতে মেয়েটি ভয়ে ভয়ে আড়চোখে পাশের ঘরের দিকে তাকায়। ঐ তো, ঐ বন্ধ ঘরে আজও বসে আছেন। মিঃ বাজাজ । আজও নিশ্চয়ই তার সামনে পাতা আছে দাবার ছক! রোজই এইসময়ে তিনি দাবা খেলেন। সাদা রানি প্রতিদিনই খেয়ে ফেলে কালো রানির ভাগ্যকে! আকণ্ঠ মদ্যপান করেন, আর তারপর...। আকাশে ঘন মেঘ সশব্দে গুড়গুড়িয়ে ওঠে। একঝলক বিদ্যুতের নীলাভ আলো যেন ছিটকে এসে পড়ল মেয়েটির মুখে। সেই সামান্য আলোতেই দেখা গেল তাকে। কৃষ্ণাভ অথচ পেলব

মসৃণ মুখ ঘিরে ঘন মেঘের মতো ছড়িয়ে আছে কোঁকড়া-কোঁকড়া চুলের রাশ। সামান্য উঁচু কপালের নীচে একজোড়া ঝকঝকে অথচ ভীরু চোখ। ঠোঁটদুটো এক অব্যক্ত ভয়ে অল্প অল্প কাঁপছে। মুখের ভাঁজে ভাঁজে প্রকট আশঙ্কা!

মেয়েটি এবার আস্তে আস্তে বিছানা থেকে নেমে আসে। কী যেন একটা প্রচণ্ড সংকল্পে এখন তার চোয়াল দৃঢ় হয়ে উঠেছে। পা টিপে টিপে হাঁটার ভঙ্গিতে গোপনীয়তা স্পষ্ট। এখনও মন্ত্র পড়ার মতোই বলে চলেছে, —"পারতেই হবে!... পারতেই হবে... পারব...!" কিন্তু কী যে পারতে হবে কিংবা কী যে পারবে তা এখনও স্পষ্ট নয়।

বাইরে বৃষ্টির বেগটা আরও বাড়ল। বৃষ্টিপতনের প্রবল শব্দে প্রায় আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না! মেয়েটির কানে অবশ্য তখন জাগতিক কোনও শব্দের আভাস নেই। সে শুধু নিজের হৃৎস্পন্দনের শব্দ শুনতে পাচ্ছিল। বুকের ভেতরে হৃৎপিণ্ডটা এখন উত্তেজনায় প্রায় লাফাচ্ছে। নিজের দেহের প্রতিটা ধমনী, শিরা-উপশিরায় রক্তের দ্রুত চলাচলটুকুও টের পাওয়া যায়। সমস্ত রক্তনালী কাঁপিয়ে, ঝনঝনিয়ে চলেছে রক্তপ্রবাহ। প্রচণ্ড উত্তেজনায় নিঃশ্বাসের তাল দ্রুত! মনে হচ্ছে, হৃৎপিণ্ডটা বুঝি ফেটে যাবে! সমস্ত দেহ উত্তাপ ছড়াচ্ছে।

চলতে চলতেই সে বন্ধ দরজার কাছে এসে থমকে দাঁড়ায়। এরপরের কাজটা খুব সহজ নয়। মেয়েটা ঠোঁট কামড়াল। অন্ধকার, ভয়ের এক নাম। কিন্তু তার চেয়েও বড় ভয়ের নাম মিঃ বাজাজ! তিনি এই মুহূর্তে ঐ ঘরে বসে আছেন। এই বন্ধ দরজা খুললেই দেখা যাবে তাঁকে। আরামকেদারায় ঠেস দিয়ে নিমগ্ন চিত্তে তাকিয়ে আছেন চেসবোর্ডের দিকে! তাঁর পছন্দের সাদা রানি, কালো রানিকে মাত দেওয়ার জন্য গুটি গুটি এগোচ্ছে। কিন্তু কিস্তিমাতের আগেই থামানো দরকার ওঁকে। থামাতেই হবে...! পারতে হবে...!

আবার একটা কড়কড় শব্দ! পরক্ষণেই বজ্রপাত! একঝলক আগুন বুঝে নিয়ে কোথাও বুঝি বাজ পড়ল। মুহূর্তের প্রকাশে আবার দেখা গেল মেয়েটির মুখ। ভয় পেলে অনেকসময় মানুষের মুখ মুখোশের মতো হয়ে যায়। তার মুখও এখন অবিকল ভয়াল জাপানি মুখোশের মতো দেখাচ্ছে। রক্তশূন্য, ভীত!

সে অতি সন্তর্পণে দরজাটা খুলল। এমন নিঃশব্দে দরজাটা খুলে গেল, যেন মেয়েটি নয়... নিয়তি এসে দাঁড়িয়েছে দরজার ওপ্রান্তে। সামান্য ফাঁক করে দুটো সতর্ক চোখ ভেতরের দিকে উঁকি মারল। ভেতরের দৃশ্যটা দেখার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। এখন ঠিক কী করছেন মিঃ বাজাজ? টের পেয়েছেন কি কিছু?

সামনের দৃশ্যে অবশ্য তেমন কোনও বিপদসঙ্কেত পাওয়া গেল না। এখান থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে আরামকেদারায় কেউ একজন বসে আছেন। তার মাথার ওপরে কোহিনূর হীরের দ্যুতি নিয়ে ঝলমল করছে দামি অ্যান্টিক ঝাড়বাতি। সামনে শৌখিন কাচের টেবিল। টেবিলের ওপর হুইস্কির বোতল আর গ্লাস। তার পাশে চেসবোর্ড। খেলাটা এখনও অমীমাংসিত। মানুষটিকে এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না। শুধু তাঁর একটা হাত এলিয়ে পড়ে আছে আরামকেদারায়।

অতি সন্তর্পণে নীরবে, সরীসৃপের মতো ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ল মেয়েটা। মিঃ বাজাজের রুচি ভারী উদ্ভট ধরনের। এই ঘরটাকে দেখলে ঘর কম, মিউজিয়াম বেশি মনে হয়। কী নেই এ ঘরে! একদিকের দেওয়ালে সারি সারি পুরনো অ্যান্টিক ঘড়ি। যখন সব ক'টা একসঙ্গে বাজতে থাকে তখন কান পাতা দায়। অন্যদিকে টাঙানো আছে অনেক মুখোশ! মুখোশগুলোর মধ্যে কোনটা যে সবচেয়ে বেশি ভয়াবহ সঠিকভাবে বলা মুশকিল! সবকটাই এমন ভয়ঙ্কর যে দেখামাত্রই আঁতকে উঠতে হয়।

অথচ প্রত্যেকটাই নাকি অত্যন্ত দামি! মিঃ বাজাজ দেশ বিদেশ থেকে কিনে এনেছেন। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ঢেলে এইরকম বীভৎস মুখোশ কেনার মানে যে কী, তা তাঁকে জিজ্ঞাসা করার সাহস আজ পর্যন্ত কারোর হয়নি। মিঃ বাজাজ কারোর কথা শোনেন না। তাঁর কোনও কাজের কৈফিয়ত দেওয়াও পছন্দ করেন না।

মেয়েটির দৃষ্টি এবার দেওয়াল ছেড়ে দেওয়াল সংলগ্ন প্রকাণ্ড মেহগনির টেবিলের দিকে গেল। সেখানে এখন শোভা পাচ্ছে নানারকমের দামি অ্যাশট্রে। কোনওটা আইভরির, কোনওটা রুপোর। ধূমপায়ীদের জন্য একটা অ্যাশট্রেই যথেষ্ট। কিন্তু যেহেতু লোকটির নাম মিঃ বাজাজ, সেহেতু একগাদা অ্যাশট্রে থাকবেই। রয়েছে একটি রত্নখচিত কলমদানি। বেশ কয়েকটা বহুমূল্য বিদেশি পেন সুন্দরভাবে সাজানো আছে তার গর্ভে। তারপাশেই

ফুলদানি, কয়েকটা রুপোর কয়েন ইতস্ততঃ ছড়ানো, সিল্কের রুমাল, বেশ কয়েকটি পুরনো বই যার মলাট নেই, একটা শৌখিন কফি মাগ, সিগারেটের প্যাকেট, ছোট ছোট কিছু জাপানি পুতুল, একটি সোনালি রঙের লাফিং বুদ্ধ, পোর্সেলিনের একটি নগ্ন নারী মূর্তি, খাঁটি ফরাসি আতরের খালি শিশি, ভিন্টেজ ওয়াইনের কয়েকটা বোতল, একটা সুন্দর কারুকার্য করা বাঁটওয়ালা বিপজ্জনক ভোজালি এবং আরও অনেক কিছু!

মেয়েটির ভুরু কুঁচকে যায়। এসব টেবিলের ওপরে জড়ো করে রাখার মানেটা কী! যেখান থেকে যা পেয়েছেন মিঃ বাজাজ সব সাগ্রহে নিয়ে এসেছেন এবং যথারীতি দু'দিন পরেই সেই মূল্যবান জিনিসটার ওপর আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন। ফলস্বরূপ সেগুলো এখন অযত্নে টেবিলের ওপর গড়াগড়ি খাচ্ছে। মিঃ বাজাজ এরকমই! যে কোনো জিনিস, তা বস্তু হোক, কী মানুষ, একবার হাসিল করে ফেলার পরই আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন! তখন তার এই অবস্থাই হয়! অনাদৃত হয়ে পড়ে থাকে। মেয়েটির লোভাতুর দৃষ্টি সোনালি বাঁটের কারুকার্য করা ভোজালিটার ওপরে পড়ল। তার চোখ চকচক করে ওঠে। এই সেই তুরস্কের ভোজালি, যেটা একসময়ে এক কুখ্যাত খুনীর সম্পত্তি ছিল। এই ভোজালি মানুষের রক্তের স্বাদ পেয়েছে। আজও তার তীক্ষ্ণ ফলা চূড়ান্ত নিষ্ঠুরতায় চিকচিকিয়ে উঠছে। হয়তো রক্তপিপাসু অস্ত্রটা নিজস্ব অভিজ্ঞতায় বুঝতে পেরেছে যে আজ আবার তেমনই একটা মুহূর্ত আসতে চলেছে, যা একসময় অতীতে এসেছিল!

সে শিকারী বিড়ালের মতো নিঃশব্দ পায়ে ছুরিটার দিকে এগোতে থাকে। মিঃ বাজাজ এখনও তার উপস্থিতি টের পাননি। তিনি আপনমনে আরামকেদারায় হেলান দিয়ে দাবা খেলতেই ব্যস্ত। নিজের খেলায় এতটাই মগ্ন যে এই মুহূর্তে কানের কাছে অ্যাটমবোমা ফাটলেও বোধহয় টের পাবেন না। এই সুযোগ...!

ভীষণ উত্তেজনায় মেয়েটা আরও একটু এগোতে গিয়েই আচমকা একটি স্ট্যান্ডের ওপরে রাখা ফুলদানির সঙ্গে ধাক্কা খেল! নীল স্বচ্ছ কাচের ফুলদানি সপাটে মেঝেতে পড়ে গিয়ে প্রবল ঝনঝন আওয়াজ তোলে! সে ভয় বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেখল ফুলদানিটা পুরো টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে!

— "ওঃ!"

ভয়ের চোটে মেয়েটা দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেলে। সর্বনাশ! মিঃ বাজাজের শখের ফুলদানি ভেঙে গিয়েছে! এবার কী করবে সে? তার থেকেও ভয়ের কথা যে মিঃ বাজাজ ঠিক কী করবেন? কোমরের বেল্ট দিয়ে পেটাবেন? না পিঠে গরম ইস্ত্রির ছ্যাঁকা! অথবা আরও কঠিন কোনও শাস্তি! কী হবে এবার!

"মিঃ বাজাজ, আমি ইচ্ছে করে ভাঙিনি! ওটা জাস্ট ভেঙে গেল। প্লি...জ বিলিভ মি!" -

কান্নামাখা কাতর স্বরে বলল সে। যেন এক অবোধ শিশু ভুল করে ফেলে মাফ চাইছে। তার কণ্ঠস্বর কাঁপছে। শব্দগুলো আটকে-আটকে যাচ্ছে। তবু কোনোমতে তোতলাতে-তোতলাতে বলে— "ফরগিভ মি!

আই অ্যাম সরি! আমায় মেরো না... ম... ম... মেরো না! প... প্লিজ!" মিঃ বাজাজ কোনও উত্তর দিলেন না। তিনি এখনও দাবাখেলাতেই মগ্ন। শুধু মেয়েটি যেন শুনতে পেল ভদ্রলোক সেই আগের মতো চাপা হিসহিসে কণ্ঠে বললেন, "ই ফোর টু ই ফাইভ।"

"আই অ্যাম সরি!"

মেয়েটা অসহায়ের মতো কাঁদছে এবং থরথর করে কাঁপছে। কী করবে, কী বলবে বুঝে উঠতে পারছে না। তার চোখের একফোঁটা জল নাক বেয়ে টুপ করে খসে পড়ল চিবুকের ওপরে। তীব্র বৈদ্যুতিক আলোয় ঝিকমিকিয়ে উঠল অশ্রুবিন্দু । যেন চকচকে কালো গ্র্যানাইটের বুকে ঝলমল করছে এক কুঁচি হীরে !

– "ই ফোর টু ই ফাইভ!"

মিঃ বাজাজ আবার চাপা অথচ ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন। সে অপরাধীর মতো মাথা নীচু করে তার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। মিঃ বাজাজের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আড়চোখে তাকাল তার দিকে। মিঃ বাজাজও এখন তার দিকেই তাকিয়ে আছেন। লোকটার চোখ দুটো কী শীতল! অভিব্যক্তিহীন! যার শুভবুদ্ধি মরে গিয়েছে সে বোধহয় এমনভাবেই তাকায়। ঠিক যেন একটা সাপ...!

“এন সি থ্রি টু এন সি সিক্স।” মিঃ বাজাজ এখনও নির্বিকারভাবে তাকিয়ে আছেন তার দিকে। কোনও হেলদোল নেই। অদ্ভুত শাণিত দৃষ্টিতে যেন মাপছেন তাকে। ঠোঁটের কোণে নিষ্ঠুর হাসি। এ হাসি তার অতি পরিচিত। এ হাসি ভয়ঙ্কর!... -

– “আমায় মেরো না... প্লিজ!” মেয়েটি কান্নামাখা অনুনয় করে... ‘‘আ...আমি কিছু করিনি......... আমি ঐ লোকটাকেও কিছু করিনি.... ও কী করে মরে গেল জানি না! আমি ওদের কাউকে মারতে চাইনি...!”

মিঃ বাজাজ কোনও উত্তর দিলেন না। এখনও নির্বাক অথচ রহস্যময় হাসিটা ঝুলছে তার ঠোঁটের কোণে। ভীষণ ঠান্ডা দুটো চোখ ছুরির মতো বিঁধছে!

ছুরির কথা মনে পড়তেই হঠাৎ যেন একটু সাহস ফিরে পেল সে। আড়চোখে একঝলক দেখে নিল ছুরিটাকে। শুকনো ঠোঁট চেটে নিয়ে কোনোমতে বলল,

“তুমি আমাকে মারবে না! নয়তো আমি তোমাকে মারব...! হ্যাঁ...হ্যাঁ! তোমাকেই মারব। তুমি আমাকে হারাতে পারো না। তুমি...” “কুইন টু এইচ ফাইভ! চেক অ্যান্ড মেট!”

শান্ত অথচ ক্রূর স্বরে উত্তর এল। মেয়েটি শিউরে ওঠে! চেক মেট! এটা কিছুতেই হতে দেওয়া চলবে না! ওঁকে থামানো দরকার ! এই মুহূর্তেই থামানো দরকার! কিন্তু কীভাবে...!

সে বিদ্যুৎগতিতে চোখের পলকে সামনের টেবিল থেকে তুলে নিল তুরস্কের সেই কুখ্যাত ছুরি! মিঃ বাজাজ কিছু বোঝার আগেই তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে মেয়েটা। পাগলের মতো কোপের পর কোপ মারতে মারতে বলল— “শ—য়—তা-ন! স্কাউন্ড্রেল! আমাদের সবার লাইফ নষ্ট করেছ তুমি...। কী ভেবেছ? তুমি ডিক্টেটর? যা বলবে, যা করবে... সব চুপচাপ সহ্য করতে হবে?... ইউ বা-স্টা-র্‌ড!...নে! নে!...এই নে!”

মিঃ বাজাজের মুখ দিয়ে একটা কাতরোক্তিও বেরোল না! সামান্য শব্দটুকু করার সুযোগও পাননি। ছুরির আঘাতে কেঁপে কেঁপে উঠছে তাঁর দেহ! তিনি টুঁ-শব্দটিও না করে কাত হয়ে পড়লেন আরামকেদারার চেয়ারের ওপরে!...

“বে--বি!”

মেয়েটি পাগলের মতো একের পর এক কোপ বসিয়েই যাচ্ছিল। একটা তীব্র স্বরে সচকিত হয়ে তাকাল। খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে অ্যালিস। সম্ভবত সে

এতক্ষণ কিচেনে ছিল। পরনে কুকের অ্যাপ্রন! তার চিৎকারের শব্দ শুনে ছুটে এসেছে। এমনিতেই অ্যালিস ভীষণ পৃথুলা। অতবড় চেহারাটা নিয়ে দৌড়ে আসতে ঘেমে গিয়েছে। তার ওপর চোখের সামনে এই দৃশ্য! সে দেখল, অ্যালিসের দৃষ্টিতে ভীষণ ভয়! জোরে জোরে শ্বাস টানছে আর দরদর করে ঘামছে মহিলা! কোনোমতে বলল, “ওঃ ডিয়ার! হোয়াট হ্যাভ ইউ ডান!”

এতক্ষণে তার চেতনা ফিরল! একটা অস্ফুট শব্দ করে সে মিঃ বাজাজকে ছেড়ে কয়েক পা পিছিয়ে যায়। কিছুক্ষণ বোধহীনের মতো দাঁড়িয়ে থাকল। কী করে ফেলেছে, সেটা বুঝতে হয়তো কয়েক মুহূর্ত লাগল তার। পরক্ষণেই সে পাগলের মতো ছুটে যায় অ্যালিসের দিকে। যন্ত্রণাকাতর মানুষটা একটু আশ্রয়ের আশায় ছুটে গেল সেই অনন্ত স্নেহময়ীর দিকে, যে ছোটবেলা থেকে তাকে বুকে করে মানুষ করেছে। তার স্থূল দেহকে আঁকড়ে ধরে বুকফাটা কান্নায় ভেঙে পড়ল সে... আমি ওকে খুন করেছি... অ্যালিস, আমি ওঁকে মেরে ফেলেছি! আমি মারতে চাইনি, বিলিভ মি!... অ্যালিস তাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে, “আই নো! কুল ডাউন বেবি।” তার বুকে মুখ গুঁজে কান্নাবিকৃত স্বরে বলল মেয়েটা, “আমি কাউকে মারতে চাইনি! কাউকে নয়! কিন্তু ওরা সবাই একে একে মরে গেল!...ওরা মরে গেল!” "

অ্যালিস নীরবে মেয়েটির মাথায় হাত বোলাতে থাকে। তার স্পর্শে পরম মমতা আর সান্ত্বনা। অজান্তেই বুক ভেঙে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে।

আরামকেদারার ওপরে তখনও পড়ে রয়েছে মিঃ বাজাজের ছুরিবিদ্ধ দেহ। সামনে দাবার ছকে খেলা অমীমাংসিত। তাঁর চোখদুটো খোলা! দু' চোখে সেই ভয়ানক শীতল দৃষ্টি!”

যেন মানুষটা কোনওদিন বেঁচেই ছিল না!

(পাঁচ)

"ফু—লে ফু—লে, ঢ—লে ঢ—লে, ব—হে কী-ই বা মৃদু বায়...!" এতক্ষণ ফরেনসিক ল্যাব চুপচাপই ছিল। সচরাচর এমন নিস্তব্ধই থাকে। ফরেনসিক এক্সপার্ট ডঃ অসীম চ্যাটার্জী ল্যাবে যন্ত্রপাতির স্বাভাবিক হালকা টুং টাং-ঠুং ঠাং ছাড়া কোনওরকম উঁচু শব্দ বরদাস্ত করেন না। এমনকি সামান্য গল্পগুজব করলেও ল্যাবের কঙ্কালগুলোর মতোই দাঁত ছরকুটে হাঁই হাঁই করে তেড়ে মারতে আসেন। তাই তাঁর অধস্তন কর্মীরা তাঁর সামনে ভয়ের চোটে প্রায় 'মগ্ন মৈনাক' হয়ে থাকে।

আজও সকলেই ঘাড় গুঁজে চুপচাপ নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত ছিল। আচমকা রবি ঠাকুরের গান কানে আসতেই অবাক হয়ে তাকাল। ডঃ চ্যাটার্জীর ল্যাবে এরকম তারস্বরে বেসুরো গান কে গাইছে! কার এত স্পর্ধা যে স্বয়ং মা মনসাকে ধুনোর ধোঁয়া দেয়!

অনেকগুলো কৌতূহলী চোখ একসঙ্গে গানের উৎসের দিকে তাকায়। কিন্তু তাকিয়ে যা দেখল তাতে তাদেরই আত্মারাম খাঁচাছাড়া হওয়ার উপক্রম! গায়কটি আর কেউ নয়, স্বয়ং ডঃ চ্যাটার্জী! বুড়োর প্রাণে হঠাৎ কী ফূর্তি হয়েছে কে জানে, কথা নেই বার্তা নেই গলা ছেড়ে গান ধরেছেন! শুধু একা গানে রক্ষা নেই, সঙ্গে পা ঠুকে ঠুকে ভুলভাল তালও দিচ্ছেন! উপস্থিত সকলেই প্রায় কনফিউজড 'ৎ'-এর মতো পরস্পরের মুখ দেখছে! সকলের চোখে একটাই অনুচ্চারিত প্রশ্ন, "বুড়ো পেগলে গেল নাকি?"

ডঃ চ্যাটার্জীর সবচেয়ে একনিষ্ঠ ও দক্ষ কর্মী, তথাকথিত "ডান হাত" আহেলি মুখার্জী লাঞ্চ পর্ব শেষ করে গুটি গুটি ল্যাবে ঢুকছিল। এমনই কপাল যে গান শুনে সেও ঘাবড়ে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। আর পড়বি তো পড় একেবারে বুড়োর সুমুখে! তাকে দেখেই ডঃ চ্যাটার্জী গান থামিয়েছেন। আহেলি সভয়ে দেখল তাঁর ভুরুযুগল ফের শুঁয়োপোকা মূর্তি ধারণ করেছে। ফুলে ফুলে ঢলে ঢ—লে' থামিয়েই পেটেন্ট খ্যানখ্যানে স্বরে বলে উঠলেন, "মাস রেপ-মার্ডার-অ্যাসিড কেসের মক্কেলের রিপোর্ট তৈরি করেছ? ফাইল রেডি তো?"

বেচারি ঢোঁক গিলে আমতা আমতা করে বলে, "আরেকটু বাকি আছে স্যার। সিমেনের ডি.এন.এ রিপোর্টটা পেতে একটু দেরি হয়েছে...তাই!"

- "দেরি করছ তো তুমি!" রীতিমতো খ্যাকখ্যাক করে উঠলেন ভদ্রলোক। "এরকম অ্যানিমিক পেশেন্টের মতো কুঁইকুঁই করে কথা বলছ কেন? লাঞ্চে কী খেয়ে এলে? সাবু?"

কপালদোষে আহেলি প্রশ্নের পেছনের ব্যঙ্গটা ধরতে পারেনি। মিউমিউ করে বলল, "আজ্ঞে না। রুটি আর কাঁচকলার কোপ্তা!"

"কাঁচকলা!" ডঃ চ্যাটার্জী এমন মুখভঙ্গি করেছেন, যেন সে কাঁচকলা নয়, পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়ে ফেলেছে! কড়া করে কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেলেন। একমুহূর্ত চুপ করে থেকে তুলনামূলক ঠান্ডা গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, "কাঁচকলার কোপ্তার রেসিপিটা কী?" -

আহেলি প্রমাদ গোণে। এটা সম্পূর্ণ সিলেবাসের বাইরে! সে বেচারা চিরকালই বীকার, বার্নার, টেস্টটিউব, কেমিক্যাল-অ্যাসিড বা সল্ট, বিষ, সলিউশন প্রভৃতি ঘেঁটে অভ্যস্ত। জীবনেও হাতা খুন্তি নাড়েনি। কাঁচকলা আর এঁচোড়ের মধ্যে পার্থক্য কী, সেটাও সে বোঝে না! এবার এই ভয়ঙ্কর গুগলির উত্তর কী দেবে!

ডঃ চ্যাটার্জী তার মুখ দেখে বুঝে গেলেন যে এই মেয়ে রান্নার কিছুই জানে না। তাকে আরও একটু খোঁচানোর জন্য বললেন, "কাঁচালঙ্কা আর কুমড়োর খোলা দিয়ে শুক্তো বানাতে পারো?"

সর্বনাশ! আহেলি 'কাঁচকলার কোপ্তা'র ধাক্কায় ইতিমধ্যেই হাফ কুপোকাত! তার ওপরে আবার কাঁচালঙ্কা আর কুমড়োর খোলা দিয়ে শুক্তো এসে পড়েছে! সে কী করবে ভাবছিল তার আগেই একটা গম্ভীর অথচ মোলায়েম কণ্ঠস্বর ঠিক পেছন থেকেই বলে উঠল, "ডক! ইউ আর জাস্ট নর্ম্যান্ডিক্যালি গর্ম্যান্ডেড বাই দ্য ডোমফ্যাক্টি অফ ইওর ক্যারেক্টার!" —"ক্ষীঃ!" ডঃ চ্যাটার্জী আহেলির পেছনে এসে দাঁড়ানো লোকটিকে দেখে প্রায় চিড়বিড়িয়ে উঠলেন, "রাজা, কীসব ভুলভাল বকছ! নর্ম্যান্ডিক্যালি গর্ম্যান্ডেড আবার কী জিনিস? ডোমফ্যাক্টি খায় না মাথায় মাখে? মঙ্গলগ্রহের ভাষা বলছ নাকি? মার্সিয়ান ল্যাঙ্গোয়েজ?"

— “কী করব!” অধিরাজ ওরফে রাজা ঠোঁট টিপে হেসে নিরীহভাবেই বলে, “আপনার কাঁচালঙ্কা আর কুমড়োর খোলার শুক্তোও তো পৃথিবীর রেসিপি বলে মনে হচ্ছে না! সেটাও ঠিক ততটাই নর্ম্যান্ডিক্যালি গর্ম্যান্ডেড!”

ডঃ চ্যাটার্জী একটা গলার গভীরে অস্ফুট ‘গরর ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ’ শব্দ করে ব্যাপারটা বেমালুম চেপে গেলেন। আহেলির দিকে তাকিয়ে ফের খ্যাঁকখেঁকিয়ে উঠেছেন, “তুমি এখানে স্ট্যাচু স্ট্যাচু খেলছ নাকি! ‘থ’ হয়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন? লিভ্! আমার বিকেলের মধ্যেই ফাইল রেডি চাই। নাউ… শুঃ… শুঃ!”

‘শু’ মানে জুতো নয়। যারা ডঃ চ্যাটার্জীকে চেনে, তারা প্রত্যেকেই জানে এই ‘শুঃ… শুঃ’ এর অর্থ ‘কেটে পড়ো’। আহেলি তার রক্ষাকর্তার দিকে একটা সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিপাত করে সুড়সুড় করে কেটে পড়ল। অধিরাজ কোমরে হাত রেখে টানটান হয়ে ভারী সুন্দর ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছিল। সে মাথাটা নম্রভাবে সামান্য ঝাঁকিয়ে আহেলির কৃতজ্ঞতার সম্মান রাখল। আহেলি চলে যেতেই ডঃ চ্যাটার্জী তার দিকে অগ্নিদৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, “তুমি এমন অসময়ে এসে টপকে পড়লে কেন? এখনও কোনও লাশ আসেনি যে যখন তখন এসে আমায় জ্বালাতে শুরু করবে। স্রেফ পুলিসের ফরেনসিক রিপোর্ট আর কিছু স্যাম্পল এসেছে।”

– “না ঠিক লাশের জন্য নয়!” অধিরাজ নির্বিকার ভঙ্গিতে জানায়— —“শুনলাম ফরেনসিক ল্যাবে নাকি হাঁড়িচাচা ঢুকে পড়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইছে! তার অত্যাচারে ফরেনসিক ডিপার্টমেন্ট অতিষ্ঠ! এমনকী বিশ্বস্ত সূত্রে জানলাম সঙ্গে রবিঠাকুর পর্যন্ত কানে আঙুল দিচ্ছেন। সিরিয়াস কেস। অগত্যা আমাকেই আসতে হল।”

ডঃ চ্যাটার্জী প্রায় লাফ "মেরে উঠলেন! চিৎকার করে বললেন, “কুৎসিত, কদাকার, পাষণ্ড, পাজি কোথাকার! একটাও ক্লু দেবো না তোমায় হতভাগা বাঁদর ছেলে!”

অধিরাজ ব্লেজারের পকেট থেকে একখানা ডিভিডি বের করে ডঃ চ্যাটার্জীর নাকের সামনে নাড়তে নাড়তে বলল, “শিওর ডক্? সত্যিই দেবেন না?”

ডঃ অসীম চ্যাটার্জী দেখলেন সেটা ‘পদ্মাবত’ ফিল্মের অরিজিনাল ডিভিডি। টাকলু বুড়ো পৃথিবীতে লাশ ছাড়া যদি আর কিছুর দিকে তাকায় তবে সে হল দীপিকা পাডুকোন!

ডঃ চ্যাটার্জীর একমাত্র ক্রাশ! অনেকদিন ধরেই তিনি ফিল্মটা দেখার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু ব্যস্ততার দরুণ আর পেরে ওঠেননি। অধিরাজ তাঁকে 'ইউটিউব' থেকে দেখে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিল। অথচ বুড়ো এমনই টেক-এক্সপার্ট যে রেগেমেগে বলল, "ফাজলামি হচ্ছে! আমার বাড়িতে অনেক টিউব আর বাল্ব আছে। খামোখা নতুন টিউব কিনে কী করব!"

বলাইবাহুল্য, এবার ডিভিডিটা দেখেই বুড়োর মুখ একেবারে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, "পদ্মাবত! আমার জন্য?"

"না না!" সে আড়চোখে ডঃ চ্যাটার্জীর দিকে তাকিয়ে অপরূপ ভ্রূভঙ্গি করে, "আপনার জন্য নয়। এ.ডি.জি শিশির সেন বেশ কিছুদিন ধরেই পদ্মাবত দেখার বায়না করছিলেন। তাঁর জন্যই এনেছি। আপনি তো আবার দীপিকাকে পছন্দ করেন না! বাই দ্য ওয়ে, সকলেই বলছে দীপিকাকে নাকি পদ্মাবতীর মেক-আপে দারুণ দেখাচ্ছে!"

ডঃ চ্যাটার্জী কিছুক্ষণ গুম মেরে থাকলেন। তারপরই ফোঁস করে একটা শ্বাস ফেলে বললেন, "ফাইন, যেটুকু আন্দাজ করতে পারছি, বলছি। কিন্তু আগে ডিভিডিটা দাও। তোমায় বিশ্বাস নেই বাপু।"

অধিরাজ ফের শিশুসুলভ হেসে ডিভিডিটা তাঁকে দিয়ে বলল, "প্লিজ প্রসিড।"

ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্টরা এতক্ষণ গোটা ঘটনাটাই হাঁ করে দেখছিল। চ্যাটার্জী তাদের দিকে তাকিয়ে দাঁত কিড়মিড় করে বললেন, "এখানে কি মেগাসিরিয়াল চলছে নাকি?"

সঙ্গে সঙ্গেই ফরেনসিক ল্যাব ফাঁকা। সকলেই হঠাৎ খুব দ্রুততার সঙ্গে। কোথায় পাতলা হয়ে গেল কে জানে! এখানে ডঃ চ্যাটার্জী আর অফিসার ব্যানার্জীর কেমিস্ট্রি সর্বজনবিদিত। দু'জনের সম্পর্ক অনেকটা স্বামী-স্ত্রীর মতো। লাভ অ্যান্ড হেট রিলেশন। নাকে নাক লাগিয়ে ঝগড়াও করা চাই আবার একজনের আরেকজনকে ছাড়া চলে না। অতএব দু'জনের নাটকের মাঝখানে না থাকাই ভালো।

"দ্যাখো ছোঁড়া, পুলিসের ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ যা বলেছেন তা থেকে বেশি কিছু এক্সপেক্ট কোর না। আমি সুপারম্যান নই। তবু কি জিনিস আমার মনে হয়েছে যা ফরেনসিক রিপোর্টে নেই।"

বলতে বলতেই ডঃ চ্যাটার্জী কিছুটা স্কিন স্যাম্পল, কিছুটা ব্লাড, ভিকটিমের জামা-কাপড় আর বেশ কিছু ছবি এনে টেবিলে রাখলেন, "এগুলো আজ সকালেই এখানে ট্রান্সফার করে দেওয়া হয়েছে। প্রথমবার পুলিস ব্যাপারটাকে অত গুরুত্ব দেয়নি বলে সব এভিডেন্স লাশের সঙ্গে ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয়বার ওদের বুদ্ধি খুলেছে। তাই এবার পোষাক শুদ্ধ ব্লাড স্যাম্পল, টিস্যু স্যাম্পল, স্কিন-হেয়ার স্যাম্পল প্রিজার্ভ করে রেখেছিল। আমি সেগুলো পরীক্ষা করে দেখেছি।"

অধিরাজ স্থির দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়েছিল। এখন সে মুখ খুলে না। তাঁর এইটুকু বিশ্বাস আছে বুড়ো যখন বলতে শুরু করেছে, তখন কিছু একটা ক্লু দেবেই। ডঃ চ্যাটার্জী বলতে থাকেন, "আমি ওদের রিপোর্ট। পড়েছি। ওরা ভুল করেনি। প্রথমজনের কেসটা ওদের কাছে নর্মালই ঠেকেছে। সেটার ব্যাপারে বলার কিছু নেই। তবে দ্বিতীয় লোকটার ব্লাডে, টিস্যুতে বা স্কিনে সত্যিই কোনও বিষের অস্তিত্ব নেই। ফরেনসিক এক্সপার্ট ভিসেরা করেছিলেন। বেচারি তন্নতন্ন করে প্রত্যেকটা বডি পার্টস ঘেঁটে দেখেছেন। পাকস্থলীতে কোনও বিষ নেই! বিষ তো দূর, এমনকি ভিকটিমের পাকস্থলীতে ফুড ট্রেসও নেই। অনেক বিষ আছে বা বিষাক্ত গ্যাস আছে যা ইনহেল করলে মৃত্যু হতে পারে। সেজন্য তিনি ফুসফুসও দেখেছেন। বাট লাংস নর্মাল। লাশের গায়ে সামান্য ছুঁচ ফোটানোর চিহ্নও নেই! বাধ্য হয়েই তিনি নর্ম্যাল ডেথের সার্টিফিকেট দিয়েছেন। উপায়ই বা কী ছিল! কিন্তু আমার এতদিনের অভিজ্ঞতা আর গাট ফিলিংস বলছে কোথাও কোনও বিষপ্রয়োগ হয়েছেই। তবে বিষটা লোকটার শরীরে ঢুকল কী করে? খাবারের মাধ্যমে তো নয়ই। অন্য কিছু সম্ভাবনাও অবশ্য আছে। প্রথমতো, ভদ্রলোক হয়তো পুরো বিশ্বামিত্র হয়ে খাওয়া দাওয়া ছেড়ে ধ্যান করছিলেন। কোনও মেনকা এসে তার ধ্যানভঙ্গ করে বলেছে, "মুখটা খোল তো বাবু, একটু বিষ ঢেলে দিই"। উনিও লক্ষ্মী ছেলের মতো হাঁ করেছেন। মেনকাও এমন বিষ ঢেলেছে যেটা হয় পাকস্থলীতে ট্রেস ছাড়ে না, নয়তো এতটাই স্বাভাবিক তার অস্তিত্ব যে চোখে পড়লেও অস্বাভাবিক মনে হয়নি।"

– "এরকম হতে পারে?"

– "নিশ্চয়ই। হয়তো সেই বিষটা এমনই সাধারণ যে বিষ বলে চেনা দায়। যেমন, ফর এগজাম্পল, 'অ্যাকোনাইট'।"

অধিরাজের মাথায় যেন বাজ পড়ে, "অ্যাকোনাইট! সে তো ওষুধ!" "ওষুধ ঠিকই, তবে দু'ধারি তরোয়াল!" তিনি জানান, "হোমিওপ্যাথিতে যে অ্যাকোনাইট ব্যবহৃত হয় সেটা জ্বর, রেস্টলেসনেস, সর্দি, কাশি সারাতে ওস্তাদ। আ গুড অ্যানালজেসিক। কিন্তু সেসব অ্যাকোনিটাম প্ল্যান্ট ছাড়াও কিছু এমন প্ল্যান্ট আছে যেগুলো অ্যাকোনিটাম স্পেশিজের মধ্যেই পড়ে। যেমন ডেভিলস হেলমেট বা মঙ্কশুড! এই অ্যাকোনিটাম প্ল্যান্টগুলো থেকে অ্যাকোনিটিন নামের একটা অ্যালকালয়েড - টক্সিন বের করা যায়। মোস্ট নটোরিয়াস পয়জন। পাকস্থলীতে থাকবে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্লাডে, বডি ফ্লুইডে অ্যাকোনিটামের ট্রেস পাওয়া যায়। এখানে তাও নেই। ভালো করে দেখেছি। সুতরাং অ্যাকোনাইট বাদ। আমি অবশ্য অন্য কাউকে সন্দেহ করছি। এমন কেউ যে দেখতে শুনতে ভীষন নিরীহ, অত্যন্ত স্বাভাবিক তার অস্তিত্ব। কিন্তু বদমায়েশ দি গ্রেট! অনেকটা তোমার মতোই তেঁএটে!"

—"কে? এমন কিছু আছে কি?"

— "অবশ্যই।" তিনি মাথা ঝাঁকালেন, "তুমি কি জানো যে পটাশিয়াম ক্লোরাইড একটি ভয়ঙ্কর মার্ডার ওয়েপন?"

অধিরাজ হাঁ—"পটাশিয়াম ক্লোরাইড! মানে সল্ট?"

—"সল্টেও ফল্ট আছে।" ডঃ চ্যাটার্জী হাসলেন, অতিরিক্ত মাত্রায় আই মিন, ওভারডোজ দিলে বা ইঞ্জেক্ট করলে কিডনি ফেইলিওর বা সাডেন কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়ে পটল তোলা কেউ আটকাতে পারবে না! কিন্তু পরীক্ষা করলে স্রেফ রক্তে পটাশিয়ামের মাত্রা একটু বেশি পাওয়া যাবে। কারণ পটাশিয়াম ক্লোরাইড সিস্টেমে ঢুকে পটাশিয়াম আর ক্লোরাইড আয়নে মেটাবলাইজড্ হয়ে যায়। ও দুটোই মানবশরীরে অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং অবশ্যই প্রয়োজনীয় বস্তু! ফরেনসিক বুঝতেই পারবে না যে লোকটা মরল কী করে! আমি ভাবছিলাম, তেমনই কিছু নয় তো! লিভার ড্যামেজ যদিও হয় না, তবে রেনাল ফেইলিওর সম্ভব। পুরোপুরি চান্স আছে যে দুই ক্রনিক মাতালের লিভার আগে থেকেই কেৎরে পড়েছিল। ওটা নেহাতই কো-ইনসিডেন্স। তাই প্রাথমিকভাবে রেনাল

ফেইলিওরকেই আসামী ভাবলাম। ব্লাডটা আরেকবার টেস্ট করে দেখলাম পটাশিয়াম বেশি আছে কি না। মজার কথা এই ভিকটিমের ব্লাডে পটাশিয়াম একটু বেশিই আছে! সুতরাং পটাশিয়াম ক্লোরাইডকে ক্লিনচিট দেওয়া যাচ্ছে না বস!"

"তাহলে কালপ্রিট পটাশিয়াম ক্লোরাইড?" অধিরাজ কৌতূহলী।

– "প্রাথমিকভাবে তেমনই মনে হচ্ছে। কিন্তু এখনই শিওর শট বলতে পারছি না। কী করে মালটা দিল সেটাই আমার কাছে এখনও রহস্য। পটাশিয়াম ক্লোরাইড ইঞ্জেক্ট বোধহয় করেনি। তাহলে অন্তত সিরিঞ্জের দাগ পাওয়া যেত। তবে আরও একটা তথ্য তোমায় দিতে পারি, যেটা বেশ ইন্টারেস্টিং। হয়তো কাজে লাগতে পারে।"

ডঃ চ্যাটার্জী একটু থেমে এবার নিজের টাকটাকে আদর করতে শুরু করেছেন। যখনই কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেন তার আগেই মস্তিষ্ককে একটু আদর করে নেওয়া তাঁর স্বভাব। অধিরাজ নীচু স্বরে বলল, "নার্সিসাস!"

– "কী!"

এই রে! বুড়ো শুনে ফেলেছে। সে সামলে নেয়, "না...না। বলছিলাম, জিনিয়াস!"

— "হুম।" ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ তার কথাকে বিন্দুমাত্রও পাত্তা না দিয়ে বললেন, "আমি এমনি এমনি ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে গাইছিলাম না। ভিকটিমের স্কিন স্যাম্পলের মধ্যে আমি অয়েল মলিকিউলের ট্রেস পেয়েছি। এবং সেটা যা তা অয়েল নয়। অ্যারোমা অয়েল। স্পেশ্যালি ল্যাভেন্ডার!"

"অ্যারোমা অয়েল!"

"ইয়েস। এটা তখনই সম্ভব যখন কেউ রেগুলার অ্যারোমাথেরাপি ম্যাসাজ নেয়। ইনি নিতেন।"

— "এক্সেলেন্ট।" অধিরাজ কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাঁর দিকে তাকিয়ে থেকে বলে, "আপনিও কি তাই ভাবছেন, যা আমি ভাবছি?"

- . "তুমি কী ভাবছ না জেনে বলব কী করে?" বুড়ো ফের খেঁকিয়ে ওঠে,—"আমি অন্তর্যামী নাকি?"

-"কোনওভাবে অ্যারোমা অয়েল ম্যাসাজের মাধ্যমেই বিষটা আসেনি তো? ভায়া স্কিন?" -

—"ছেলের বুদ্ধি আছে!" ডক্টর হাসলেন, "আমিও তাই ভেবেছিলাম। যদিও প্রমাণ নেই। স্কিনে পয়জনের কোনও ট্রেসই নেই। কিন্তু সম্ভাবনা মার্কেটের তেলে আছে। অ্যারোমা অয়েলটা খুব ভালো জাতের। এককথায় ইউনিক। আই মিন পাতি তেল, যা বাজারে পাওয়া যায় ঠিক তা নয়। ফ্লাওয়ার এক্সট্রাক্টের চেয়ে ভেজালই বেশি মেশানো হয়। কিন্তু এই তেলটা একেবারেই তা নয়। একদম খাঁটি চিজ! সম্ভবত এটা নিজস্ব ল্যাবরেটরিতে সযত্নে বানানো। আর যারা এসব অ্যারোমা, হার্বাল প্রোডাক্ট বা আয়ুর্বেদ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে তেল বানাতে পারে তারা গাছ-গাছড়ার বিষয়ে ওস্তাদ হয়! এমনকি রীতিমতো স্কলার বোটানিস্টও এর সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে। বিদেশ থেকে প্রয়োজনে নানারকম প্ল্যান্টস নিয়ে এসে রিসার্চ করতেই পারে। প্রাণদায়ী হার্বসের খবর যে রাখে, সে প্রাণঘাতী হার্বসের খবরও রাখতে বাধ্য। সুতরাং এমন কোনও দেশি বা বিদেশি ফ্লাওয়ার, রুট, প্ল্যান্ট থাকতেই পারে যা সর্বনেশে বিষ। মে বি, সে বিষটা এখনও ফরেনসিকের নজরে পড়েনি। হয়তো ল্যাভেন্ডারের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে তেমনই কিছু। অথবা কোনও মারাত্মক কোনও নার্ভ এজেন্ট। সোমান, সারিন বা তাবুনের মতো কিছু। যেটা স্কিনের মাধ্যমে অ্যাবসর্বড হয়ে মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে গিয়েছে। যদিও সেক্ষেত্রেও বোঝা যেত যদি না জিনিসটা সম্পূর্ণ আননোন হয়... !"

–"তাহলে আপনি ঠিক কী বলতে চাইছেন?" অধিরাজ এবার একটু অধৈর্য, "পটাশিয়াম ক্লোরাইড না আননোন অ্যারোমা অয়েল?"

এবার ডঃ চ্যাটার্জীও একটু সংশয়ান্বিত, "সেটাই তো বুঝতে পারছি না। পটাশিয়াম ক্লোরাইডের সম্ভাবনাটা থাকছেই। কিন্তু পাশাপাশি অ্যারোমা অয়েলের চান্সও কিছু কম নয়। অন্তত সম্ভাবনাটা মাথায় রেখো।"

"হুঁ! ল্যাভেন্ডার অয়েল!" -

অন্যমনস্কভাবে বলল অধিরাজ। সে এবার স্পষ্ট বুঝতে পারছে যে কেসটা ক্রমাগত ছড়িয়ে ছিয়াত্তর হচ্ছে। কী যে লিড দিলেন ডঃ চ্যাটার্জী। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে এবার উনিও শিওর নন। কোথায় অন্ধকার একটু হালকা হবে, উলটে আরও বেড়ে গেল। কলকাতায় অ্যারোমা ক্লিনিক আর স্পা-স্যালোনের সংখ্যা কিছু কম নয়। এবার সন্দেহের তীর সেদিকেও গেল! এমন দিনও এল যেদিন ল্যাভেন্ডারকেও সন্দেহের চোখে দেখতে হচ্ছে! ভগবান জানেন আরও কী কী দেখতে বা শুনতে হবে!

অ্যারোমাথেরাপি কি আদৌ লিড? না সেটাও ডেড-এন্ড! সঞ্জীব রায়চৌধুরীও কি কোনও অ্যারোমা ক্লিনিকে যেতেন? অনেক বিজনেসম্যানই স্ট্রেস এবং টেনশন কমানোর জন্য অ্যারোমাথেরাপি নিয়ে থাকেন। দুশ্চরিত্রদের কাছে তো এই জাতীয় ম্যাসাজ পার্লার আর স্যালোনের আকর্ষণ আরও বেশি। অনেক ম্যাসাজ পার্লারের পেছনে সেক্স র‍্যাকেটও থাকে। তেমনই কিছু নয় তো! হানি ট্র্যাপেই কি ফেঁসে গিয়েছিলেন ওঁরা? কিন্তু তাহলে খুন হতে হল কেন? ক্লায়েন্টদের মারা এইজাতীয় সেক্স র‍্যাকেটের স্বভাববিরুদ্ধ। তবে?

মাথায় এরকম অনেক চিন্তা নিয়েই সে অন্যমনস্ক হয়ে ফরেনসিক ল্যাব থেকে বেরিয়ে আসছিল। হঠাৎই মোবাইল বেজে ওঠায় সচকিত হয়ে ফোন রিসিভ করল।

অন্য প্রান্তে তার কর্মী কাম বন্ধু পবিত্র আচার্যর উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা যায়, “রাজা, সর্বনাশিনীর কেসটায় অদ্ভুত একটা আপডেট হয়েছে। বুঝতে পারছি না ভালো কী মন্দ!”

“কী হয়েছে?” নানাবিধ আশঙ্কায় তার বুক কেঁপে ওঠে— “ফের লাশ!... এত তাড়াতাড়ি।” -

—“না! চার পায়ে নয়, বিজয় জয়সওয়াল দু’ পায়ে হেঁটেই আজ বাড়ি ফিরেছেন। সম্পূর্ণ অক্ষত ও সুস্থ! "

- “হো-য়া-ট!”

এর বেশি কিছুই বলতে পারল না অধিরাজ! বিজয় জয়সওয়াল বাড়িতে ফিরে এসেছেন! এটা কী করে হল!

(ছয়)

মেরিলিন প্ল্যাটিনাম হাউজিং কমপ্লেক্সের দিকে তাকিয়ে দ্বিতীয়বারের জন্য চোখ ধাঁধিয়ে গেল অর্ণবের!

এটা কলকাতা না ইন্দ্রপ্রস্থ। আর্কিটেক্টরা সম্ভবত বিশ্বকর্মা আর ময়দানবকেও টেক্কা দিয়েছেন। বালিগঞ্জ ফাঁড়ি থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে যে এরকম হাউজিং কমপ্লেক্স গড়ে উঠতে পারে, তা স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাসই হত না ওর। গোটা কমপ্লেক্সটাই জলের ওপরে গড়ে উঠেছে! যেন জলের ওপরে ভাসমান মিনার! নীচে কাচের মতো স্বচ্ছ জলটাকেও নীল বলেই মনে হয়! একটুকরো আকাশ বুঝি নীচে নেমে এসেছে। একঝলক দেখলেই বোঝা যায় এখানে লাখের নয়, কোটির খেলা চলে! টাওয়ারগুলো সম্পূর্ণ এসি! পুরো স্বর্গ!

তার বুকের ভেতরটা রীতিমতো ঢিপ ঢিপ করছে। আকাশচুম্বী উজ্জ্বল টাওয়ারের দিকে তাকিয়ে এখন একটা কথাই ভাবছে সে। এখানেই বিজয় জয়সওয়াল থাকেন! এর আগেও তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে একবার এখানে এসেছিল অর্ণব। তখন পরিস্থিতি অন্যরকম ছিল। কিন্তু এখন অবস্থা আরও সংশয়জনক। একটু আগেই খবর পাওয়া গিয়েছে যে মিঃ জয়সওয়াল বাড়ি ফিরে এসেছেন। বলাইবাহুল্য সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত খবর। কিন্তু কিছু কি পাওয়া যাবে তাঁর কাছ থেকে? নাকি ফের আবার নতুন কোনও জটে জড়িয়ে পড়তে হবে। বিশ্বাস নেই! এই কেসটা যেন ক্রমশই পদে পদে জটিল হচ্ছে।

কাল অধিরাজ বলামাত্রই কাজে নেমে পড়েছিল অর্ণব। তৎক্ষণাৎই বিজয় জয়সওয়ালের স্ত্রী'র সঙ্গে দেখা করেছিল সে। তিনি শুধু দুটো তথ্যই দিতে পারলেন। প্রথমতো, তিনি সন্দেহ করেন যে তাঁর স্বামীর কোনও মেয়ের সঙ্গে অ্যাফেয়ার চলছে। দ্বিতীয়ত, প্রায়ই মিঃ জয়সওয়াল এরকম সন্দেহজনক ট্যুরে চলে যান। তখন তাঁকে ফোনে পাওয়া যায় না। এবার দশদিন আগেই ফের হাওয়া হয়েছেন। মিঃ জয়সওয়ালের প্রপার্টি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেই এমন করে ঠোঁট ওল্টালেন যেন তাঁকে ধর্মঘটের সমাস বলতে বলা হয়েছে! মিঃ জয়সওয়াল নিজের বিজনেস, প্রপার্টি বা লেনদেনের কথা স্ত্রীকে কখনই

বলেন না। তিনি কোথায় যেতে পারেন সে বিষয়ে ভদ্রমহিলার কোনও ধারণা নেই, তবে হাবেভাবে মনে হল যে স্বামী মায়ের ভোগে গেলেই তিনি সবচেয়ে বেশি খুশি হবেন।

অধিরাজের নির্দেশমতো ভদ্রলোকের ঘর, অফিস ভালো করে খুঁজে দেখেছিল সে। নিতান্তই ব্যক্তিগত জিনিসপত্র, ব্যবসা সংক্রান্ত কিছু কাগজ আর ফাইল ছাড়া তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছুই নেই। কাগজপত্র থেকেই জানা গেল যে লোকটার প্রপার্টি আছে প্রচুর। মুম্বাইয়ের পালি হিলসে আর গোয়ায় নিজস্ব বাংলো আছে। কলকাতায় অন্য কোনও ফ্ল্যাট বা বাড়ি নেই, তবে জমি কিনে রেখেছেন প্রচুর। ব্যাঙ্ক ডিটেলসও স্বাভাবিক। ফোন রেকর্ডে কোনও সন্দেহজনক নম্বরও পাওয়া যায়নি। তাঁর লাস্ট ফোন লোকেশন বাড়িই শো করছে! অর্থাৎ বাড়ি থেকে বেরোনোর সময়ই তিনি ফোন সুইচ অফ করেছিলেন। আর অন করেননি।

ভাবতেই একটা দারুণ হতাশা ঘিরে ধরল অর্ণবকে। কোনও কেসে এভিডেন্সের এমন আকাল আর এত টুইস্ট আজ পর্যন্ত দেখেনি সে! কেসটা আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সর্বনাশিনী ও বিজয় জয়সওয়ালের ছবি ফ্যাক্স করে দেওয়া হয়েছিল দীঘা ও মন্দারমণি সমেত পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি পুলিস স্টেশনে। খবরিদের হাতে হাতে তার ফটো ঘুরছে। জিপনেট, অর্থাৎ জোনাল ইন্টিগ্রেটেড পুলিস নেটওয়ার্কেও দু'জনের ছবি ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তখনও কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

অন্যদিকে যে সাইবার সেলের দক্ষতার ওপর সবচেয়ে বেশি ভরসা, তারাও সর্বনাশিনীর আই.পি অ্যাড্রেস ট্র্যাক করতে গিয়ে আতান্তরে পড়েছে। শুধু আর.আই.পি পোস্ট আর নিজের ছবি ছাড়া স্টেটাস আপডেটে আর কিছুই নেই। ঐ প্রোফাইলটি কারোর সঙ্গে চ্যাট করেনি। সাইবার চ্যাট হিস্ট্রি পাওয়া যায়। কিন্তু সেল আপ্রাণ খুঁজেছে যদি একটা সে সব কিছুই নেই। তার প্রত্যেকটি পোস্টের আই.পি অ্যাড্রেস আলাদা। বেশিরভাগই কিছু অখ্যাত সাইবার কাফের, কয়েকটা কারোর পার্সোনাল কম্পিউটারের, মোবাইলের। সম্প্রতি যে পোস্টটি করেছে সেটার আই.পি অ্যাড্রেস ট্র্যাক করে দেখা গেল সেটি একজনের ল্যাপটপের আই.পি।

অর্ণব নিজেই দলবল সমেত সর্বপ্রথমেই সেই ভদ্রলোকের কাছে হাজির হল, যাঁর ল্যাপটপের আই.পি অ্যাড্রেস থেকে বিজয় জয়সওয়ালের আর.আই.পি পোস্টটি করা হয়েছে। কিন্তু ভদ্রলোককে দেখে প্রায় আকাশ থেকে পড়ল ওরা। লোকটি ইনভ্যালিড! সাইবার সেলের লোকেরা তাঁর ল্যাপটপ, লগ ইন হিস্ট্রি ইত্যাদি সব কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ঘেঁটে দেখেও কিছুই বের করতে পারল না। সর্বনাশিনীর সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্কই নেই!

অর্ণব শুধু সেখানেই থামেনি। সে সেইসব সাইবার কাফেতে ঢুঁ মেরেছে যাদের আইপি অ্যাড্রেস সর্বনাশিনী ব্যবহার করেছে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, যে সেখানেও কিছুই পাওয়া যায়নি! কিছু সাইবার কাফের রেজিস্টার এবং সিসিটিভি ফুটেজ দেখলেই পরিষ্কার বোঝা যায় যে, প্রত্যেকবার ঠিক যে সময়ে সর্বনাশিনী অনলাইন হয়েছিল, সেই সময়ে সাইবার কাফের উক্ত আই.পি অ্যাড্রেসের কম্পিউটারটি হয় ব্যবহৃতই হয়নি, নয় রীতিমতো আই ডি প্রুফ দিয়ে কেউ ব্যবহার করেছে। তাদের খুঁজেও জিজ্ঞাসাবাদ করেছে ওরা। কিন্তু তারাও ক্লিনচিট পেয়েছে, কারণ সাইবার সেল বিশেষজ্ঞ সেই কম্পিউটারগুলোও আঁতিপাতি করে খুঁজেও তেমন আপত্তিকর কিছুই পাননি! মোবাইলের ক্ষেত্রেও সেই একই ঘটনা! এই প্রোফাইলের পোস্টে যে আই.পি অ্যাড্রেসের পার্সোনাল কম্পিউটারটি ব্যবহৃত হয়েছে তার মালিককে জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে অর্ণব নিজেই প্রায় বেকুব বনে গেল। কম্পিউটারের মালিক চটে গিয়ে জানালেন যে তাঁর কম্পিউটার থেকে কখনওই ফেসবুক করা হয় না। ওটা সম্পূর্ণ তাঁর অফিসিয়াল কাজে ব্যবহার করা হয়। এমনকি ফেসবুকে তাঁর নিজের অ্যাকাউন্টই নেই। ওরাও ভেরিফাই করে দেখল, ঘটনাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি!

এত কাণ্ড করতে করতে প্রায় রাত বারোটা বাজল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে যতখানি করা যায়, তার থেকেও বেশি তৎপরতায় কাজ করছিল ওরা। কিন্তু প্রাথমিক তদন্তে কিছুই পাওয়া গেল না। শেষপর্যন্ত বুনোহাঁসের পেছনে তাড়া করতে করতে ওদের যখন দম বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম, তখনই অধিরাজ বিরক্ত হয়ে সাইবার সেলের সবচেয়ে দক্ষ কর্মী বিশ্বজিতকে ডেকে পাঠাল। অত্যন্ত বিরক্তিমাখা সুরে বলল, “এটা কী হচ্ছে বিশ্বজিত? কী সব ভুলভাল লিড দিচ্ছ! একটা আই.পি অ্যাড্রেসও সঠিকভাবে বলতে পারলে না!”

ততক্ষণে অবশ্য বিশ্বজিতেরও গলদঘর্ম অবস্থা। সে ঘাম মুছতে মুছতে বলল, "স্যার, এভাবে হবে না। এটা সিম্পল কেস অব আই.পি অ্যাড্রেস স্পুফিং।"

অধিরাজ নিজের চেয়ারে হেলান দিয়ে বসেছিল। কথাটা শুনেই সোজা হয়ে বসল, "আই.পি অ্যাড্রেস স্পুফ করছে?"

—"হ্যাঁ স্যার। যে এটা করছে, সে নিজের আইডেন্টিটি হাইড করে অন্যের আইডেন্টিটি র‍্যান্ডমলি মিমিক করছে। একাধিক ফলস আই.পি অ্যাড্রেস তৈরি করেছে। ফলস্বরূপ আমরা তাকে ধরতেই পারছি না।" অধিরাজের দৃষ্টি শাণিত হয়ে ওঠে, "কিন্তু আই.পি অ্যাড্রেস স্পুফিং করলেও তো আসল আই.পি ট্র্যাক করা যায়।"

"করা যায়।" বিশ্বজিতের চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে, "আমাকে আজকের রাতটা দিন স্যার। কাল সকালের মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু না কিছু বলতে পারব।"

সেদিন রাতে অধিরাজ আর বাড়ি ফিরল না। অগত্যা অর্ণবও অফিসেই থেকে গেল। তার মধ্যেই ট্র্যাফিক পুলিশ ফোন করে জানিয়েছিল, তারা গত দশদিনের ফুটেজ তন্ন তন্ন করে ঘেঁটেও বিজয় জয়সওয়ালের গাড়িকে ট্র্যাক করতে পারেনি। ভদ্রলোক গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু সে গাড়ি কোথায় হাপিশ হল, কেউ কিছুই জানে না। অন্তত তার বাড়ির আশেপাশের কোনও সিগন্যালের সামনে দিয়ে যায়নি তা নিশ্চিত। তবু তারা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

"এক কাজ করুন।" অধিরাজ বলল, "আমাদের ফুটেজগুলো পাঠিয়ে দিন তো। আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন। তবু আমরাও একবার দেখে নিই।"

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেস। ফলে আধঘণ্টার মধ্যেই সব সিসিটিভি ফুটেজ এসে হাজির হল। ওরা তৎক্ষণাৎ দু'জনে মিলে সেই সমস্ত ফুটেজ দেখতে বসে পড়ে। অর্ণবের মনে আশা ছিল যে অতিরিক্ত তাড়াহুড়োর ফলে হয়তো পুলিসের চোখ এড়িয়ে গিয়েছে গাড়িটা। ভালো করে দেখলে হয়তো পাওয়া যাবে। একটা আস্ত এস.ইউ.ভি গাড়ি নিশ্চয়ই হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে পারে না।

কিন্তু চারজোড়া চোখ সমস্ত রাত ধরে গুচ্ছ গুচ্ছ ফুটেজ দেখে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। কাপের পর কাপ কফি শেষ। সিগারেটের পর সিগারেট পুড়ল। তবু গাড়িটাকে শনাক্ত করতে পারল না। সাদা এস.ইউ.ভি অনেক আছে। কিন্তু উক্ত নম্বর প্লেটের গাড়িটিই নেই! অধিরাজের কপালে চিন্তার কুঞ্চন। এসব আদতে হচ্ছেটা কী! এরকম অদ্ভুতুড়ে ঘটনা আদৌ ঘটতে পারে! বিজয় জয়সওয়াল গাড়ি করে বেরিয়ে গেলেন, অথচ গাড়িটা কোথায়! এ কি জেমস বন্ডের ফিল্মের ইনভিসিবল্ কার নাকি! 'ধুত্তোর।"

ফুটেজ দেখা শেষ হলে বিরক্ত হয়ে অধিরাজ কম্পিউটার অফ করে দেয়। অর্ণব দেখল তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘামের রেখা। কিছুক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে টেবিলের দিকে তাকিয়ে থেকে অবশেষে একটু ক্লান্তভাবে বলেছিল, "অর্ণব, বাইরে তো ভোর হল, কিন্তু এখনও যে ভেতরে অন্ধকার! একটু একটু করে সময় কাটছে, আর বিজয় জয়সওয়ালের মরণ ঘনাচ্ছে। অথচ আমাদের হাতে কিস্যু নেই!...নাথিং!" অর্ণব কী বলে সান্ত্বনা দেবে ভেবে পায় না। সেও রীতিমতো ফ্রাস্ট্রেটেড দু'জনেই নীরব। অধিরাজের অস্থির আঙুলগুলো টেবিলের ওপরে এলোমেলো আঁকিবুকি কাটছে। বেশ কয়েকমুহূর্ত চুপ করে থেকে ফের স্বভাববিরুদ্ধ অধৈর্য স্বরে বলে ওঠে, "এই লোকগুলোর এভাবেই মরা উচিত! কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে বাড়ির বৌকে বলে যায় না কেন এরা! বাড়িতে বৌ আছে, বাচ্চাও আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু কাউকে কিছু না বলে তেনারা চললেন প্রেম করতে! এত গোপনীয়তার কী আছে? প্রেম করছিস কর, সেলফোনটা তো অন রাখবি।"

অর্ণব ভারী গলায় জানায়, "অর্জুন শিকদারের একটা পাঁচ বছরের মেয়ে আছে স্যার। সঞ্জীব রায়চৌধুরীর দুই ছেলে। বড়টার বয়েস তিন বছর। আরেকটা নেহাতই কোলের শিশু!"

—"বাচ্চাগুলোই হল আসল ভিকটিম!" তার কণ্ঠস্বরে উত্তেজনা, "কিছু বোঝার আগেই পিতৃহীন! বড় হওয়ার পরে যখন বাবার কীর্তি জানতে পারবে তখন মনের অবস্থা কী দাঁড়াবে একবার ভাবো। বিজয় জয়সওয়ালের ছেলে-পুলে কিছু আছে?"

"নাঃ।"

"বাঁচা গেছে!" বলতে বলতেই চোখ বুজল অধিরাজ। চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়ে ক্লান্তভাবে বলল, আমাকে একটু একা থাকতে দাও অর্ণব। এখন সবে কাক ডাকছে! এই মুহূর্তে আর কিছু করার নেই। দেখা যাক, বিশ্বজিত কী বলে। যদি কিছু লিড দিতে পারে...।"

বিশ্বজিত কিন্তু বেলা দশটার আগে দেখা দিল না। অর্ণব দেখল, তার চুল উস্কোখুশকো। চোখদুটো রক্তজবার মতো লাল। সারারাত ধরে বেচারি সর্বনাশিনীর পেছনে দৌড়েছে। যতভাবে পারা যায়, যতরকম সফটওয়্যার ব্যবহার করা যায়, প্রায় সবই করে ফেলেছে। কিন্তু যখন সে অধিরাজের কেবিনে ঢুকল, তখন তাকে পুরো ভগ্নদূতের মতো দেখাচ্ছিল। অধিরাজ তার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাতেই ক্ষীণস্বরে বলল, "আমি সারারাত আপ্রাণ চেষ্টা করেছি প্রোফাইলটার অ্যাকচুয়াল আই.পি অ্যাড্রেস ট্র্যাক করার। কিন্তু স্যার, এখন প্রায় অসম্ভব লাগছে!"

অধিরাজ কোনও কথা বলল না। কিন্তু তার ভ্রূ ভঙ্গিই অনুচ্চারিত শব্দটা প্রকাশ করে দেয়, "কেন?"

"এ পাবলিক মহাধড়িবাজ স্যার!" প্রায় অসহায়ের মতো বলল বিশ্বজিত,—"যতবার অ্যাকচুয়াল আই.পি ট্র্যাক করার চেষ্টা করছি প্রত্যেকবারই সার্ভিস প্রোভাইডর পালটে পালটে যাচ্ছে!" এ বার প্রশ্নটা মুখেই করল সে, "মানে?"

"মানে এই লোকটি বা মহিলাটি নিজের নেটওয়ার্ক ইউজই করছে না। প্রত্যেকবার কোনও আনসিকিওর্ড হটস্পট থেকে অনলাইন হচ্ছে। যেমন ধরুন পার্কস্ট্রীট, নিউটাউনে বা ইত্যাদি কিছু জায়গায় এরকম আনসিকিওর্ড হটস্পট আছে যেখান থেকে অনায়াসেই নেট কানেকশন পাওয়া যায়। সে সেখান থেকে অনলাইন হয়ে তারপর আই.পি অ্যাড্রেস স্পুফিং করছে। জাস্ট জিনিয়াস মাপের শয়তান!"

উপস্থিত দুই অফিসারের মাথাতেই যেন সূর্য সমেত সবকটা গ্রহ, উপগ্রহ ভেঙে পড়ল! কী সর্বনেশে কাণ্ড! অর্ণব মনে মনে স্বীকার করল, নামটা সার্থক বটে! সত্যিই সর্বনাশিনী!

অধিরাজ কিছুক্ষণ বিশ্বজিতের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। বিশ্বজিতের মুখে ব্যর্থতা স্পষ্ট। সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "আই সি! এবার বুঝতে পারছি যে পুলিস কেন এই

প্রোফাইলটাকে ট্র্যাক করতে পারেনি!”

বিশ্বজিত কোনও কথা বলল না। সে মাথা হেঁট করে নীরবে বেরিয়েই যাচ্ছিল। তাকে কী ভেবে যেন হঠাৎই পেছন থেকে ডাকল সে, “এক মিনিট! আরেকটা কাজ করো তো।”

-“ইয়েস স্যার?” ছেলেটা থমকে দাঁড়ায়।

–“সরাসরি না হলেও অজান্তেই তুমি একটা লিড দিয়ে ফেলেছ বস।” অধিরাজ মৃদু হাসছে, “যিনি এইজাতীয় হাইটেক বদমাশ, তিনি নির্ঘাৎ হ্যাকিঙে এক্সপার্ট! এবং আমি নিশ্চিত, এর আগে নিশ্চয়ই তিনি পুলিশি হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়েছিলেন, যেখান থেকে অভিজ্ঞতা আরও জোরদার হয়েছে। সম্ভবত এর আগেও আই.পি অ্যাড্রেস স্পুফিং করেই কোনও বদমায়েশি করেছিলেন। কিন্তু সেবার ধরা পড়ার খারাপ অভিজ্ঞতা আছে বলেই এবার নতুন পদ্ধতি আমদানি করেছেন। নতুন হ্যাকারের মাথা হলে শুধু স্পুফিঙের কথাই ভাবত! এবং অবশ্যই ধরা পড়ত। ইনি সাইবার সেলের তদন্ত পদ্ধতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করে বসে আছেন। অগত্যা শুধু স্পুফিঙেই ক্ষান্ত দেননি। নিজেকে আপগ্রেড করে আনসিকিওরড হটস্পটে বসে আই.পি স্পুফিং করার মতো ফুলপ্রুফ ডাবল লকওয়ালা ভয়ঙ্কর প্ল্যান ছকেছেন। এ পুরনো পাপী না হয়েই যায় না!” ...?”

বিশ্বজিতের চোখ চকচক করে ওঠে, “তার মানে

অধিরাজ শান্তভাবে বলে, “এখনও পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে যত আই.পি অ্যাড্রেস স্পুফিঙের মাধ্যমে সাইবার ক্রাইম হয়েছে, সমস্ত কেসফাইল পাঠিয়ে দাও। অ্যাসাপ!”

“ওকে স্যার।” -

অর্ণব বিস্মিত দৃষ্টিতে অধিরাজের দিকে তাকিয়ে থাকে। এই সম্ভাবনাটা তার মাথাতে আসেনি। সত্যিই তো। লোকটি বা মেয়েটি যখন এত আঁটঘাট বেঁধে নেমেছে, তখন স্বাভাবিকভাবেই তার হ্যাকার হওয়ার প্রবল চান্স! এবং অধিরাজের যুক্তিটাও অকাট্য। নির্ঘাৎ প্রথমবার অপকর্মটি করে পুলিসের কাছে ধরা পড়েছিল সে। তাতে তার অভিজ্ঞতা বেড়েছে বলেই দ্বিতীয়বার ওয়াটারটাইট প্ল্যান বানিয়েছে। কাজটাকে প্রায় পারফেক্ট ক্রাইমের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল সে। কিন্তু নিজের অজান্তেই একটা হালকা লিড দিয়ে দিয়েছে!

"যখন টেকনোলজি জবাব দিয়ে দেয়, তখন একটা অস্ত্রই কাজে আসে অর্ণব। আদি ও সনাতন— মগজের ধূসর বস্তু।" অধিরাজ টেবিলের ওপরে পেপারওয়েটটাকে নিয়ে খেলতে খেলতে বলল, "যদি আমার খুব ভুল না হয় তবে ইনি একজন মহিলা। পুরুষ হলে বিষ দিতে যাবে কোন দুঃখে! পুরুষেরা এরকম সূক্ষ্ম কাজই করে না। দুমদাম গুলি, বা ঘপাঘপ চাকু থাকতে বিষ কেন! ইনি মহিলাই! যুবতী। অত্যন্ত সুন্দরী। এবং সম্ভবত ফুটফুটে ফর্সা।"

যুবতী ও সুন্দরী তো বটেই। নয়তো দু'জন পুরুষ তাকে দেখে এমন পাগল হয়ে ওঠে! কিন্তু একটা প্রশ্ন তখনও অর্ণবের মাথায় ঘুরছিল "ফুটফুটে ফর্সা স্যার? কিন্তু ছবিতে তো কুচকুচে কালো!"

"ফেসবুকে নিজের থোবড়াটাই দেখাতে হবে এমন কোনও আইন আছে কি?" অধিরাজের মুখে সেই পেটেন্ট বদমায়েশি হাসি, "আমার ফেসবুক প্রোফাইলে তো আমি টাকলুর ছবি দিয়ে রেখেছি। কে জানতে যাচ্ছে প্রোফাইলের মালিক সত্যিই অবাক পৃথিবী, না তার মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল!" -অর্ণবের চক্ষু চড়কগাছ, "আপনার ফেসবুক প্রোফাইলে ডঃ চ্যাটার্জীর ছবি! ডঃ চ্যাটার্জী জানেন?"

"দুর্বাসা জানতে পারলে কি ছেড়ে কথা বলত?" অধিরাজ ফিক করে হাসল, "তবে চিন্তা নেই, বুড়ো তখনই জানতে পারবেন, যখন উনি ফেসবুকে থাকবেন। যে লোক 'ইউ টিউব'কে 'টিউবলাইট' ভাবে, আর ব্রাউজার খুলতে বললে দাঁত খিঁচিয়ে বলে, 'আমি কি মহিলা যে ব্লাউজ খুলবো!'— তার কাছে জুকারবার্গ আর জুরাসিক পার্ক একই বস্তু।" অর্ণব একটু ভেবে বলে, "কিন্তু ধরুন আপনার ডিপিতে যদি ডঃ চ্যাটার্জীর ছবিও থাকে, তবু তো পুলিস অন্তত ডঃ চ্যাটার্জীকে খুঁজে বের করতে পারবে।"

– "হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পারবে।" সে রিভলভিং চেয়ারে ঠেস দিয়ে বসেছে, "সময় লাগবে। কিন্তু লোকটাকে কখনও না কখনও ঠিকই পাওয়া যাবে।" "তবে সর্বনাশিনীর ডিপিতে যে মেয়েটার ছবিটা আছে, তাকে পাওয়া যাচ্ছে না কেন? পুলিস তো চেষ্টা করছে কম দিন হয়নি

— "হ্যাঁ। পুলিস প্রচুর চেষ্টা করেছে। ওদের নানারকম ডেটাবেসে সার্চ করেছে। গুগল ইমেজ সার্চ করেছে। খবরিদের মাধ্যমে ঘুরিয়েছে, প্রত্যেকটা পুলিস স্টেশনে ঘুরিয়েছে। এখন তো জিপনেটেও আছে।" অধিরাজের দৃষ্টি অন্যমনস্ক। সে সর্বনাশিনীর ছবিটা ড্রয়ার থেকে বের করে টেবিলে রাখে,—"মেয়েটার ছবিটা দেখেছ? যে মাপের সুন্দরী ও যে ধরনের বোল্ড পোষাক পরে আছে, তাতে প্রথমেই মনে হয় মডেল!।"

মডেল হলে এতদিনে তাকে খুঁজেও পাওয়া উচিত ছিল। কোনও সেলিব্রিটির ছবি হলেও গুগলই বলে দিত। তাছাড়া এমন মারকাটারি সুন্দরীকে কখনও কারোর চোখে পড়েনি তা হতেই পারে না। সেক্ষেত্রে খবরি নেটওয়ার্ক ঠিকই বলতে পারত। কিন্তু কোনোটাই হয়নি। আমিও বুঝতে পারছি না যে কেন এই মেয়েটাকে এতদিনেও পাওয়া গেল না! পুলিশ চাইলে কবর থেকেও মরা লোককে খুঁজে বের করে আনতে পারে! অথচ এই মেয়েটা পুরো ভ্যানিশ! তবে আমার দৃঢ় ধারণা, এ পাবলিক সে পাবলিক নয়। অন্য কারোর ফটো দিয়েছে। আর ছবির মেয়েটা কালো হলেও আসল মক্কেল ফর্সা।"

কাঁটা ঘুরে ফিরে আবার সেই ফর্সাতেই আটকাল! অর্ণব সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দেখে সে স্মিত হাসল, "ভেরি ইজি। একবার অপরাধীর দিক থেকে ভাবো। যে কোনও লিডই দেয় না, সে কখনও নিজের সম্পর্কে একটাও ক্লু দেবে? সে তো আপ্রাণ চেষ্টা করবে আমাদের বিভ্রান্ত করার। প্রত্যেকটা তথ্য ভুল দেবে। আমার যেমন নিজের চেহারা প্রকাশ করার ইচ্ছে নেই, তেমনই সেও নিজেকে প্রকাশিত করার জন্য ব্যাকুল নয়। আমি পাবলিককে কনফিউজ করার জন্য টাকলুর ছবি দিয়েছি, যাঁর চেহারা সম্পূর্ণ আমার বিপরীত, সেও সেটাই করেছে। আমার ধারণা এও সম্পূর্ণ বিপরীত। স্রেফ মিসলিড করছে...। তার কপালে ভাঁজ পড়ে.... কিন্তু মেয়েটাকে এখনও আমার চেনা চেনা লাগছে... কোথায় যে দেখেছি! এইরকম চুল... একদম এই চোখ... চাউনি.... হাসি! দেখেছি শিওর! কিন্তু কোথায়...!"

অর্ণব লক্ষ্য করেছিল অধিরাজ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ছবিটাকে খুঁটিয়ে দেখছে। বেশ কয়েক মিনিট চুপ করে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। তারপর খুব নীচু গলায় বলল, –"গোলমাল আছে অর্ণব ! ছবিটাতে একটা বিরাট অসঙ্গতি আছে। লক্ষ্য করেছ?"

সে ছবিটার দিকে দেখল। এখনও পর্যন্ত কয়েকশো বার দেখেও কোনও অসঙ্গতি তার চোখে পড়েনি। প্রশ্নটা করতেই যাচ্ছিল তার আগেই উত্তর দিয়ে দিল অধিরাজ, "মেয়েটার রঙ গাঢ় কালো, চুল কোঁকড়া, কপাল উঁচু, নাকও মোটা, টিপিক্যাল নিগ্রোবটু চেহারা... স্ট্রেঞ্জ!"

—"এতে 'স্ট্রেঞ্জে'র কী হল! নিগ্রোবটু চেহারা হলে তো এমনই হবে।" কিন্তু এবারও প্রশ্নটা করার সুযোগ পেল না অর্ণব। প্রশ্নের আগেই ফের চলে এল উত্তর "নিগ্রোবটু চেহারায় ঠোঁট এত পাতলা হয় কী করে?

তাই তো! এটা আগে ভাবেনি সে। সত্যিই ছবির মেয়েটির ঠোঁট নিগ্রোদের তুলনায় পাতলা! যেটা হওয়া খুব স্বাভাবিক নয়। এই ধরনের মেয়েদের ঠোঁট অত্যন্ত মোটা হয়।

"দাঁড়াও! দাঁড়াও... ওয়েট!"

অধিরাজ ছবি দেখতে দেখতেই যেন একটা ঘোরে চলে গেল। অদ্ভুত আলো-ছায়া তার চোখে খেলা করছিল। কখনও যেন একটু উত্তেজনা, কখনও ফের সংশয়! দৃষ্টি কখনও তীব্র হয়ে উঠছে, কখনও বা সপ্রশ্ন! মস্তিষ্কের প্রত্যেকটি কোষে ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত হচ্ছে অমোঘ জিজ্ঞাসা .."কে?... কে?... কে?"

খুব চেনা, অথচ চেনা নয়! হাসিটা যেন কোথাও দেখেছে! আগে কখনও! কিন্তু কোথায়? কোথায়?

"ওঃ...!"

ছবিটা চোখ কুঁচকে দেখতে দেখতেই লাফিয়ে উঠল সে, "আমি একটা গর্দভ! মাই গুডনেস!"

"স্যার!"

"কখনও হাসি দিয়ে কোনও মানুষকে চিনতে পেরেছ অর্ণব?" বলতে বলতেই সে একহাত দিয়ে মেয়েটার চোখ, নাক ঢেকে দিয়েছে। এখন শুধু তার হাসিটাই দেখা যাচ্ছে। অর্ণব দেখামাত্রই রীতিমতো শিউরে উঠল, "স্যার... এ তো...!"

—"ইয়েস! হ্যালি বেরি! শুধু তাই নয়, বাকি পার্টসগুলোও অন্য কারোর। চোখদুটো দেখো..."। অধিরাজ এবার নাক, ঠোঁট ঢেকে দিয়েছে — "কৃষ্ণসুন্দরীদের ফ্যান হলে এই

কপাল, ভুরু আর সেক্সি আইজ চিনতে বাধ্য তুমি।”

ধরা গলায় বলল অর্ণব “লুপিতা নঙিয়ো।”

— “এগজ্যাক্টলি! চুলটা আমার মনে হচ্ছে জ্যানেট জ্যাকসনের, নাকটা যে কার কে জানে। বডিটাও আই থিঙ্ক মেগান গুডের। এই ড্রেসে ওর ছবি দেখেছি!” অধিরাজ স্খলিত স্বরে বলে, “শুধু পুলিস, সি.আই.ডি, সি.বি.আই কেন! তাদের চোদ্দ গুষ্টি, এমনকী স্বয়ং ভগবানও এ মেয়েকে খুঁজে পাবেন না! এ সুন্দরী বাস্তবে এক্সিস্টই করে না! সব কৃষ্ণসুন্দরীকে চমৎকারভাবে ফটোশপে পাঞ্চ করে, দুর্ধর্ষ এডিটিং করে আমাদের নাকে মোক্ষম পাঞ্চ বসিয়ে দিয়েছে! কী মারাত্মক ব্রেইন!”

দুই অফিসার কতক্ষণ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে ছিল তা হয়তো নিজেরাই জানে না! অসম্ভব শকড হয়েছিল ওরা। কারণ আকাশ-পাতাল খুঁড়ে যাকে খোঁজা হচ্ছে তার কোনও অস্তিত্বই নেই!

এই অবধি কি কম চমক ছিল যে এরপর একের পর এক শক আসতে শুরু করল! ডঃ চ্যাটার্জীর কনফিউশন! অ্যারোমাথেরাপি! এখন আবার বিজয় জয়সওয়ালের প্রত্যাবর্তন! ঠিক হচ্ছেটা কী!

অর্ণব টেনশন কমানোর জন্য বেশ কয়েকবার জোরে জোরে শ্বাস টানল। তারপর মেরিলিন প্ল্যাটিনাম টাওয়ারের দিকে এগিয়ে গেল দ্রুতবেগে। গন্তব্য বিজয় জয়সওয়ালের ফ্ল্যাট! কোথায় গিয়েছিলেন তিনি, এতদিন কোথায় ছিলেন, তাঁর গাড়িটাই বা কেন হাওয়া হল, তাঁর অজ্ঞাত প্রেমিকাই বা কে, সব প্রশ্নের জবাব একমাত্র তিনিই দিতে পারেন।

সবচেয়ে জরুরি প্রশ্ন, সর্বনাশিনী তাঁর নামেই বা আর.আই.পি পোস্ট দিল কেন?

সম্ভবত স্বয়ং বিজয় জয়সওয়ালও এর উত্তর দিতে পারবেন না!

(সাত)

"ওঃ! আই অ্যাম ডাইং!"

কুৎসিত লোকটা কাতর শব্দ করে ওঠে। তার সারা মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। অবস্থা দেখলে বোঝা যায় তার শরীর যথেষ্টই খারাপ। বিছানায় টানটান হয়ে শুয়ে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। পেটটা থেকে থেকে চেপে ধরছে। গত কয়েক ঘণ্টায় খাবার তো দূর একফোঁটা জলও খেতে পারেনি। খেলেই পেটে একটা প্রবল যন্ত্রণা খিঁচ ধরাচ্ছে। কখনও বমি করছে, কখনও বা টয়লেটে দৌড়চ্ছে। এখন অবশ্য সে শক্তিও আর নেই! সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমাগতই দুর্বল হয়ে পড়ছে সে।

তার সামনে সিল্কের লাল টকটকে গাউন পরে বসে আছে সেই অনিন্দ্যসুন্দরী যুবতী। এই মুহূর্তে তাকে অপ্রতিরোধ্য সম্রাজ্ঞীর মতো দেখাচ্ছে! উদ্ধত, গর্বিত ভঙ্গিতে এমনভাবে বসে আছে যেন সমস্ত পৃথিবী অবিকল কার্পেটটার মতোই তার পদানত। সে মৃদু হাসল। তার কুন্দশুভ্র দন্তপংক্তিতে সামান্য হিংস্রতা! কিন্তু ঠোঁটে সম্ভবত দুনিয়ার মধুরতম হাসিটি লেগে আছে। মিষ্টি রিনরিনে গলায় বলল, "সামান্য স্টমাক আপসেটেই বাবুর এত কষ্ট!" "

"এটা সামান্য!" লোকটা অত্যন্ত কষ্টে বলল, "পেটে অসম্ভব যন্ত্রণা!"

সুন্দরী খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে, "এখন একটু হুইস্কি দিই? সঙ্গে কাবাব?"

অসহায় মানুষটার চোখ বেয়ে জল পড়ে। এটা কি রসিকতা? না ব্যঙ্গ? এ কী ধরণের খেলা!

—"কী করতে পারি বল তোমার জন্য?" সে আবার মধুরকণ্ঠে বলল, -"একটা সুন্দর ম্যাসাজ দেব?"

পুরুষটি কোনোমতে মাথা নাড়ে। মেয়েটি সকৌতুকে তাকে একঝলক দেখে নিয়ে রহস্যঘন কণ্ঠস্বরে বলল, "সেক্স করবে?"

মানুষটা কোনও উত্তর দিতে গিয়েও পারল না। বরং আবার কাতরে উঠল! যন্ত্রণা ক্রমাগতই বাড়ছে। বিবমিষার বেগ ফের পেট থেকে বুকে এসে চাপ মারছে! কে জানে ফুড পয়জনিং হল কি না! এখন তার ম্যাসাজ বা সেক্সের দরকার নেই। বরং ওষুধ চাই।

ডাক্তার দেখাতে পারলে ভালো হত। কিন্তু সে উপায় নেই! এখন তার পায়ে হেঁটে টয়লেটে যাওয়ার ক্ষমতাটুকুও নেই, ক্লিনিকে বা হসপিটালে যাবে কী করে? হাতের কাছে মোবাইলটা থাকলে ফোন করে অ্যাম্বুলেন্স ডাকা যেত। কিন্তু মোবাইল তো সঙ্গিনীর হেফাজতে। যেদিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিল, তখনই ফোনটা নানাবিধ ছলা-কলায় নিয়ে নিয়েছিল সে। প্রেমে অন্ধ পুরুষ তাকে ফোনটা নির্বিবাদে দিয়েও দিয়েছিল। কিন্তু এখন শত অনুনয়েও ফোনটা ফেরত দিচ্ছে না ছলনাময়ী! স্রেফ মুচকি মুচকি হাসছে। অথচ সে নিজের স্ত্রী, সংসার ত্যাগ করে চলে এসেছিল তার টানে। সে আকর্ষণ যে কী অমোঘ তা আর কেউ বুঝবে না। মনে হত, ওর জন্য স্ত্রী, সংসার কেন, সবকিছু ফেলে চলে যাওয়া যায়। আর সেই মেয়ে কিনা বসে বসে তার যন্ত্রণা দেখছে!

লোকটার চোখ জলে ঝাপসা হয়ে যায়! এখন বুঝতে পারছে যে প্রাণের দায়, বড় দায়! সংসারে সব মানুষই আসলে নিজেকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে। সে যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যেতে যেতে ভাবছিল, তার সঙ্গে ঠিক কী হচ্ছে! এই নারী তাকে নিয়ে ঠিক কী করতে চায়! আজ সকাল থেকেই তার প্রচণ্ড পেট ব্যথা, সঙ্গে বীভৎস বমি ও ডায়রিয়া। প্রথমে ব্যাপারটাকে নিতান্তই বদহজম ভেবেছিল। বিশেষ পাত্তা দেয়নি। কিন্তু যত সময় যেতে লাগল, ততই ব্যথাটা বাড়তে থাকল। ওষুধ খেতেই পারছে না। যা খাচ্ছে স্রেফ বমি হয়ে উঠে যাচ্ছে। এখন মনে হচ্ছে নির্ঘাৎ মরে যাবে! মেয়েটা বোধহয় তার মনের কথাটা বুঝতে পারল। ঠোঁট টিপে হেসে বলল সে – "সে কি! মরতে ভয় লাগছে? কিন্তু তুমি যে বলেছিলে আমার জন্য প্রাণও দিতে পারো!"

কথাটার মধ্যে অদ্ভুত এক ভয় এবং ভীষণ সারল্য যুগপৎ মিশে আছে। যেন চাইল্ডস প্লে'র সেই নিষ্পাপ পুতুলটা সরল অথচ নিষ্ঠুর ভঙ্গিতে বলছে,—"হাই, আই অ্যাম টমি, অ্যান্ড আই অ্যাম ইওর ফ্রেন্ড টু দ্য এন্ড!" কথাটা আপাত নিষ্পাপ, কিন্তু ভয়ঙ্কর! তেমনই একটা হাড় কনকনে শীতলতা লুকিয়ে আছে মেয়েটির কথার মধ্যে!

লোকটার এবার সত্যিই ভয় করতে শুরু করল! মেয়েটা কী বলতে চাইছে? সত্যি সত্যিই মরে যাবে নাকি? নাঃ, নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছে। সে তো তাকে ভালোবাসে। তার জন্যই সব কিছু ছেড়েছুড়ে এসেছে। এই সুন্দরীই তাকে স্বপ্ন দেখিয়েছিল অন্য কোথাও ঘর

বাঁধবার! সেই স্বপ্নের টানে সমাজ, সংসারের তোয়াক্কা না করেই চলে এসেছে। বয়স্ক-অসুন্দর স্ত্রী, ছকে বাঁধা একঘেয়ে জীবন যাপন কতদিনই বা ভালো লাগে তার মতো রঙিন মেজাজের মানুষের! তাই যখন ও জীবনে এল, তখন অনেক রঙিন স্বপ্নের জাল বুনেছিল সে। মনে হয়েছিল, মূর্তিমতী রোমাঞ্চ এসে গিয়েছে। মনে হয়েছিল, ওর জন্য প্রাণও বোধহয় দেওয়া যায়! আবেশে, আবেগে সেই কথাটা অনেকবার বলেছে ওকে।

কিন্তু সত্যিই কি প্রাণ দিতে হবে! ভাবতেই মানুষটা কেঁপে ওঠে। কথাটা রসিকতা? না সত্যি! নয়তো অসহায় প্রেমিককে একটু সাহায্যও কেন করছে না এই নারী! সকাল থেকেই এমন কষ্ট হচ্ছে, অথচ সে শুধু স্থির দৃষ্টিতে মৃদু হাসতে হাসতে তার অবস্থা দেখে যাচ্ছে।

আবার একটা বমির দমক! আর সামলাতে পারল না মানুষটা! অসহ্য যন্ত্রণায় মুচড়ে উঠেছে তার পাকস্থলী! কিছু বোঝার আগেই সে হড়হড়িয়ে অনেকটা বমি করে ফেলল দামি কার্পেটটার ওপরেই।

কণ্ঠে সুন্দরী তখনও একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে তার দিকে। খুব শান্ত বলল,—“নো প্রবলেম। আমি কয়েকদিন পরেই কেচে দেব। তুমি মহানন্দে ওটাকে নোংরা করতে পারো। প্রেমের জন্য এটুক কষ্ট তো করতেই পারি।”

“প্লিজ... আমার ফোনটা... ডক্টর... অ্যাম্বুলেন্স...!”

অতিকষ্টে কয়েকটা শব্দ উচ্চারণ করতে পারল লোকটি। এখন আস্তে আস্তে তার জীবনীশক্তি কমে আসছে। চোখের সামনে অস্বচ্ছ অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। শরীরটা যেন অবশ...!

“মৃত্যুর রঙ কী জানো? কালো!”

মেয়েটি অল্প অল্প দুলছে। তার দু’ চোখে খরদৃষ্টি। ভীষণ অস্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, “মরে গেলে লোকে চোখে অন্ধকার দেখে। অন্ধকার কালো। মরার পর পুড়ে গেলে সবাই ছাই হয়ে যায়। ছাইয়ের রঙও কালো...।” বলতে বলতেই তার দু’ চোখ দপ করে জ্বলে ওঠে। ভীষণ নিষ্ঠুর কণ্ঠে একরাশ জ্বালা এবং আক্রোশ উগরে দিয়ে বলে সে, —“তবে কালো রঙ নিয়ে তোমাদের এত প্রবলেম কেন?”

এই প্রশ্নের কোনও উত্তর নেই। লোকটি সামান্য কেঁপে ওঠে। কিছু একটা বলতে চায়। কিন্তু মুখ দিয়ে কোনও শব্দ বেরোয় না। মেয়েটি স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। চাউনি অপলক, অথচ নিষ্প্রাণ। সে চোখে কোনও দুর্বলতা, কোনও প্রেম নেই বরং যেন আগুন জ্বলছে ধ্বকধ্বক করে। সে জানে, পুরুষটি এখনই মরবে না। আরও অন্তত কয়েকঘণ্টা বাঁচবে সে। তবে আগের দু'জনের চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি মরবে। পুলিস এখন অনেক বেশি সতর্ক হয়ে গিয়েছে। তাই আর চান্স নেওয়া ঠিক হবে না।

ভাবতেই তার মুখে ফের একটা রহস্যময় হাসি উঠে আসে। পুলিস ভাবছে এবার হয়তো লোকটাকে বাঁচানো গেল। ওরা বিজয় জয়সওয়ালকে ফিরে পেয়ে নিশ্চয়ই হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। কিন্তু বেচারারা জানে না যে...! সে অলস দৃষ্টিতে দাবার ছকটার দিকে তাকায়। শেষ দানটা এখনও দেওয়া হয়নি।

(আট)

- "এটাই বাকি ছিল।"

হসপিটালের মার্বেল বাঁধানো করিডোর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতেই অধিরাজ হতাশভাবে মাথা ঝাকায়, "ফের সব ঘেঁটে গেল! এখনও কিছুই বুঝতে পারছি না। শেষ আশা ছিল বিজয় জয়সওয়ালের বয়ান। সেটাও গেল!"

অর্ণবও দীর্ঘশ্বাস ফেলে। সত্যিই মাঝখানের দু'দিন নেহাতই বিফলে গেল। ব্যক্তিগতভাবে তার মনে হয়েছিল যে হয়তো কিছু প্রশ্নের জবাব বিজয় জয়সওয়াল নিজেই দিতে পারবেন না। কিন্তু তিনি যে কোনও প্রশ্নেরই জবাব দিতে পারবেন না তা কে জানত! যখন অর্ণব তাঁর বাড়িতে গিয়েছিল তখন ভদ্রলোক রীতিমতো ঝিমোচ্ছিলেন। প্রাথমিকভাবে সে একটু বিস্মিত হয়। মিঃ জয়সওয়াল সাতসকালেই মদ্যপান করে বসে আছেন নাকি!

মিসেস মানসী জয়সওয়ালও মুখভঙ্গী করে বলেছিলেন, "কীসে বুঁদ হয়ে আছে কে জানে! কোনও প্রশ্নেরই জবাব দিচ্ছে না। আজ সকালে টলতে টলতে বাড়ি ফিরল। তারপর থেকেই এই অবস্থা।"

অর্ণব লক্ষ্য করে সত্যিই বিজয় কেমন থম্ মেরে বসে আছেন। তাঁর চোখদুটো খোলা। কিন্তু চাউনিটা অস্বাভাবিক। যেন কিছুই দেখছেন না! সম্পূর্ণ বোধহীন একটা পুতুলের মতো চুপ করে লক্ষ্যহীনভাবে তাকিয়ে আছেন। অর্ণব দু চারটে প্রশ্ন করলেও কোনও জবাব দিলেন না। তিনি কিছুই শুনছেন না, কিছুই বলছেন না! ওঁর স্ত্রী মানসী খনখন করে ঝাঁঝিয়ে উঠে বললেন, "ফিরে আসার পর থেকে এই একই ড্রামা চলছে! কোন দুনিয়ায় আছে জানি না। আমাকে তো কিছু বললই না! এখন আপনাকেও উত্তর দিচ্ছে না। যদি দেয় তবে জিজ্ঞাসা করবেন যে এতদিন কোন চুলোয় ছিল! আর গিয়েছিলই যখন, তখন ফের কোথা থেকে টপকে পড়ল!" | বাপ রে! কী জাঁদরেল মহিলা! কথাটা ছুঁড়ে দিয়েই তিনি রেগে মেগে - গটগটিয়ে চলে গেলেন। অবস্থা দেখে চাকর-বাকর-বাটলাররাও কেটে পড়ল। অর্ণব মহা আতান্তরে পড়ে। এখন এই ল্যাম্পপোস্টটিকে নিয়ে কী করবে! মিঃ

জয়সওয়াল তখনও স্ট্রেট ঊর্ধ্বচক্ষু হয়ে আছেন। বোধহয় তুরীয় দশা প্রাপ্ত হয়েছেন! অর্ণবের মনে হল, হয়তো স্ত্রী'র জ্বালায় বিরক্ত হয়ে উনি সব ছেড়েছুড়ে হিমালয়েই চলে গিয়েছিলেন। অন্তত ভাবসাব তো তেমনই। তাঁর গালের অযত্নলালিত দাড়ি, পরনের মলিন পরিচ্ছদও প্রায় বৈরাগ্যেরই সাক্ষ্য দেয়। সে বেশ কড়া পুলিশি ভঙ্গিতে আবার র‍্যানডম কিছু প্রশ্ন করে গেল। –"কোথায় গিয়েছিলেন?", "এতদিন কোথায় ছিলেন?", "আপনার সেলফোন বন্ধ করেছিলেন কেন?", "গাড়িটা কোথায়?" ইত্যাদি ইত্যাদি। মাঝখানে আবার মিসেস জয়সওয়াল হাঁউমাঁউ করে টর্নেডো এন্ট্রি মেরে খ্যাঁচখ্যাঁচে স্বরে বললেন, "এসব পরে জিজ্ঞাসা করবেন। তার আগে জিজ্ঞাসা করুন কোন কুত্তিটার সঙ্গে গিয়েছিল, হ্যাঁ?"

সর্বনাশ! অর্ণব মনশ্চক্ষে দেখল মানসী জয়সওয়াল নন, তাঁর জায়গায় ডঃ চ্যাটার্জী এসে দাঁত খিঁচোচ্ছেন! এই জাতীয় ক্যারক্যারে গলায় কথা বললে মড়া মানুষও বোধহয় লম্ফ মেরে উঠে বসবে। অথচ ভদ্রলোক যেন পাত্তাই দিলেন না! কথা বলা তো দূর, সে মাল নট নড়ন-চড়ন, নট কিচ্ছু!

ঘাবড়ে গিয়ে সে অধিরাজকেই ফোন করেছিল। প্রায় নিরুপায়ের মতোই বলল, "স্যার, বিজয় জয়সওয়াল তো কোনও কথারই উত্তর দিচ্ছেন না!" অধিরাজ বিস্মিত, "উত্তর দিচ্ছেন না মানে? উত্তর দিতে অস্বীকার করছেন?"

—"তাও না! অস্বীকার করতে হলেও তো কথা বলতে হবে। ইনফ্যাক্ট উনি কথাই বলছেন না!" ও চাপাস্বরে বলে, "হাবভাবও কেমন যেন সন্দেহজনক মনে হচ্ছে। পুরো চুপচন্ডী। কোনও কথাতেই কোনও রি-অ্যাকশন নেই। বোধহয় আপনমনেই স্রেফ ভাবছেন এবং ভেবেই চলেছেন।"

অধিরাজ প্রায় আকাশ থেকে পড়ে, "যাচ্চলে! এর মানেটা কী! মৌনব্রত নিয়েছেন? না জুয়েলারির ব্যবসা ছেড়ে কবি হওয়ার তাল করছেন!"

"আমি জানি না স্যার।" অর্ণব জানায়, "কেমন যেন গুম মেরে বসে আছেন।" -

ওপ্রান্তে কিছুক্ষণ নীরবতা। সম্ভবত অধিরাজও এমন খবরের জন্য প্রস্তুত ছিল না! কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, "অর্ণব, আমার লক্ষণ ভালো ঠেকছে না। বিজয়

জয়সওয়াল বাড়ি ফিরে এসেছেন মানে এই নয় যে উনি সম্পূর্ণ বিপন্মুক্ত! আপাতদৃষ্টিতে কোনওরকম দৈহিক অসুস্থতা বুঝতে পারছ?"

- "অসুস্থ নন, অস্বাভাবিক।"

"অস্বাভাবিকতাও ঠিক নয়। আমরা এখনও জানি না যে কী বিষ দেওয়া হচ্ছে, বা মার্ডারারের মোডাস অপারেন্ডি কী! সেটা সবকিছু হতে পারে! এমনকি কোনও স্লো পয়জন হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। হয়তো বিষটা অলরেডি দেওয়া হয়ে গিয়েছে। আর এটা হয়তো তারই প্রিলিমিনারি এফেক্ট। চান্স নেওয়া উচিত হবে না!" বলতে বলতেই অধিরাজ উত্তেজিত হয়ে ওঠে,—"আমি এখনই টাকলুর সঙ্গে আসছি অ্যাম্বুলেন্স সমেত। মিঃ জয়সওয়ালকে ইমিডিয়েটলি হসপিটালাইজড করতে হবে! তার আগে ডঃ চ্যাটার্জী একটু স্যাম্পল নিয়ে নেবেন। তারপরই ওঁকে হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হবে। তুমি এখন ওখান থেকে কোথাও নড়বে না। লক্ষ্য রাখবে এর মধ্যে আর কোনওরকম পরিবর্তন বা সিম্পটম দেখা যায় কি না। কোনোরকম বেগতিক দেখলেই জানাবে। আর কেউ যেন মিঃ জয়সওয়ালকে এর মধ্যে কোনও ড্রিঙ্ক বা খাবার না দেয়, সেদিকে সতর্ক নজর রেখো। আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পৌঁছচ্ছি।"

"ওকে - স্যার।"

ফোনটা নামিয়ে রেখে অর্ণব ফের মিঃ জয়সওয়ালের দিকে তাকায়। তিনি এখনও রাত জাগা প্যাঁচার মতো গোল গোল চোখ করে বসে আছেন। স্বাভাবিকতার বিন্দুমাত্রও লক্ষণ নেই। মিসেস জয়সওয়াল তাঁর দিকে তাকিয়ে মুখ ভেটকে আছেন। বিড়বিড় করে একবার বললেন, "ফিল্মে নামলে অস্কার বাঁধা ছিল।" কিন্তু কার উদ্দেশে বললেন কে জানে!

অর্ণব আড়চোখে ভদ্রমহিলাকে জরিপ করতে থাকে। আগেরবার তার যে কথাটা মনে হয়েছিল, আজও তাই হল। মানসী জয়সওয়াল যতক্ষণ মুখ না খোলেন ততক্ষণ সত্যিই মারকাটারি সুন্দরী! যেমন ডালিমের মতো রঙ, শ্বেতপাথরের মতো মসৃণ ত্বক, তেমন চোখা চোখা চোখ-মুখ, তেমনই দুরন্ত ফিগার! মেহগনি রঙের লম্বা চুল! প্রায় পাঁচ ফুট সাত কি আট ইঞ্চি লম্বা। নির্মেদ শরীর। ওঁকে দেখলে যে কেউ প্রেমে পাগল হবে। তার ওপর স্লিভলেস নাইটির ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ে শ্বেতপাথরের মতো বাহুযুগল। ডান বাহুতে

আবার একখানা ট্যাটু করিয়েছেন! ট্যাটুটা কাঁকড়াবিছের! প্রথম দর্শনে ট্যাটুটা দেখে অবাক হয়েছিল সে। এরকম সুন্দরীর বাহুমূলে কাঁকড়াবিছে কেন? মুখ খোলার পর অবশ্য কারণটা বুঝেছে। যতই সুন্দরী হোন, ভদ্রমহিলা ভালোই হুল দিতে জানেন!

"উনি ঠিক কবে বেরিয়েছিলেন মনে আছে - আপনার?" বহুবার করা প্রশ্নটা আবার রিপিট করল অর্ণব।

"বারবার একই কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন? এই দেখুন।" ভদ্রমহিলা এবার রেগে গিয়ে নিজের অত্যন্ত দামি মোবাইলটা এগিয়ে দিলেন তার দিকে। অর্ণব দেখল, তাতে একটি মেসেজে পরিষ্কার করে লেখা আছে, 'মানসী, আমি জরুরি একটা ট্যুরে বেরোচ্ছি। তুমি ঘুমোচ্ছ বলে ডিস্টার্ব করলাম না, বিজয়।' মেসেজটা এসেছে এগারো তারিখ ভোর চারটে বাজতে পাঁচে।

"এখনও কি আপনার মাথাতে ব্যাপারটা ঢোকেনি?" মানসী এক গঙ্গা কথা বলতে শুরু করলেন, "দেখুন, আপনাকে অলরেডি এই কয়েকঘণ্টায় পাঁচশো পঁয়ষট্টি বার বলেছি যে উনি কখন যান, কোথায় যান, কার কাছে যান, আমায় কখনই কিছু বলেন না। উনিও বলার প্রয়োজন বোধ করেন না। আমিও জিজ্ঞাসা করি না। উনিও বিজি। আমিও বিজি। আমার হার্বাল বিউটি প্রোডাক্টের বিজনেস। ওঁর পায়ে পায়ে ঘুরে গোয়েন্দাগিরি করার সময় নেই। আন্দাজ এই মাসের এগারো তারিখ ভোর রাতেই উনি বেরিয়ে গিয়েছিলেন। আমি ঘুমিয়েছিলাম। আমার ফোনে এই মেসেজটা করে জানান যে জরুরি ট্যুরে যাচ্ছেন। বিজয় এরকম প্রায়ই করে থাকেন। তাই আমি আদৌ ওরিড হইনি! তাছাড়া ওঁকে নিয়ে ভাবার সময়ও নেই। আমার নিজস্ব বিজনেস রয়েছে।"

"হার্বাল বিউটি প্রোডাক্ট?" অর্ণব বেচারা তোপের লাগাতার গর্জনের মুখে কী করবে বুঝে পাচ্ছিল না। অসহায়ের মতো মিনমিনিয়ে কোনোমতে প্রশ্নটা করল সে। -

"হ্যাঁ। নানারকমের বিউটি প্রোডাক্ট। জেনারেল ক্রিম, লোশন, ফেশিয়াল, স্পায়ের নানান কিটস্ ছাড়াও অ্যারোমা প্রোডাক্টের বিজনেসও করি।"

'অ্যারোমা' শব্দ শুনেই সচকিত হয়ে ওঠে সে। ডঃ চ্যাটার্জী অ্যারোমা অয়েলের কথা বলেছিলেন! আবার ইনিও অ্যারোমা প্রোডাক্টের ব্যবসা করেন! ব্যাপারটা কী!

– "আপনার অ্যারোমা প্রোডাক্টের বিজনেসও আছে?"

মানসী প্রশ্নটা শুনে এমন মুখভঙ্গী করেছেন যেন পারলে এখনই ফুটন্ত অ্যারোমা অয়েলের কড়াইয়ে ফেলে দেন অর্ণবকে। কটমট করে তাকিয়ে বললেন, "শুধু বিজনেস নয়, আমি নিজের ল্যাবে প্রোডাক্টগুলো তৈরি করি। নিশান অ্যারোমা ইন্ডাস্ট্রির নাম শোনেননি? পাশাপাশি আমাদের বিউটি ক্লিনিক, স্পাও আছে।"

কথা তো নয়, যেন কাঁকড়াবিছের হুল! অর্ণব ঢোঁক গিলল! নিশান অ্যারোমা ইন্ডাস্ট্রির নাম না শুনে সে যে ভয়ঙ্কর পাপ করেছে তাতে সন্দেহ নেই। তারও দোষ নেই। এসব স্পা, স্যালোন বা অ্যারোমাজাতীয় রূপচর্চার বিষয় তার মাথার ওপর দিয়েই যায়। এতদিন ধারণা ছিল, শুধু মেয়েরাই এসব করে। এখন তো দেখছে, পুরুষরাও কিছু কম যায় না। এই কেসটা না এলে এতকিছু জানাই হত না।

—"আপনি পারলে একবার একটা ম্যাসাজ নিয়ে নিন।" এতক্ষণে মিসেস জয়সওয়ালের কণ্ঠস্বর একটু নরম হল, আপনার অরিজিনাল কমপ্লেক্সন ফেয়ার। কিন্তু কিছুটা ট্যানড্ হয়ে গিয়েছে। ম্যাসাজ আর স্পা করালে খানিকটা ডি-ট্যানড হয়ে যাবেন। স্কিনও একদম স্মুথ হয়ে যাবে। নিজের স্কিনকে নিজেরই ভালোবাসতে ইচ্ছে করবে। তাছাড়া আপনাদের চাকরিতে স্ট্রেসটাও ফ্যাক্টর। সেটাও অনেকটা কমবে।"

সেরেছে! মহিলা যে এবার ম্যাসাজ আর স্পা নিয়ে বক্তৃতা দিতে শুরু করলেন। অর্ণব মনে মনে বিরক্ত হয়। নিজের স্বামীকে নিয়ে চিন্তা নেই, সি.আই.ডি অফিসারের ত্বক নিয়ে যত মাথাব্যথা! এ ধরনের খেজুরে পিরিতের কোনও মানে হয়! কী পাঞ্চলাইন! 'নিজের স্কিনকে নিজেরই ভালোবাসতে ইচ্ছে করবে!' ইনি যে আদতে একজন বিজনেস ও-ম্যান হবেন তাতে আর আশ্চর্য কী!

সে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বিজয় জয়সওয়ালের দিকে তাকিয়েছিল। লোকটা এখনও সেই একই ভঙ্গিতে বসে আছে! একটুও হেলদোল নেই। কী রে বাবা! এ যে পুরো জড়ভরত! অর্ণবের মনে মিসেস জয়সওয়ালের সন্দেহটাই ঘনিয়ে আসে। সত্যি সত্যিই কি উনি সজ্ঞানে নেই? নাকি অ্যাকটিং করছেন!

অবশ্য তাকে আর বেশি কিছু ভাবতে হল না। মিনিট দশেকের মধ্যেই অ্যাম্বুলেন্স এবং ডঃ চ্যাটার্জীকে নিয়ে অধিরাজ উপস্থিত। বিজয় জয়সওয়ালের অবস্থা দেখে ডঃ চ্যাটার্জীর চক্ষু চড়কগাছ! ভ্রূকুটি করে বললেন, "এ কী! এ তো পুরো স্ট্যাচু! কখন থেকে এই অবস্থা?"

মিসেস জয়সওয়াল ডঃ চ্যাটার্জীর থেকেও ভয়ঙ্করভাবে ভুরু কুঁচকে বললেন, "সকাল থেকেই এই অ্যাকটিং চলছে!"

ডঃ চ্যাটার্জী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কয়েকমুহূর্ত ভদ্রলোকের অবস্থা জরিপ করেন। কিছুক্ষণ তাঁর চোখে জোরালো টর্চ মেরে দেখলেন। ব্লাডপ্রেশার আর পালস রেট চেক করলেন! তারপরই কথা নেই বার্তা নেই বিদ্যুৎবেগে সপাটে এক বিরাশি সিক্কার থাপ্পড়!

অধিরাজ হাঁ হাঁ করে ওঠে, "আরে! কী করছেন... কী করছেন...!" অর্ণবও কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই মিসেস জয়সওয়াল বলে উঠলেন, –"বেশ হয়েছে। পারলে আমার তরফ থেকে আরও একটা।"

স্বয়ং ডঃ চ্যাটার্জীও তাঁর কথা শুনে ঘাবড়ে গিয়েছেন। মহিলাদের মধ্যেও যে ওঁর মতো একপিস থাকতে পারে, তা হয়তো আশা করেননি। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললেন, "কী!"

"কিছু না!" শেষপর্যন্ত অধিরাজ ওঁকে উদ্ধার করে, "কী - আপনি?" বুঝলেন

ডঃ চ্যাটার্জীর মুখ চিন্তান্বিত, "ভেবেছিলাম হিপনোটাইজড কি না। কিন্তু একটা সজোরে থাপ্পড় খেয়েও এ পাবলিক নট আউট! ভালো বুঝছি না। হসপিটালাইজড করাই ভালো।"

"মানে!" অধিরাজের চোখে বিপন্নতা, হিপনোটাইজড নন? তবে কী?"

- ডঃ চ্যাটার্জী সিরিঞ্জ আর ব্লাড স্যাম্পলের শিশি বের করে স্যাম্পল নিতে নিতে বলেন, "এখনই হাতে সেরকম কোনও প্রমাণ নেই। ব্লাডরিপোর্ট এলে পরিষ্কার বলতে পারব। কিন্তু মাথায় এই টাকটা তো এমনি এমনিই পড়েনি। এই তোলো হাঁড়ির মধ্যে প্রচুর অভিজ্ঞতা আছে। সিম্পটমগুলো দেখে রিপোর্টে কী আসবে তা এখনই বলতে পারি।

কোনও বিষ থাকলে অবশ্য সেটা বলতে পারব না। কিন্তু তার সঙ্গে যা আসবে তা খানিকটা বুঝে গিয়েছি।”

“কী?”

—“আ ভেরি স্ট্রং ডোজ অব্ ডেট-রেপ ড্রাগ।” ডঃ চ্যাটার্জী ব্লাড স্যাম্পল এভিডেন্স ব্যাগে পুরে টাকটাকে ফের আদর করতে শুরু করেছেন, “ওঁর এই অবস্থা এমনি এমনিই হয়নি। চোখের তারা একদম স্থির। টর্চের আলোয় পিউপিল্স একটু কুঁকড়ে গেল ঠিকই, কিন্তু উনি চোখের পাতাটুকুও ফেললেন না! ব্লাডপ্রেশার আর পালস রেটও লো। এই লেভেলের অ্যাকটিং কোনও অস্কারবিজয়ী অভিনেতাও করতে পারবেন না। আমার ধারণা ব্লাডে এবং ইউরিনে এইরকম একটা ড্রাগই পাওয়া যাবে। মোস্ট প্রব্যাবলি, রোহিপ্নল্! মোস্ট নটোরিয়াস ডেট-রেপ ড্রাগ।”

অধিরাজের মুখে চিন্তার ছাপ। লোকটাকে শেষপর্যন্ত রোহিপ্নল্ দেওয়া হল! রোহিপ্নল্ বা ডেট-রেপ ড্রাগের কেস সে বেশ কয়েকটা স্বচক্ষেই দেখেছে। সচরাচর এগুলো সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট বা রেপ কেসের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এর বিশেষত্বই হল যে ভিকটিম ঘটনার পরে কিছুই মনে করতে পারে না! সে কোথায় গিয়েছিল, কী করেছিল, কার সঙ্গে দেখা করেছে, বিগত দিনগুলোর কিছুই তার স্মরণে থাকে না। হ্যালুসিনেট করে, ব্ল্যাক-আউট হয়, কনফিউজড হয়ে যায়, কখনও বা এরকমই স্তব্ধ-জড়ভরত হয়ে বসে থাকে। অতীত তার কাছে অন্ধকার! এমনকী বর্তমানও আবছা! বিজয় জয়সওয়ালও এখন তেমনই কোনও ড্রাগের ঘোরে আছেন। সে ডঃ চ্যাটার্জীর দিকে তাকায়, “তার মানে...?”

- “তার মানে পণ্ডশ্রম। উনি তোমার একটি প্রশ্নেরও জবাব দিতে পারবেন না। কারণ যে ওঁকে লোপাট করেছিল সে সম্ভবত এতদিন ধরে ড্রাগের ডোজ অল্প অল্প করে দিয়ে গিয়েছে। নয়তো এত খারাপ অবস্থাও হওয়ার কথা নয়। আমার আশঙ্কা উনি কোথা থেকে লোপাট হয়েছিলেন, কীভাবে ফিরলেন, কোথায় ছিলেন, ব্লা... ব্লা... ব্লা... তোমাদের কোয়েশ্চেনেয়ারের একটি প্রশ্নের উত্তরও ওঁর কাছে নেই। হি ইজ জাস্ট লাইক আ ব্ল্যাঙ্ক পেজ।”

অধিরাজ বুঝতে পারল সে আবার একটা ডেড এন্ডের সামনে এসে পড়েছে! এটা কি শেষমেষ ব্লাইন্ড কেস হতেই চলেছে? একমাত্র একটাই ক্ষীণ আশা ছিল যে বিজয় জয়সওয়াল হয়তো কিছু বলবেন। কিন্তু সে সম্ভাবনাও এখন বিশ বাঁও জলে! মিঃ জয়সওয়াল তো এটাও বলতে পারবেন না যে এগারো তারিখ ভোরে তিনি কোথায় গিয়েছিলেন! সিকিউরিটি গার্ড ও গেটকিপারের বয়ান অনুযায়ী মিঃ জয়সওয়ালের গাড়িটা মেইন গেট দিয়ে ঠিক ভোর চারটে নাগাদ বেরিয়েছিল। কিন্তু তারপর? গাড়িটাই বা গেল কোথায়!

“লোকটাকে আগে বাঁচানো দরকার!” ডঃ চ্যাটার্জী বললেন, —“হসপিটালাইজড করে ডাক্তারদের সমস্ত ইনভেস্টিগেশন করতে বলো। হয়তো ওঁকে বিষটাও দেওয়া হয়েছে যেটার প্রতিক্রিয়া এখনও শুরু হয়নি। বিষ যদি না দেওয়াও হয়, ড্রাগের ওভার ডোসেজও সুবিধার বিষয় নয়। আর এক মুহূর্তও দেরি করা ঠিক হবে না রাজা।” -

ডঃ চ্যাটার্জীর মতামতকে কখনই উপেক্ষা করে না অধিরাজ। সঙ্গে সঙ্গেই বাইরে অপেক্ষারত অ্যাম্বুলেন্স বিজয় জয়সওয়ালকে নিয়ে গেল। মিসেস জয়সওয়ালও কোনও সমস্যা করলেন না। বরং লক্ষ্মী মেয়ের মতোই কো-অপারেট করছিলেন। অর্ণব অবশ্য তাঁর ভয়েই কাঁটা হয়ে ছিল। মানসী জয়সওয়াল যেভাবে অধিরাজকে দেখছিলেন, মনে হচ্ছিল এখনই এক গ্লাস জল দিয়ে গিলে খাবেন। অর্ণব ভাবছিল, এই বুঝি তিনি স্যারকে ম্যাসাজের জন্য টেনেই নিয়ে গেলেন বলে। একবার তো বলেই বসেছিলেন, “আপনি রেগুলার বডি স্পা, হেয়ার স্পা করেন, তাই না? চোখের পাতায় কী লাগান? ক্যাস্টর অয়েল!”

- “আজ্ঞে না।” অধিরাজ ডঃ চ্যাটার্জীর সঙ্গে নীচু স্বরে কিছু একটা আলোচনা করছিল। কথাটা শুনে মিসেস জয়সওয়ালের দিকে তাকিয়ে শিশুসুলভ হাসল, “ওসব করি না। সময় নেই।”

- “সে কী!” মানসী বিস্মিত, “বোঝা যায় না তো!”

ডঃ চ্যাটার্জী ‘হেয়ার স্পা' শুনেই বোধহয় গরম হয়ে গিয়েছিলেন। কড়কড় করে উঠে বললেন, “এসব ম্যান মেড নয়। ওপরওয়ালাই সব স্পা-রে-গা-মা করেই ওকে

পাঠিয়েছেন। বুঝেছেন?"

মিসেস জয়সওয়াল তাঁর দিকে তাকিয়েছেন, "তবে আপনিই ম্যান মেড হেয়ার গ্রোয়িং সলিউশন টেস্ট করে দেখুন না। আমাদের বিউটি ক্লিনিকে 'অ্যালোপেশিয়া'রও ট্রিটমেন্ট হয়। আপনাকে তো আর ওপরওয়ালা দেননি। আমরাই নয় চুল বসিয়ে দেব। ম্যানমেড।"

অর্ণব আর অধিরাজ দু'জনেই এবার প্রমাদ গুনল। ডঃ অসীম চ্যাটার্জী খেপে খাঞ্জা খাঁ হয়ে কিছু একটা চরম কথা বলতেই যাচ্ছিলেন। তার আগেই লাফ মেরে তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে অধিরাজ। ডঃ চ্যাটার্জীকে পিঠের আড়ালে রেখে বলে উঠল, "অফকোর্স উনি ট্রাই করবেন ম্যাম। আপনার কার্ড পাওয়া যাবে? পার্সোনাল নাম্বার?"

মানসী রক্তিম ঠোঁট মুচড়ে রহস্যমাখা হাসলেন, "শিওর"। তারপরই কেমন যেন 'সখী ধরো ধরো' স্টাইলে চলে গেলেন। অধিরাজের পেছনে দাঁড়িয়ে রাগে হুমহাম করছিলেন ফরেনসিক এক্সপার্ট। ভদ্রমহিলা চলে যেতেই রেগেমেগে বললেন, "এটা কী হল?"

অধিরাজ নিরীহ মুখভঙ্গি করেছে, "কেন? মাথায় চুল গজানোর একটা স্কোপ পেয়েছেন, চান্স নেবেন না?"

—"চান্স তো উনি মারছেন!" রাগে, অপমানে ওঁর মুখ বেগুনি, "চুল নয়, অন্য কিছুর চান্স ! তাও তোমার সঙ্গে! লজ্জা করে না? মহিলা তোমার মায়ের বয়সী!"

সে মাথা চুলকোতে চুলকোতে লাজুক হাসল, "না না। অত নয়। আপনি একটু বাড়িয়েই বলছেন।"

"মহিলা বিবাহিত!"

- "তাতে কী? দারুণ সুন্দরী।" নিরুত্তাপ উত্তর, "আমি একটু সুন্দরী মেয়েদের কার্ড চাইতে পারি না?"

-"না! পারো না!" হুমহুম করে বললেন তিনি, "এই কেসটার পড়ে তুমি বিগড়ে যাচ্ছ!"

"কী মুশকিল!" অধিরাজ হেসে ফেলল, "এদিকে আপনি সুন্দরী মেয়ে দেখে বিগড়ে যাওয়ার কথা বলছেন। ওদিকে অর্ণব বলছে, ওর 'স্পেশাল কেউ' নাকি আমি! দু'জনে মিলে শুরুটা করেছেন কী?"

অর্ণবের কান লজ্জায় লাল হয়ে যায়। কি কুক্ষণে যে মুখ ফস্কে কথাটা বলে ফেলেছিল! অসীম চ্যাটার্জী কিছু বলতে গিয়েও চেপে গেলেন। মিসেস জয়সওয়াল এদিকেই ক্যাট-ওয়াক করতে-করতে আসছেন। ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ চাপা গলায় স্বগতোক্তি করেন, "পুরো ঘেমে নেয়ে গেলাম যে! এই ভ্যাম্পটা কি র‍্যাম্পে হাঁটছে?"

– "এই নিন।" কার্ডটা সযত্নে অধিরাজের হাতে তুলে দিলেন মানসী। এই সুযোগে হাতে হাত, আঙুলে আঙুল স্পর্শ করল। অধিরাজ মিষ্টি হেসে বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ।"

"অলওয়েজ ওয়েলকাম।"

মিঃ জয়সওয়ালের ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে ডঃ চ্যাটার্জী যেন হাঁফ ছাড়লেন। অধিরাজ ভদ্রমহিলার কার্ডটা খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছিল। তার ভুরুর মাঝখানে ফের চিন্তার ভাঁজ। সেটা লক্ষ্য করেই ডঃ চ্যাটার্জী বলে ওঠেন, —"কী দেখে এত চিন্তিত হয়ে পড়লে? কার্ডটাতে কি মহিলার ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স লেখা আছে?"

সে ব্যঙ্গটাকে উড়িয়ে দিয়ে চিন্তিত স্বরে বলল, "না, ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স নয়, ওঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা লেখা আছে। মিসেস মানসী জয়সওয়াল একজন স্কলার মহিলা। পিএইচডি ইন বোটানি। ইউনিভার্সিটি অব শেফিল্ড থেকে ডিগ্রি আর সোনার মেডেল এনেছেন। এককথায় উনি একজন অত্যন্ত প্রতিভাময়ী উদ্ভিদবিশারদ!"

- "হো-য়া-ট!" ডঃ চ্যাটার্জী প্রায় লাফিয়েই ওঠেন, "এটার জন্যই কার্ড চেয়েছিলে?"

"আজ্ঞে।" সে নম্রভাবেই জানায়, "কাউকে তো আর মুখের ওপরে জিজ্ঞাসা করা যায় না, আপনি কী নিয়ে পড়াশোনা করেছেন! সন্দেহ করবে। সে জন্যই কার্ড চেয়েছিলাম। সবাই অবশ্য শিক্ষাগত যোগ্যতা কার্ডে লেখে না। কিন্তু ইনি একটু অন্যরকম চরিত্রের। নিজেকে জাহির করার মানসিকতা আছে ওঁর। সেজন্যই চান্স নিয়েছিলাম। আর ঢিলটা ঠিকই লেগেছে।"

"তার মানে উনি একাই চান্স নিচ্ছিলেন না, তুমিও নিচ্ছিলে! কী পাজি ছেলে রে বাবা!"

ডঃ চ্যাটার্জীর কথার উত্তর না দিয়ে মৃদু হাসল অধিরাজ। অর্ণবের দিকে তাকিয়ে শান্ত স্বরে বলল, "ওঁর চারপাশে ফিল্ডিং বসিয়ে দাও অর্ণব। আমাদের ইঙ্গিত নারীটির সঙ্গে ভদ্রমহিলার প্রোফাইল খাপ খাচ্ছে। বয়স একটু বেশি হলেও বোঝা যায় না।"

তার কথামতোন সেদিনই নিয়ম করে মিসেস জয়সওয়ালের ওপর নজর রাখছে প্লেন ড্রেসের মহিলা অফিসাররা। মিঃ জয়সওয়াল ফিরে আসার পর আটচল্লিশ ঘণ্টা কেটে গিয়েছে। কিন্তু কোনওদিকেই কোনও সূত্র পাওয়া যাচ্ছে না। মানসী জয়সওয়ালের গতিবিধির মধ্যে তেমন কোনও অস্বাভাবিকতা পাওয়া যায়নি। নিয়মিত অফিস, বাড়ি, কনফারেন্স করে বেড়াচ্ছেন। হসপিটালে স্বামীকে ভিজিটিং আওয়ারে দেখতেও এসেছেন। এছাড়া তাঁর আর কোনও মুভমেন্ট বিশেষ নেই। ফোন রেকর্ডও ক্লিন।

গত আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে অবশ্য তিনটে জিনিস হয়েছে। প্রথমতঃ মিঃ জয়সওয়ালের রক্ত পরীক্ষা করে ফলাফল জানিয়েছেন ডঃ চ্যাটার্জী। যথারীতি মিঃ জয়সওয়ালের ব্লাডে কোনও বিষের অস্তিত্ব নেই, তবে খুব বেশি মাত্রায় রোহিপ্নলের ট্রেস পাওয়া গিয়েছে। ওঁর ব্লাডে অত্যন্ত বেশি মাত্রায় অ্যালকোহলও আছে। সম্ভবত অ্যালকোহলের সঙ্গেই রোহিপ্নল দেওয়া হয়েছে তাঁকে। বিজয় জয়সওয়াল ডাক্তারদের পরিচর্যায় এখন খানিকটা সুস্থ। অত্যন্ত স্বস্তির কথা যে তাঁর লিভার ঠিকঠাকই আছে। রেনাল ফাংশনও যথেষ্ট ভালো। অর্থাৎ কোনওরকম অঘটন ঘটার সম্ভাবনা নেই।

দ্বিতীয়ত, সাইবার ক্রাইম ডিপার্টমেন্ট আই.পি স্পুফিঙের যত কেস রেকর্ডে ছিল, সব পাঠিয়েছে। প্রাথমিকভাবে প্রায় দুশো হ্যাকারের প্রোফাইল এসেছিল ওদের কাছে। তার মধ্যে বেশ কিছু প্রতিভাবান হ্যাকারদের গোয়েন্দাবিভাগ নিজেদের কাজে লাগিয়েছে। অর্থাৎ তারা নিজেরাই এখন সাইবার সেলের কর্মী। বাকিদের মধ্যে অনেকেই বর্তমানে বিদেশে বা কলকাতার বাইরে প্রতিষ্ঠিত। তারা এ জাতীয় বদমায়েশি করে নিজেদের দুর্দান্ত কেরিয়ার বরবাদ করবে বলে মনে হয় না। অতএব তাদের বাদ দিয়ে এখন বাকি প্রোফাইলগুলো নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি হচ্ছে। যদিও এখনও তাদের মধ্যে ছুপা রুস্তমটিকে পাওয়া যায়নি। মেয়ে হ্যাকারের সংখ্যা অবশ্য তুলনামূলক কম। কিন্তু সাবধানের মার নেই। অধিরাজের সন্দেহ, এই খুনগুলোর মধ্যে একাধিক মাথা রয়েছে। তাই ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে সব হ্যাকারের স্ক্যানিংই চলছে। এখন তারা কোথায় আছে, কী করছে, সে সব খবরই নেওয়া চলছে।

তৃতীয়ত, মিঃ জয়সওয়ালের মোবাইল ফোনটা অনেক খোঁজাখুঁজি করে শেষপর্যন্ত মেরিলিন প্ল্যাটিনাম হাউজিং কমপ্লেক্সের বাগানেই পাওয়া গিয়েছে। ফোনটা অক্ষত অবস্থাতেই আছে। তবে সুইচড অফ ছিল। সেটাকে এভিডেন্স হিসেবে জমা করা হয়েছে। সিকিউরিটি গার্ডদের দফায় দফায় জেরা করেও নতুন কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি। তারা মিঃ জয়সওয়ালের গাড়িকে বেরিয়ে যেতে দেখেছে, কিন্তু ভেতরে স্বয়ং তিনিই ছিলেন কি না, তা বলতে পারছে না। মেরিলিন প্ল্যাটিনাম হাউজিঙের গ্যারাজে সিসিটিভি আছে, কিন্তু একটা ক্যামেরাও চলে না। তাই গাড়িটা নিয়ে কে বেরিয়েছিল তা দেখা সম্ভব নয়। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, মিঃ জয়সওয়ালকে ফিরে আসতেও ওরা দেখেনি! তিনি নিজে এসেছেন, কেউ তাকে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছে কিছুই জানে না। না অধিরাজ তখন পারলে গেটকিপারকে এক হাত নেয়, “আস্ত একটা মানুষ ভ্যানিশ হয়ে গেল, আবার ফিরে এল, তুই কিছুই দেখিসনি? উনি কি মিঃ ইন্ডিয়া? না তুই ব্যাটা ‘পাউয়া’ মেরে বসেছিলি!”

গেটকিপার অপরাধীর মতো মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। তার মুখ দেখে বোঝা গেল, হয়তো দ্বিতীয় সম্ভাবনাটাই সঠিক। সে সম্ভবত মদ্যপান করেই বসেছিল। কিন্তু বাকি সিকিউরিটি গার্ডরা নিজেদের বক্তব্যে অটল। তারা কেউ মিঃ জয়সওয়ালকে ফিরে আসতে দেখেনি এবং তিনি কী করে একেবারে বাড়ির দোরগোড়ায় পৌঁছলেন তা জানে না।

অর্ণব লক্ষ্য করল অধিরাজের চোয়াল কঠিন হয়ে উঠছে। সে আস্তে আস্তে বলল, “এমনও তো হতে পারে যে মিঃ জয়সওয়ালকে কেউ সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল, তাই সিকিউরিটি গার্ডরা লক্ষ্যই করেনি?”

‘সেই কেউটা কে অর্ণব?” অধিরাজ একটু অধৈর্য, “তেমন কেউ হলেও তো কারোর না কারোর চোখে পড়বে! জয়সওয়াল খুব ভোরে হাপিশ হয়েছিলেন। যদি ধরেও নিই ঐ আধা অন্ধকারে সেবারে ঠিকমতো কেউ লক্ষ্য করেনি, কিন্তু এবার কী হল! উনি ফিরেছেন তো দিন-দুপুরে! আর যাঁর ড্রাগের প্রভাবে মস্তিষ্কই কাজ করছে না, তিনি একেবারে সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে, লিফটে বা সিঁড়ি বেয়ে আটতলায় একেবারে নিজের ফ্ল্যাটের সামনেই পৌঁছলেন! এটা কী করে সম্ভব?”

"হতে পারে ওঁকে কেউ মেক আপ দিয়ে নিয়ে এসেছিল, তাই গার্ডরা চিনতে পারেনি।"

"মেক আপ! তবে মিসেস জয়সওয়াল চিনলেন কী করে? মেক-আপটা মুছলই বা কখন? কোথায়? দিনের বেলায় সিকিউরিটি গার্ডরা কি 'ব্ল্যাকে'র রাণী মুখার্জির রোলে অভিনয় করছিল?" অধিরাজের আয়ত চোখে রাগ ঝিলিক দিয়ে ওঠে, "তাছাড়া মিঃ জয়সওয়ালের চেহারাটা দেখেছ? এইয়া দশাসই লম্বা চওড়া মার্কামারা চেহারা। ঐ খানদানি থোবড়া লুকোনোর জন্য একমাত্র জাম্বুবানের মেক-আপই দিতে হবে। আর এরকম চেহারা দেখলে কেউ সন্দেহ করবে না? কারোর চোখে পড়বে না যে বিউটির রাজ্যে বিস্ট ঢুকেছে!"

বলতে বলতেই সে দীর্ঘশ্বাস ফেলল, "এবার দয়া করে বলে বোসো না, মিঃ জয়সওয়ালকে নীচ থেকে কেউ তাঁর ফ্ল্যাটের সামনে ছুঁড়ে মেরেছে! উনি মিঃ বিজয় জয়সওয়াল, মিসাইল নন যে একেবারে সঠিক জায়গায় উড়ে এসে পড়বেন।"

অর্ণব হাসতে গিয়েও চেপে যায়। এই পরিস্থিতিতে হাসা উচিত নয়। "এর অর্থ একটাই হতে পারে। সবচেয়ে সহজ দুটো সম্ভাবনা।" অধিরাজের চোখদুটো যেন জ্বলে উঠল, হয় সিকিউরিটি গার্ডরা সবাই একসঙ্গে মিথ্যে কথা বলছে, নয়তো বিজয় জয়সওয়াল কখনও কমপ্লেক্সের বাইরেই যাননি। তিনি ভেতরেই ছিলেন।" -

"কিন্তু তা কী করে সম্ভব! আমি ওঁর ফ্ল্যাট তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেছি।" অর্ণব হাঁ, "তাছাড়া ওঁর গাড়িটাই বা বাইরে নিয়ে গেল কে? সেটা সিসিটিভিতে ধরা পড়লই না বা কেন?"

বিস্মিত অর্ণবের পিঠে হাত রেখে হাসল অধিরাজ, "আমি কখন বললাম যে বিজয় জয়সওয়াল তাঁর ফ্ল্যাটেই ছিলেন! আমি বলেছি, কমপ্লেক্সের বাইরে যাননি। আর গাড়িটার ব্যাপারটা এখনও বুঝতে পারছি না। কিন্তু এটা তো ঠিক, যে ওটা কেউ বের করে নিয়ে গিয়েছিল।"

"তবে গোটা কমপ্লেক্সের সমস্ত ফ্ল্যাটগুলো সার্চ করে দেখব?"

- "এখন নয় অর্ণব।" অধিরাজ রে ব্যানের গগলস্টা চোখে চাপিয়ে বলল, –"ডঃ চ্যাটার্জী এখন বিজয় জয়সওয়ালের জামাকাপড় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছেন। আমার দৃঢ়

বিশ্বাস বুড়ো ঠিক কিছু না কিছু বের করবেই। তখন দেখা যাবে।”

এই অবধি কিছুটা এগোনো গেলেও বাকি খবর বেশ আশঙ্কাজনক । ডঃ চ্যাটার্জীর কথাই সঠিক। এগারো তারিখ থেকে বিজয় জয়সওয়াল একটা দিনের কথাও মনে করতে পারছেন না। এমনকী তিনি এগারো তারিখ কোথায় গিয়েছিলেন, আদৌ কোথাও যাওয়ার কথা ছিল কি না, তা ও ওঁর মনে নেই। শুধু এইটুকু কোনোমতে বলতে পারলেন যে ওঁর আদৌ কোনও এক্সট্রা ম্যারিটাল অ্যাফেয়ার নেই। মানসী মিঃ জয়সওয়ালের মা’কে একদমই পছন্দ করেন না। ঐ যা হয় আর কী! সাস-বহু সংঘাত। তিক্ততা এত দূর পৌঁছেছে যে বাধ্য হয়েই বিজয়কে স্ত্রীকে নিয়ে আলাদা হতে হল। বিজয়ের বিধবা মা সল্টলেকের নিজস্ব বাড়িতে একাই থাকেন, আর ওঁরা মেরিলিন প্ল্যাটিনাম হাউজিঙে। ইদানীং মায়ের শরীর-স্বাস্থ্য ভালো যাচ্ছে না বলে বিজয় মাঝে-মাঝেই তাঁর কাছে গিয়ে থাকেন। কিন্তু স্ত্রীকে কিছুই জানান না। কারণ তিনি জানলেই অশান্তি করবেন। কিছুতেই ওঁকে মায়ের কাছে যেতে দেবেন না। আর এই গোপনীয়তার কারণেই মানসীর ধারণা যে বিজয় অন্য কোনও মহিলার সঙ্গে প্রেম করছেন।

বিজয়ের কথা যে সঠিক তা ওঁর মায়ের সঙ্গে দেখা করেই জানা গেল। সত্যিই বিজয় ওঁর কাছে মাঝে-মধ্যেই আসেন। মায়ের খেয়াল রাখেন, ডাক্তার দেখান, চেক-আপ করান। যতদিন থাকেন, বৌয়ের ভয়ে ততদিন অবধি ফোন অফ করে রাখেন।

কিন্তু এর বেশি আর কিছু জানা গেল না। বিজয় ঠিকমতো কথা বলতেই পারছেন না। কথা বলতে বলতেই কখনও কখনও এমন কনফিউজড হয়ে যাচ্ছেন যে দুই অফিসারই ঘাবড়ে যাচ্ছে। ডাক্তাররা ওঁর ওপর বেশি চাপ দিতে বারণ করছেন। অগত্যা অধিরাজের অবস্থা প্রায় পরাজিত সৈনিকের মতোই।

“অবশ্য তোমাকে একটা কথা গ্যারান্টি দিয়েই বলতে পারি।” সে হসপিটালের লিফটে উঠে ফের চিন্তান্বিতভাবে বলল, “মিসেস জয়সওয়ালকে এগারো তারিখ চারটে বাজতে পাঁচ মিনিটে যে মেসেজ পাঠানো হয়েছিল, সেটা আর যেই হোক, বিজয় জয়সওয়াল নিজে পাঠাননি।” 1

অর্ণবের মাথায় যেন বাজ পড়ল। সে নির্বাক দৃষ্টিতে তাকায় তার দিকে। "আমি বিজয় জয়সওয়ালের ফোনের মেসেজগুলো দেখছিলাম।

ভদ্রলোকের পূর্বপুরুষ কলকাতাতেই ছিলেন। ওঁর জন্মও কলকাতাতেই। দারুণ ভালো বাংলা বলেন। ইনফ্যাক্ট বাঙালিই হয়ে গিয়েছেন। উনি সবসময়ই নিজের নাম 'বিজয়' এর আদ্যাক্ষর 'বি' লেখেন। প্রত্যেকটা মেসেজেই তাই লিখেছেন। অথচ ওঁর শেষ মেসেজটায় 'বিজয়' নামের অদ্যাক্ষর 'ভি'! যেন বিজয় নয়—ভিজয়।"

—"তার মানে...!" বিস্ময়ে কথা হারিয়ে ফেলে অর্ণব।

–"তার মানে যিনি শেষ মেসেজটি করেছেন তিনি জানতেন না যে বিজয় নিজের নামের আদ্যাক্ষরটি 'ভি' নয় 'বি' লেখেন। ওদিকে সর্বনাশিনীর আর.আই.পি পোস্টে বিজয়ের স্পেলিঙেও প্রথমে 'ভি' আছে। অতএব বিজয় জয়সওয়াল নিজে তো মেসেজটি করতেই পারেন না, এমনকী মিসেস জয়সওয়ালও পারেন না। কারণ স্বামী নিজের নামের স্পেলিং কী লেখেন তা তিনি জানেন। পরদিন হসপিটালের ফর্ম্যালিটিগুলো সারার সময়ে তিনিও পেশেন্টের নামের জায়গায় 'বিজয়' 'বি' দিয়েই লিখেছেন, 'ভি' দিয়ে নয়। সেইজন্যই ব্যাপারটা আরও ঘেঁটে গেল।"

"মিসেস জয়সওয়াল তবে ক্লিন?"

সে মাথা নাড়ে, "নাঃ। ক্লিনচিট একেবারেই দেওয়া যাচ্ছে না। যে কারণে মিসেস জয়সওয়াল মেসেজটা করতে পারেন না, ঠিক সেই একই কারণে মেসেজ পাওয়া মাত্রই তাঁর সন্দেহ হওয়া উচিত ছিল। তিনি কি দেখেননি যে ঐ মেসেজটায় বিজয়ের নামের আদ্যাক্ষর 'ভি'? যা বিজয় জয়সওয়াল কখনই করেন না। স্ট্রেঞ্জ!"

"তবে কি তিনিই...!" -

– "অসম্ভব নয়"। লিফট থেকে বেরিয়ে বাইরের দিকে যেতে যেতে বলল সে, "আমার ধারণা সব প্রশ্নের উত্তর মেরিলিন প্ল্যাটিনাম হাউজিঙেই আছে। খুনী আছে কি না জানি না, কিন্তু কোনও না কোনও লিঙ্ক তো অবশ্যই আছে। দরকার শুধু একটা জোরদার প্রমাণের।" কথা বলতে বলতেই বাইরে চলে এসেছিল ওরা। হসপিটালের বাইরে বেরিয়ে আসতেই অর্ণব আর অধিরাজের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সাংবাদিকের দল। তারা এতক্ষণ

বুম আর ক্যামেরা নিয়ে বাইরে ওঁত পেতে বসেছিল। দুই অফিসারকে দেখেই একগাদা প্রশ্ন নিয়ে লাফিয়ে পড়েছে -

"স্যার, এই সর্বনাশিনীটা কে?"

"কোনও ক্লু পেলেন আপনারা?"

– "একের পর এক ডেথ ফোরকাস্ট হয়ে চলেছে, মানুষ মারা পড়ছে, অথচ পুলিস কেন কিছু করতে পারল না?"

"অফিসার ব্যানার্জ্জী, আপনার একটা বাইট স্যার...।"

"বিজয় জয়সওয়ালের ডেথ ফোরকাস্টটা কি তবে প্র্যাঙ্ক ছিল?" অধিরাজ পুলিশি স্মার্ট ভঙ্গিতে ভিড় ঠেলে অপ্রতিহতভাবে এগিয়ে যাচ্ছিল। শেষ প্রশ্নটা শুনে থমকে গেল। ঘাড় ঘুরিয়ে প্রশ্নকর্তাকে মেপে নিল। প্রশ্নকর্তা নয় প্রশ্নকর্ত্রী। একটু উষ্ণদৃষ্টিতে কৃষ্ণাঙ্গী মহিলা রিপোর্টারকে দেখে নিয়ে সান্দ্র স্বরে উত্তর দিল, "নো কমেন্টস।"

কথাটা বলেই সে দ্রুতছন্দে এগিয়ে গেল নিজের গাড়ির দিকে। নাছোড়বান্দা সাংবাদিকরা তার পেছন পেছন দৌড়েছে। অর্ণব তাদের সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। অধিরাজের এসবই অত্যন্ত বিরক্তিকর ঠেকছিল। মিডিয়ার আর কী! তারা তো আঙুল তুলেই ক্ষান্ত। এদিকে যে কী দমবন্ধ অবস্থা তা শুধু পুলিস আর সি.আই.ডিই টের পাচ্ছে।

অধিরাজ সজোরে নাক টানে। অনেকক্ষণ ধরেই নাক সুড়সুড় করছিল তার। গলাও খুশখুশ করছে। কে জানে সর্দি হবে কি না। কয়েকদিন ধরে ভীষণ অনিয়ম হচ্ছে। স্নান করার সময়ের মাথা-মুন্ডু নেই। তার ওপর চিল্ড এসি। অধিরাজ অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করছিল হাঁচিটাকে কন্ট্রোল করার। কিন্তু আর থামানো গেল না। সর্বসমক্ষে একেবারে অসভ্যের মতো হেঁচেই ফেলল সে।

"ব্লেস ইউ।"

বাইরে থেকে একটা মিষ্টি নরম মেয়েলি স্বরে ভেসে এল শব্দ দুটো।

অধিরাজ অন্যমনস্ক চোখ তুলে তার অজ্ঞাত শুভাকাঙ্খীকে খুঁজল। তার সামনেই সেই কৃষ্ণাঙ্গী পুরুষালি চেহারার রিপোর্টার সাদা ঝকঝকে দাঁত বের করে হাসছে। সে মেয়েটির দিকে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে হাসল "থ্যাঙ্কস।"

আস্তে আস্তে গাড়ির কাচ উঠে গেল। অর্ণব ড্রাইভিং সিটে বসে পড়েছে। কয়েক সেকেন্ডের নিস্তব্ধতা। পরক্ষণেই গাড়ি সশব্দে স্টার্ট নিল। একরাশ ধুলো উড়িয়ে মুহূর্তের মধ্যে তীব্র বেগে বেরিয়ে গেল। বেরিয়ে গেল রিপোর্টারদের পেছনে রেখে।

সাংবাদিকদের ভিড়ে একজোড়া কাজলটানা অপূর্ব চোখ অনিমেষে সেদিকেই তাকিয়ে থাকে। সি.আই.ডি অফিসার অধিরাজ ব্যানার্জীকে আগে টিভিতে, খবরের কাগজে দেখেছে। সম্প্রতি বেশ কয়েকদিন ধরেই টিভিতে দেখছে। আজ একবার স্বচক্ষে দেখতে এসেছিল। উন্নতদেহ, ঋজু মানুষটার চোখদুটো কী অদ্ভুত ! আজ পর্যন্ত অনেক পুরুষ দেখেছে সে, তাদের দৃষ্টিও দেখেছে। কিন্তু এই পুরুষটির দৃষ্টি কী ভীষণ স্বচ্ছ! স্বচ্ছ অথচ গভীর! অজান্তেই চোখ দিয়ে হৃদয়ের গভীরে চলে যায় সে চাউনি। যে কালো কুচকুচে মেয়েটিকে দেখে সে হাসল, সেই হতকুচ্ছিত মেয়েটির দিকে কোনও পুরুষ তাকাবেও না, হাসা তো দূর। অথচ...!

সে বুঝতে পারল এ পুরুষ অন্য ধাতুর! তার সৌন্দর্য একদিকে যেমন আগুন জ্বালায়, তেমনই অপরিসীম মমতাও ডেকে আনে।

বুকের ভেতরে একটা তীক্ষ্ণ ব্যথা টের পেল সে। কানের কাছে এখনও বাজছে একটা গম্ভীর কোমল গলা, 'থ্যাঙ্কস!' শব্দটা অন্য কাউকে বলেছে, ঠিকই, কিন্তু তার 'ব্লেস ইউ'র উত্তরেই তো বলা! !

বন্ধু হলে ভালো হত! কিন্তু তা সম্ভব নয়। তাই শত্রুতাই সই! অন্তত কোনও সম্পর্ক তো হল।

(নয়)

সি.আই.ডি ব্যুরো ততক্ষণে সরগরম। প্রায় যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে সেখানে তদন্ত চলছে।

একদিকে অধিরাজের আরেক সহযোগী অফিসার পবিত্র আচার্য গুচ্ছ গুচ্ছ হ্যাকারের প্রোফাইল নিয়ে বসে আছে। সে আর তার টিম মিলে প্রাক্তন হাইটেক বদমায়েশদের খোঁজ করছে। অর্থাৎ হ্যাকারদের রাউন্ড আপ করছে। প্রত্যেককে ফোন করে ব্যুরোতে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে। সন্দেহজনক হ্যাকারদের লিস্ট তৈরি হচ্ছে। অন্যদিকে শহরের প্রখ্যাত গাড়ি চোর, চোরাই গাড়ি বিক্রেতা, কার-স্মাগলার, হিস্ট্রিশিটারদের লাইন লেগে গিয়েছে গারদে। কনস্টেবলরা মনের সুখে হাত সাফ করছে তাদের ওপরে। কিন্তু কেউ মুখ খুলছে না। সবারই মুখে এক কথা, "আমি কিছু জানি না হুজুর।"

অধিরাজ নিজের কেবিনে ঢুকতে না ঢুকতেই পবিত্র একখানা ফাইল বগলদাবা করে হুড়মুড়িয়ে এসে হাজির, "রাজা, কয়েকটা প্রোফাইল পাওয়া গিয়েছে যেগুলো বেশ সন্দেহজনক।"

সে আড়চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলল, "এখন দয়া করে বোলো না যে বেশি নয়, মাত্র শ' খানেক প্রোফাইল তোমার বেশ সন্দেহজনক লাগছে।"

পবিত্র হাসল, "না, অত বেশি নয়। বেশিরভাগ হ্যাকারকেই ট্র্যাক করতে পেরেছি। কিন্তু তাদের ধরন-ধারণ ঠিক এই কেসের সঙ্গে মিলছে না। শুধু তিনজন মিসিং। তাদের প্রোফাইল এই কেসের জন্য একদম পারফেক্ট। কোয়াইট ইন্টারেস্টিং ও।"

অধিরাজ চেয়ারে বসে সিগারেটের প্যাকেট বের করতে করতে বলে, —"আই অ্যাম অল্ ইয়ার্স।"

পবিত্র অম্লানবদনে তার সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটা লম্বা স্টিক তুলে নিয়ে বলল,"আই লাভ ইন্ডিয়া কিংস।"

—"অ্যান্ড আই লাভ ইউ সো...।" সে লাইটার দিয়ে একটু ঝুঁকে পবিত্র'র স্টিকটা ধরিয়ে দিয়েছে, "এই কথাটা বলব কি না, তা নির্ভর করছে তোমার ডেটার ওপরে।"

– "এলভিসের গান একটু বেশিই শুনছ।", পবিত্র একটা সুখটান দিয়ে বলল, "বেশ, তোমায় তোমার তিনজন প্রেমিকার বিবরণ দিয়েই দিই।" "প্রেমিকা!" নিজের সিগারেটটা ধরিয়ে বলল অধিরাজ, "প্রেমিক নয়? মানে তিনজনই ফিমেল?

—"নিঃসন্দেহে। যদি না ইতিমধ্যেই সেক্স পালটে থাকে।" সে ফাইল খুলে বেশ কিছু কাগজপত্র বের করে। ওগুলো সব সাইবার হিস্ট্রিশিটারদের রেকর্ড। অধিরাজ কাগজগুলো তুলে নিয়ে মন দিয়ে দেখছে। পবিত্র বলল, "প্রথম রত্নটির নাম সোহিনী ভট্টাচার্য। ২০০৯ সালে সাইবার ক্রাইম ওয়ার্লডে রীতিমতো হইচই ফেলে দিয়েছিলেন। ইনি একের পর এক ই-মেল করে গোয়েন্দা দফতরকে রীতিমতো ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছিলেন। প্রত্যেকটি ই-মেলের বিষয়-বস্তু একই। শহরের বিভিন্ন জায়গায় নাকি বম্বিং হতে চলেছে । সাইবার সেল যখন অ্যাকশনে নামল, তখন আই.পি ট্র্যাক করতে গিয়ে জান কয়লা হয়ে গিয়েছিল তাদের। কোনওটা দুবাইয়ের তো কোনওটা বাংলাদেশের আই.পি! চমৎকার আই.পি স্পুফিং করে চলেছিলেন লাগাতার। যদিও দু'দিনের মাথায় সাইবার সেল এই ছদ্মবেশি শয়তানীটিকে ধরে। নিজের জবানবন্দীতে তিনি বলেছিলেন যে ব্যাপারটা নিছকই মজা করার জন্য করেছেন। একটি থ্রিলার পড়েই নাকি তার মাথায় এই স্পুফিঙের কনসেপ্ট আসে। সেটাই প্র্যাক্টিক্যালি করে দেখতে গিয়েছিলেন। ওদিকে তার 'মজা'র চোটে পুলিস আর সাইবার সেলের লোকেরা চোখে সর্ষেফুল দেখছিল।"

"হুম অধিরাজ সোহিনী ভট্টাচার্য'র ছবি ও ডিটেলস দেখতে দেখতেই বলল, "যখন এই দুষ্কর্মটি করেন তখন তিনি টিন বাজাচ্ছিলেন! আই মিন, টিন এজার ছিলেন! মাত্র ষোল বছর বয়েস। ছবিতে তো দেখছি একেবারে শান্ত শিষ্ট-টিকি বিশিষ্ট। হর্সটেল বাঁধা স্কুল-গার্ল লুক, চোখে একখানা ভারী পাওয়ারের চশমা। কালো, কিন্তু মিষ্টি।"

"হ্যাঁ। তবে তখন বয়েসটা খুব অল্প ছিল। সেজন্যই তাকে শুধু একটু ধমক-ধামক দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। তবে তিনি তাতেই থেমে থাকেননি। দ্বিতীয়বার রীতিমতো একটি সাইট খুলে চাইল্ড পর্ণোগ্রাফি স্প্রেড করছিলেন। এটা যখন করেন, তখনও তিনি টিনই বাজাচ্ছিলেন। অর্থাৎ, শি ওয়াজ এইট্টিন প্লাস।" -

— "গ্রেট!" সে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ে, "এবারও তো শ্রীঘরে যাননি দেখছি।"

"না। বড়লোকের বেটি। বাবা নামি উকিল দিয়ে বাঁচিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু তাতেও তার শিক্ষা হয়নি। থার্ডবার...।" -

"ব্যাঙ্কের সিস্টেমে ঢুকে পড়ে পঞ্চাশ লাখ টাকার অনলাইন ট্রানজাকশন গুলিয়ে দিয়েছিলেন। এবারও আই.পি স্পুফিং করেছিলেন। অন্য একজনের ওয়াই ফাই রাউটারকে হ্যাক করে কীর্তিটি করেছিলেন। তবু ধরা পড়লেন।" অধিরাজ দীর্ঘশ্বাস ফেলল, "এবার টিন নয়, ব্যান্ড বেজে গেল! এটা তিনি তেইশ বছর বয়েসে করেছিলেন এবং তারপর থেকেই নিখোঁজ।"

—"আজ পর্যন্ত তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। ধরা পড়ার আগেই হাওয়া!" পবিত্র বলতে থাকে, "যে পাবলিকের মাথায় অন্যের ওয়াই ফাই রাউটার হ্যাক করার বুদ্ধি আসতে পারে, তার পরবর্তী ধাপ, ওপেন আনসিকিওর্ড হটস্পট ইউজ করার মতো খচরামিও তাঁর মাথায় আসা আশ্চর্য কিছু নয়!"

— "ইন্টারেস্টিং।" সে সোহিনী ভট্টাচার্য'র ছবির ওপরে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, "নেক্সট কে?"

"শান্তিপ্রিয়া চক্রবর্তী। এর মতো অশান্তিপ্রিয়া আর কেউ আছেন কি না কে জানে! ইনি খাতা খোলেন মাত্র পনেরো বছর বয়সে। অনলাইন ফ্রডে প্রায় মাস্টারডিগ্রি হাসিল করেছেন। আই,ডি স্পুফিং ওনার মতো ভালো আর কেউ পেরেছে কি না সন্দেহ। ইনিও একসময় একটি ফেক ফেসবুক প্রোফাইল খুলে সেলিব্রিটিদের ফেক ডেথ পোস্ট দিতেন। আই মিন ডেথ হোক্স আর কী। আই.ডি স্পুফিংকে প্রায় শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। তবু পুলিস ওনাকে ধরেছিল। কিন্তু পনেরো বছর বয়েস হওয়ার দরুণ ইনভেস্টিগেটিং অফিসার একেও সামান্য ধমক ধামক দিয়ে ছেড়ে দিয়েছিলেন। শান্তিপ্রিয়া ধমকটা তখন হজম করলেও তার ইগোয় হেভি লেগেছিল। রিভেঞ্জটা ভালোই নিয়েছিলেন। এর কিছুদিন পরই খোদ কলকাতা পুলিসের ওয়েবসাইটের ওপরেই অ্যাটাক হল। ওয়ান ফাইন মর্নিং, কলকাতা পুলিশের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে সানি লিওনের সেক্সি নৃত্য দেখে সবারই চক্ষু চড়কগাছ!"

"সানি লিওনের নাচ তোমরা সবাই দেখলে – শুধু আমিই বাদ গেলাম!" অধিরাজ কাঁচুমাচু মুখ করেছে 'সানিকে..সরি...সরি... শন্তিপ্রিয়াকে কোথায় পাবো?" -

"এখানেই গোলমাল।" পবিত্রর মুখে চিন্তার ভাঁজ, "এই মেয়েটির খোঁজও পাওয়া যাচ্ছে না। একবছর আগেও তিনি জুভেনাইল হোমে ছিলেন। ছাড়া পাওয়ার পর আর বাড়ি ফেরেননি। অর্থাৎ পুরো কর্পূরের মতো ভ্যানিশ !"

– "যাঃ! সানি লিওনও গেলেন!" পবিত্র হাসছে, "বেটার, তুমি সানি লিওনের বদলে শান্তিপ্রিয়াকেই দেখো। কালো কুচকুচে। এ ও তোমার সর্বনাশিনীর আদলেরই প্রোফাইল। মেয়েটা দেখতে নিরীহ, কিন্তু ভয়ঙ্কর রিভেঞ্জফুল! আর ফেক ফেসবুক প্রোফাইল, ডেথ হোক্সের ব্যাপারটা কিন্তু সর্বনাশিনীর স্টাইলের সঙ্গেই মিলছে।"

- "ঠিক।" অধিরাজ শান্তিপ্রিয়ার ছবির ওপরে চোখ বোলাতে বোলাতে বলল, "নেক্সট?"

"রিয়া বাজাজ। বিখ্যাত দাবা খেলোয়াড় উমঙ্গ অ্যান্ড্রু বাজাজের ছোট কন্যে। মিস্ বাজাজের কাণ্ড দেখে পুলিসেরই চোখ ছানাবড়া হয়ে গিয়েছিল। তিনি একখানা ফেক ফেসবুক প্রোফাইল বানিয়ে সেখান থেকে নানান সেলিব্রিটি, প্রভাবশালী মহিলাদের অশ্লীল মেসেজ ও ভিডিও পাঠাচ্ছিলেন। এমনকি তাঁরা প্রতিবাদ জানালেও আপত্তিকর ভাষায় হুমকিও দেন। তার শিকারের মধ্যে কেউ নামকরা নায়িকা, কেউ মডেল, কেউ গায়িকা, কেউ বা নেত্রী অথবা সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট। ওনার উৎপাতে অতিষ্ঠ হয়ে সেলিব্রিটিরা সাইবার সেলে অভিযোগ জানান। সাইবার সেল যে আই.পি অ্যাড্রেসটি খুঁজে পেল সেটি কিন্তু রিয়া বাজাজের ল্যাপটপের নয়, মিঃ বাজাজের ল্যাপটপের। বেচারি দাবাড়ু মিঃ বাজাজ ফেঁসে গেলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল মিঃ বাজাজ নন, আসল কীর্তিমতী তাঁর কন্যা রিয়া। তিনি যত বদমায়েশি সব বাপের আই.পি অ্যাড্রেস নকল করে করছিলেন।"

– "ইনিও টিন!"

- "হ্যাঁ, বছর চারেক আগে আঠেরো ছিলেন। এখন বাইশ হওয়ার কথা। কিন্তু বয়সে টিন হলেও জাতে ইস্পাত। মেয়েটা বোধহয় সামান্য মেন্টাল পেশেন্ট। কিন্তু বজ্জাতি বুদ্ধি মারাত্মক। জন্মের সময়ই মা'কে হারিয়েছে। মিঃ বাজাজের দ্বিতীয় স্ত্রী খুব একটা সুবিধের

ছিলেন না। সৎ মায়ের জ্বালায় ছোট মেয়েটার মানসিক দিকটা ভেঙে গিয়েছিল। মেয়েটা আবার ড্রাগ অ্যাডিক্টও ছিল। সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার কী জানো রাজা?...” পবিত্র একটু থেমে ফের বলল, “রিয়া বাজাজ কাজটা করেছিল ঠিকই, কিন্তু সবার মনে হয়েছিল এই বুদ্ধিটা অন্য কারোর মাথা থেকে বেরিয়েছে। মাস্টারমাইন্ড অন্য কেউ। কিন্তু মেয়েটা এমন ঠ্যাঁটা যে স্বীকারই করল না! ‘সব আমিই করেছি' বলে সেই যে বসে রইল, আর নিজের বয়ান থেকে নড়লই না।”

“এই খবরটা আমি জানি। বেশ কিছুদিন ধরে খবরের কাগজের হেডলাইন ছিল।” অধিরাজ নড়ে চড়ে বসে, “মিঃ উমঙ্গ অ্যান্ড্রু বাজাজের হিস্ট্রি সত্যিই ইন্টারেস্টিং। মিঃ বাজাজ নিজেও খুব রঙীন মেজাজের লোক ছিলেন। জামা-কাপড়ের মতো গার্লফ্রেন্ড পালটাতেন। তিনি শৈশবেই অনাথ। এক চার্চের ফাদারের কাছে থেকে পড়াশোনা করেছেন। কিন্তু ভদ্রলোক মারকাটারি হ্যান্ডসাম। যৌবনের প্রারম্ভেই এক হিন্দু কোটিপতির কুদর্শনা মেয়ে অহল্যাকে পটিয়ে-পাটিয়ে বিয়ে করেছিলেন। শ্বশুরের দাক্ষিণ্যেই তাঁর উন্নতি ঘটল। দাবাড়ু হিসেবে প্রতিষ্ঠাও পেলেন। কিন্তু লম্পট হলে যা হয় আর কী! স্ত্রী'র বদলে অন্য মেয়েদের সঙ্গেই বেশি থাকতেন। অনেক ঘাটের জল খেয়ে শেষ পর্যন্ত প্রথম স্ত্রী অহল্যা বেঁচে থাকতেই অন্য এক সুন্দরীকে এনে সটান ঘরে তুললেন। বৌয়ের ওপর শারীরিক অত্যাচারও করতেন। সেই নিয়ে বিস্তর হইচই হয়েছিল। অহল্যা বাজাজ রিয়ার জন্ম দিতে গিয়ে মারা যান। তাতে ভদ্রলোক একটুও দুঃখিত না হয়ে প্রেমিকাকেই বিয়ে করে বসলেন।”

“হ্যাঁ।” পবিত্র মুচকি হাসে, “তাতেও অবশ্য তিনি ক্ষান্ত হননি। আজ থেকে বছর তিনেক আগেই মিঃ বাজাজ হাওয়া হয়ে গেলেন। তাঁর ল্যাপটপ ঘেঁটে বোঝা গেল যে, তিনি এবার আরেক সুন্দরীর প্রেমে পড়ে দেশ ছাড়া হয়েছেন। কারণ তাঁর ইমেল অ্যাড্রেসে এক অজ্ঞাত সুন্দরীর প্রচুর প্রেমপত্র ছিল। এবং তিনি খালি হাতে হাওয়া হননি। সঙ্গে পাসপোর্ট, প্রচুর টাকা পয়সা, বহুমূল্য গয়নাগাঁটি ইত্যাদিও হাওয়া হয়েছিল। তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রায় নব্বই লক্ষ টাকা ছিল। সেটাও তুলে নেওয়া হয়েছে। পুলিস তাঁর মিসিং

কেস নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায়নি। লম্পট পাবলিকরা যদি থেকে থেকে প্রেম করে আর প্রেমিকাকে নিয়ে ভেগে গিয়ে পাটায়ার সি বিচে বসে হাওয়া খায়, তবে পুলিস কী করবে?"

—"কেন? পুলিসদের কি পাটায়া যেতে নেই? এনিওয়ে..." অধিরাজ একটু চিন্তা করে বলে, "রিয়া বাজাজকে যথেষ্টই ইন্টারেস্টিং বলে মনে হচ্ছে আমার। এত অপশন থাকতে বিদ্যেধরী নিজের বাপের আই.পি অ্যাড্রেস কপি করলেন কেন? বাপকে গণধোলাই খাওয়ানোর ইচ্ছে ছিল নাকি?"

-"পুলিসেরও তেমন কিছুই সন্দেহ হয়েছিল। বাবার ওপরে অবদমিত রাগ আর প্রতিশোধস্পৃহা থেকেই এরকম একটা কাজ করেছিল মেয়েটা।

কিন্তু মেয়েটা স্বীকারই করল না। বলল, আমার ইচ্ছে করেছে, তাই করেছি, ব্যস।" পবিত্র আপনমনেই বলে, "বড্ড শক্ত মেয়ে! একেবারে মুখে কুলুপ এঁটে বসেছিল। ইনভেস্টিগেটিং অফিসারের ওকে একটুও নর্মাল মনে হয়নি।"

"শেষপর্যন্ত কী হল?"

"শেষপর্যন্ত কিছুই হয়নি। মিঃ উমঙ্গ অ্যান্ড্রু বাজাজ রীতিমতো খ্যাতনামা দাবাড়ু ছিলেন। তাঁর অনুরোধে সেলিব্রিটিরা কেস তুলে নিলেন। রিয়া ছাড়া পেল। কিন্তু তারপর তার কী যে হল তা শ্যামলালও জানে না। মিঃ বাজাজ তাকে কোথায় পাচার করলেন কে জানে। তারপর তো তিনি নিজেও ফুড়ুৎ ! বাপ-মেয়ের কী হল, কেউ জানে না। মিঃ বাজাজের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী অবশ্য আছেন। তিনি সিঙ্গাপুরে আরেকজন ব্যবসায়ীকে বিয়ে করে সেটলড্। এ কেসের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই।"

অধিরাজ রিয়া বাজাজের ছবিটা দেখে নিল। ইনিও কৃষ্ণাঙ্গী। কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, মোটা নাক-ঠোঁট, উঁচু কপাল। তবে আলগা একটা চটক আছে। পুরো নাম রিয়া সামান্থা বাজাজ। সে সিগারেটের অবশিষ্টাংশ অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিতে দিতে বলল, "যাক, তবু তো কিছু পাওয়া গেল!"

– "পাওয়া আর গেল কই-!" পবিত্র ঠোঁট উলটে বলল, "এদের কাউকেই তো পাওয়া যাচ্ছে না। বললাম না, মিসিং!"

— "পাওয়া যাবে।" সে মৃদু হাসে, "অবশ্য বিদেশে রপ্তানি হলে পাওয়া যাবে না। কিন্তু আমার মনে হয় এদের মধ্যে অন্তত একজন এখন এখানেই আছেন। সর্বনাশিনীর প্রোফাইলটা কলকাতার আনসিকিওরড হটস্পট থেকেই যখন অনলাইন হচ্ছে, তখন শ্রীমতীও এখানেই আছেন! আর এখন আমাদের হাতে অন্তত সঠিক একটা ছবি আছে।"

পবিত্র ভুরু নাচাল, "এবার কি আমাকে এলভিসের গানটা শোনানো যাবে? অ্যান্ড আই লাভ ইউ সো, দ্যাট পিপল আস্ক মি হাউ...!" অধিরাজ উত্তরে কিছু বলার আগেই কেবিনের দরজা খুলে অর্ণব উঁকি মারল, "আসব স্যার?"

সে পবিত্র'র দিকে তাকিয়ে দুষ্টু হাসছে, "অর্ণব আমার ক্ষেত্রে খুব পজেসিভ। যখনই আমি কাউকে 'আই লাভ ইউ' বলতে যাই, তখনই ও চলে আসে। অতএব ঐ গান তোমায় শোনানো যাবে না।" বলতে বলতেই অর্ণবের দিকে তাকায়, "আসতে আজ্ঞা হোক।"

অফিসার পবিত্র আচার্য সকৌতুকে অর্ণবের দিকে তাকিয়ে বলল, "এ কী অর্ণব! কী শুনছি! রাজা নাকি তোমার ভয়ে কাউকে 'আই লাভ ইউ' বলতেই পারছে না!"

অর্ণব মহা ফাঁপরে পড়ে। দু'জনেই তার সিনিয়র। সুতরাং এই ফাজলামির উত্তর আর কী দেবে! তাছাড়া খাল কেটে কুমিরটা সে নিজেই এনেছে। অধিরাজ ব্যানার্জী কোন লেভেলের পাজি, সেটা জানা সত্ত্বেও লুজ কমেন্ট করে ফেলেছে। সুতরাং উপায় নেই। সে ফের কেবলুশের মতো দন্তকান্তি দেখিয়ে দিল।

"বলো কী সমাচার? হিস্ট্রিশিটাররা কেউ মুখ খুলল?" অর্ণব জানায়, "না স্যার। সব তোতারাম হয়ে বসে আছে। তোতাকে গুচ্ছ কাঁচালঙ্কাও খাওয়ালাম। কিন্তু তারপরও কিছু বলছে না।"

"কী বেইমান! কাঁচালঙ্কা খেয়েও তোতা মুখ খুলল না!" অধিরাজ দুঃখিত ভাব করে বলল, ক'কেজি খাওয়ালে?" -

"গুনিনি স্যার। কম করে মাথা পিছু এক কেজি তো হবেই!"

"তার সঙ্গে ড্রিঙ্কস হিসাবে কী দিয়েছ?"

"দিইনি স্যার। জল খেতে চাইছে। ঝালে মরে যাচ্ছে।" -

“ঝালে মরে যাচ্ছে, তবু মুখ খুলছে না! হুঁ! মানুষ ক্রমাগতই নেমকহারাম হয়ে যাচ্ছে।” সে কয়েকমুহূর্ত কী যেন ভাবল। পরক্ষণেই চূড়ান্ত বদমায়েশি মাখা একটা হাসি ভেসে ওঠে তার মুখে, “এক কাজ করো। এত ঝাল খেয়ে গলা জ্বলছে নিশ্চয়ই। একদম গরম দুধ খেতে দাও। গরম দুধ মানে ‘গরম দুধ!’ বুঝেছ?”

অর্ণব মৃদু হাসল। সে ইদানীং এসবে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে, “গট ইট।”

– “দুধে চিনিটা বেশি দিতে বলবে।” অধিরাজ ঠান্ডা, শান্ত স্বরে বলল, —“বাট নো ওয়াটার। জল দেবে না। দরকার পড়লে ওদের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজে ঢকঢক করে পেট ভরে জল খাবে। কিন্তু ওদের জল খেতে দেবে না।”

“ওকে স্যার।”

“ট্রাই করে দেখো। কিছুক্ষণের মধ্যে এস্পার-ওস্পার হয়ে যাবে আশা করি।” -

অর্ণব মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল। অধিরাজ আবার পবিত্র'র দিকে মনোনিবেশ করে, “পবিত্র, এই তিনজনের মধ্যে কোনও একজন এ কেসে যুক্ত থাকতেই পারে। কিন্তু আসল পাবলিক এরা নয়। যে সুন্দরী আমাদের নাজেহাল করে রেখেছেন, তিনি মোস্ট প্রব্যাব্লি ফর্সা।”

“কীভাবে বলছ? অন হোয়ার্ট বেসিস?”

“কালো হলে তিনি কালো মেয়ের ছবি দিতেনই না।” অধিরাজ আরেকটা সিগারেট ধরাবার উপক্রম করতে করতে বলল, “যেভাবে মিস লিড করছেন, তাতে এত সহজ একটা ক্লু আমাদের হাতে তুলে দেওয়ার পাত্রী তিনি নন। তবে কালোর সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক তো আছেই। শুধু কালোই নয়, নিগ্রোবটু চেহারা।”

পবিত্র একটু কনফিউজড, “মেয়েটি ফর্সা বলছ, আবার বলছ নিগ্রোবটু চেহারার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক আছে! একটু এক্সপ্লেইন করবে?”

-“অবচেতন মন বলে সাদা বাংলায় একটা কথা আছে জানো? অথবা ইংরেজিতে সাবকনশাস মাইন্ড নামক বস্তু?” সে নিজের সিগারেটটা ধরিয়ে প্যাকেটটা পবিত্র’র দিকে এগিয়ে দেয়, “জিনিসটা খুব গোলমেলে। তাকে যতই চেপে রাখার চেষ্টা করো, সে বেরিয়ে

আসতেই চাইবে। পারফেক্ট ক্রাইম বলে কিছু হয় না। সব ক্রাইমের মধ্যেই ক্রিমিন্যালের সাব-কনশাস মাইন্ড কিছু না কিছু ক্লু রাখবেই। আমাদের সর্বনাশিনীর কনশাস মাইন্ড তাঁকে কালো মেয়ের ছবি পোস্ট করতে বলে। অর্থাৎ, তিনি যা তার একদম উলটোটা। কিন্তু অবচেতন মনে হ্যালি বেরি, জ্যানেট জ্যাকসন, লুপিতা নঙিয়ো, মেগান গুড আসেন! কেন? কালোই তো দরকার। তবে কাজল, শিল্পা শেঠি, বিপাশা বসু বা সুস্মিতা সেন নয় কেন? ওঁরাও তো কালো। তবে? এখানেই খুনীর অবচেতন মনের কারিকুরি। সে চিৎকার করে বলতে চাইছে, 'নিগ্রোবটু চেহারা আমার প্রিয়।' সর্বনাশিনী নিজে অমন নয়। তবে, একটাই সম্ভাবনা। তার প্রিয়তম মানুষটি নিগ্রোবটু চেহারার। কোঁকড়ানো চুল, সাদা ঝকঝকে চোখ, মোটা নাকের মানুষ।"

"এটা তোমার ওয়াইল্ড গেস।" পবিত্র এই যুক্তিতে সন্তুষ্ট নয়, "আমার তো মনে হচ্ছে সর্বনাশিনী এই তিনজনের মধ্যে যে কেউ হতে পারে। অন্য কেউ নয়।" -

অধিরাজ অপূর্ব হাসি হাসল। তার চোখে কৌতুকের ঝিকিমিকি, "তাই? তোমার মনে হচ্ছে এই তিনজনের মধ্যে যে কেউ হতে পারে। কিন্তু যদি বলি, আমার মনে হচ্ছে সম্ভবত রিয়া বাজাজের সঙ্গেই এই খুনগুলোর সম্পর্ক আছে, তবে তুমি কী বলবে? যদি বলি, সোহিনী, শান্তিপ্রিয়ার থেকেও আমি রিয়ার ওপরেই বেশি জোর দিতে চাই, তবে?"

"কেন? রিয়াই কেন?"

"প্ৰথমতো, বাকি দু'জন কালো হলেও নিগ্রোবটু চেহারা নয়। একমাত্র রিয়া বাজাজের চেহারাই ওরকম।" -

পবিত্র কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অধিরাজের দিকে তাকিয়ে থাকে। ছেলেটার বয়েস কম। কিন্তু তার বুদ্ধির ধার কিছু কম নয়। নিশ্চয়ই সে কিছু আন্দাজ করেছে।

"দ্বিতীয়ত?"

- "রিয়া বাজাজের অতীত। মোডাস অপারেন্ডিটা বুঝতে এখনও হয়তো পারিনি। কিন্তু একটা প্রব্যাব্লি মোটিভকে বোধহয় আর নজর আন্দাজ করা যাচ্ছে না।" অধিরাজের দৃষ্টি আত্মমগ্ন। সামান্য বিষণ্নতাও লেগে আছে দৃষ্টিতে। সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "রিয়ার মা অহল্যা বাজাজ দেখতে ভালো ছিলেন না এটা সবাই জানে। কিন্তু 'ভালো

দেখতে নয়' বললে ঠিক কেমন দেখতে সেটা বোঝা যায় না। রিয়ার মধ্যে নিগ্রোবটু স্টাইল থাকলেও তাকে সুন্দরী বলা যায়। মিঃ উমঙ্গ অ্যান্ড্রু বাজাজ অত্যন্ত ফর্সা, সুদর্শন পুরুষ ছিলেন। সুতরাং রিয়ার চেহারা তার মায়ের মতো হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। অহল্যা বাজাজের একটা ছবি জোগাড় করো তো বস। জানা দরকার যে তাঁর চেহারা নিগ্রোবটু স্টাইলের ছিল কী না।" পবিত্র স্থিরদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকে, "তার মানে রিয়াই..?"

— "উহুউহু।" সে মাথা নাড়ছে, "সে বড়জোর বোড়ে। কিন্তু খুনীর যা বুদ্ধির ধার দেখছি, তাতে একটা ড্রাগ অ্যাডিক্টের মাথা থেকে এই বুদ্ধি বেরোনো সম্ভব নয়। বড়জোর এই পোস্টগুলো সে করেছে। মাস্টারমাইন্ড রিয়া নয়। এর পেছনে অন্য কেউ আছে। যে ফর্সা, অসম্ভব বুদ্ধিমতী এবং পুলিসের থেকে বুদ্ধিতে অনেক বেশি এগিয়ে রয়েছে, ঠান্ডা মাথার লোক, বাংলা সাহিত্যপ্রেমী। সে আর যেই হোক রিয়া নয়!"

– "তুমি তো শ্রী শ্রী জ্যোতিষার্ণবের মতো বুলি আউড়ে যাচ্ছ দেখছি।" পবিত্র চোখ কপালে তুলে ফেলেছে, "কী করে এত জোর দিয়ে বলছ! ফর্সা, বুদ্ধিমতী বুঝলাম। কিন্তু সাহিত্যপ্রেমী! কোনও লজিকই নেই...।"

"লজিক ভীষণভাবেই আছে।" অধিরাজ মুচকি হাসল – "শুধু তুমি সেটা বুঝতে পারছ না। খুনীর অবচেতন মন সম্পর্কে বলছিলাম না? সাবকনশাস মাইন্ড সবসময়েই খুনীর চরিত্র বলে দেয়। তুমি তো বাঙালির বাচ্চা। বাংলা বই টই পড়তে খুব ভালোবাসো। সাহিত্যে রুচি আছে । তুমিই বলো, এই কেসটার আগে 'সর্বনাশিনী' শব্দটা কতবার শুনেছ?"

সে একটু ভেবে উত্তর দিল, "সর্বনাশী, সর্বনেশে শুনেছি। বাট, আই মাস্ট অ্যাডমিট, সর্বনাশিনী শুনিনি।"

- "তাহলে দেখো! শব্দটা হিব্রু নয়, ফরাসী নয়, ইজিপ্সিয়ান এমনকী জুলুও নয়, খাঁটি বাংলা শব্দ। কিন্তু শব্দটা একটু পুরনো ধাঁচের। অর্থাৎ পুরনো বাংলায় বেশি ব্যবহৃত হওয়া শব্দ। তুমিও এই শব্দটা শোনোনি। স্বাভাবিক। কারণ আধুনিক বাংলা সাহিত্যে সর্বনাশী, সর্বনেশে, সর্বনাশা শব্দগুলোই বেশি ইউজ হয়। 'সর্বনাশিনী'র দেখা বেশিরভাগই বঙ্কিমচন্দ্র শরৎচন্দ্রের লেখায় বা রবীন্দ্র সাহিত্যে পাওয়া যায়। যেমন ফর এগজাম্পল, " 'মুসলমানীর

গল্পে' আছে – 'সর্বনাশিনী, বেজাতের ঘর থেকে ফিরে এসেছিস, আবার তোর লজ্জা নেই!' অল্পবয়েসেই হ্যাকিঙ এক্সপার্ট, সামান্য অ্যাবনর্মাল, ড্রাগ অ্যাডিক্ট, হাইটেক বেব রিয়া বাজাজ শরৎ-বঙ্কিম বা রবীন্দ্র রচনাবলী পড়ে বলে মনে হয়? আজকের প্রজন্ম হরর স্টোরি বা ইংরেজি থ্রিলার পড়তে অভ্যস্ত। হ্যাকাররাও কম্পিউটার টেকনোলজি, হ্যাকিং সম্পর্কিত পড়াশোনার বাইরে যদি কিছু পড়ে, তবে তা থ্রিলার। যদি প্রোফাইলটার নাম 'গার্ল উইথ দ্য ড্রাগন ট্যাটু', 'ব্লাডি মেরি', 'ভালাক', 'দ্য নান' হত, বা নিদেন পক্ষে 'কাউন্টেস ড্রাকুলা', তাও বুঝতাম। কিন্তু 'সর্বনাশিনী'! শব্দটাই অদ্ভুত নয়? কোনও সাধারণ মানুষ এই শব্দটা কখনও ব্যবহার করবে? তাও অ্যাজ এ ফেসবুক নেম?"

পবিত্র বুঝতে পারল যে যুক্তিটা যথেষ্ট জোরদার। রিয়া সামান্থা বাজাজের মতো মেয়ে শরৎ-বঙ্কিম বা রবীন্দ্র রচনাবলী পড়ছে, তা ভাবাই যায় না। সে গলা খাঁকারি দেয়, "বুঝলাম। কিন্তু সবাইকে ছেড়ে রিয়া বাজাজই কেন? শুধু মাত্র তার চেহারা নিগ্রোবটু ধরনের বলে!"

—"সেটাও একটা কারণ। দ্বিতীয় কারণ তার অতীত।" অধিরাজের চোখ দুটো ফের আত্মমগ্ন হয়ে যায়। সে আত্মমগ্নভাবে বলে, আমরা এতক্ষণ ধরে অনেক রকম অ্যাঙ্গেল ভেবে ফেলেছি। সুপারি মার্কেটে খুঁজেছি, নিহত মানুষদের পারিবারিক অ্যাঙ্গেল খুঁজছি, স্ত্রীদের অসন্তোষের দিকটা দেখেছি— কিন্তু একটা দিক ভাবিনি যেটা শুরুতেই ভাবা উচিত ছিল।"

"কী?"

- "কিডজ, সন্তান! একবার কথা প্রসঙ্গে অর্ণবকে বলেছিলাম, যে লোকগুলো খুন হচ্ছে, ভিকটিম তারা নয়, ভিকটিম আসলে তাদের সন্তানেরা। যখন জানবে যে তাদের বাবা, মাকে ছেড়ে অন্য মেয়ের কাছে যেত, তখন মনের অবস্থা কী দাঁড়াবে একবার ভাবো! এই অ্যাঙ্গেলটা তখনই ধরা উচিত ছিল। কিন্তু বিজয় জয়সওয়ালকে খোঁজার তাড়াহুড়োয় তখন ব্যাপারটা স্ট্রাইক করেনি।আজ রিয়া বাজাজের 'কেস হিস্ট্রিটা দেখে ঠিক সেই কথাটাই মনে হল!"

—"কী হেঁয়ালি করছ!"

— "হেঁয়ালি নয়, মনস্তত্ত্ব।" অধিরাজ সজোরে নাক টানল, "রিয়া বাজাজের কেসটাই ধরো। বেচারি জন্মমুহূর্তেই মাকে হারিয়েছে। বিমাতা নিশ্চয়ই তাকে আদর করে বুকে টেনে নেননি। যদি নিতেন তবে সে অমন বিপথে যেত না। ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে ড্রাগ ধরত না। বাবার যা চরিত্র সে আর বলার নয়। জ্ঞান হওয়ার পরে নিজের মায়ের ছবি নিশ্চয়ই দেখেছে। মনে মনে ভেবেছে, এই আমার মা! বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাবার উশৃঙ্খলতা যত দেখেছে ততই না দেখা মায়ের প্রতি তার ভালোবাসা, সমবেদনা বেড়েছে। জানতে পেরেছে তার জন্মদাত্রীকে কী প্রচণ্ড উপেক্ষা করে লোকটা তাঁর উপস্থিতিতেই অন্য একজন সুন্দরী মহিলাকে ঘরে এনে তুলেছিল! তার মায়ের নারীত্বের কী ভয়ঙ্কর অপমান করেছিল সে! একটা অযত্নলালিত, অবহেলিত নিষ্পাপ মন বিষিয়ে যাওয়ার পক্ষে এইটুকুই যথেষ্ট। তার লম্পট বাবার ওপর এই প্রচণ্ড ঘৃণা, প্রচণ্ড রাগ থেকেই সে ওরকম একটা পদক্ষেপ নিয়েছিল। রিয়া নিজের বাবাকে আইনের হাত দিয়েই শাস্তি দিতে চেয়েছিল। তার আসল লক্ষ্য সেলিব্রিটিরা ছিলেন না, ছিলেন মিঃ উমঙ্গ অ্যান্ড্রু বাজাজ।"

- "কিন্তু তাই বলে শহরের সমস্ত লম্পটকে মারতে শুরু করবে? এরকম সমাজসেবা করার মানেটা কী?"

- "আমি কখনই বলিনি যে রিয়া বাজাজ লোকগুলোকে ধরে ধরে মারছে। আমি বলছি প্রব্যাব্লি...।" অধিরাজ সজোরে একবার হেঁচে নিয়ে রুমাল বের করতে করতে বলল, "সরি... বোধহয় ঠান্ডা লেগেছে!"

"ইটস ওকে।" পবিত্রর কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ। সে প্রসঙ্গে ফিরে আসে, "রিয়া যদি না করে থাকে, তবে কে?" -

"রিয়া অপরাধ করেছিল ঠিকই। কিন্তু খুন করেনি। সে সাইবার ক্রাইম করতে পারে। কিন্তু খুন করার হলে তখনই করত। কিন্তু তার দৃষ্টিভঙ্গিটা দেখো। সে অপরাধ করলেও লম্পট বাবাকে আইনি শাস্তিই দিতে চেয়েছিলো। ঠান্ডা মাথায় রীতিমতো অংক কষে খুন করাটা তার মেন্টালিটিতে খাপ খাচ্ছে না।" অধিরাজ রুমালে নাক মুছতে মুছতে বলল "সে হ্যাকার হিসাবে জিনিয়াস হতে পারে তবে এরকম প্রায় পারফেক্ট ক্রাইম করতে পারবে বলে

মনে হয় না লক্ষ্য করে দেখো, খুনি যেভাবে কাজ করেছে, তাতে স্পষ্ট পুলিশের তদন্ত পদ্ধতি সে খুব ভালোভাবেই জানে। পুলিশ কোন রাস্তায় যেতে পারে, সেগুলো সে আগে থেকেই জেনে বসে আছে। পুলিশের ইনভেস্টিগেশনের স্টাইল জানে বলেই রীতিমতো অঙ্ক কষেই চালগুলো দিচ্ছে।সাইবার সেল যে সর্বনাশিনীর প্রোফাইলের পেছনে দৌড়বে, ট্রাফিকের সিসিটিভি ফুটেজ দেখবে, ফরেনসিক প্রমাণের জন্য উঠে পড়ে খুঁজবে সবটাই ভালোভাবে জানে তাই একটাও লুজ বল খেলে নি।"

"আমাদের ডিপার্টমেন্টের কেউ?"

"হওয়া অসম্ভব নয়। আমি কোন সম্ভাবনাকেই বাদ দিচ্ছি না।" তার কপালে চিন্তার ভাঁজ। "তবে পুলিশই ইনভেস্টিগেশন জানার জন্য ডিপার্টমেন্টের কেউ হওয়ার দরকার নেই। আজকাল টিভিতে যে পরিমাণ ক্রাইম শো দেখানো হয়, ক্রাইম পেট্রোল, সাবধান ইন্ডিয়া, পুলিশ ফাইলস এটসেট্রা, সেগুলো রেগুলার ফলো করলেই পুলিশের প্রসিডিওর জানতে বাকি থাকে না। আমার ধারণা, হয় তিনি ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে যুক্ত, নয় ক্রাইম নিউজ, ক্রাইম শো-টিভি সিরিজ গুলো খুব খুঁটিয়ে দেখেন। সেগুলোর কল্যানে ঘুঘু হয়ে বসে আছেন।"

"কিন্তু আমার প্রশ্নটা যেখানে ছিল সেখানেই থেকে গেল যে রিয়া যদি না হয় তবে খুনগুলো কে করছে?"

"রিয়ার চেয়েও যার মিঃ উমঙ্গ বাজাজের ওপর রাগ বেশি থাকা উচিত। নিগ্রোবটু চেহারার রিয়া অহল্যা যার প্রিয়তম মানুষ। মিঃ বাজাজের অহল্যার ওপরে অত্যাচারের ইতিহাসটা যে রিয়ার থেকেও বেশি জানে, যে নিজের চোখে অহল্যাকে প্রতিনিয়ত অপমানিত হতে দেখেছে। রিয়া যেটা দেখেনি তা সে দেখেছে। রিয়া নিজের মাকে দেখেনি। তার স্নেহ পায়নি তা সত্ত্বেও সে নিজের বাপকে আরেকটু হলেই জেলের ভাত খাওয়াচ্ছিল। তবে একবার তার কথা ভাবো, যে অহল্যার স্নেহ, মমতা, দুঃখ,, কান্না দেখেছে। স্বাভাবিকভাবেই তার প্রতিশোধ স্পৃহা আরও অনেক বেশি।"

"সেটা কে?"

অভিরাজ রহস্যময় হাসলো। "প্রিয়ার কথা বলতে গিয়ে তুমি একটা কথা বলেছিলে, ওর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছিলে বাজাজের ছোট কন্যে। ছোট কন্যে, ছোট সন্তান নয়। এখন প্রশ্ন হল রিয়া যদি ছোট কন্যা হয়, তবে প্রশ্ন হল বড় কন্যেটি কে? কি করেন তিনি এখন, কোথায় আছেন? তার কথা তো বললে না?"

"প্রিয়া বাজাজ সে তো ....! দাঁড়াও দাঁড়াও।" পবিত্র থমকে গিয়েছে। তার চোখ বিস্তারিত "তার মানে . . . "

"মানে কিছুই নয় অপরাধী যেমন পুলিশের সমস্ত রুটিন এনকোয়ারি ইনভেস্টিগেশন এর বাইরে গিয়ে খেলছে, আমিও তেমনি পুরো আউট অফ বক্স খেলছি। পুরোটাই এখনো থিওরি। যুক্তিযুক্ত অনুমানমাত্র ।" অধিরাজের মুখ গম্ভীর "এই প্রিয়া বাজাজের গল্প কিছু জানো? সেটা তো বলোনি। কারণ এলডার মিস বাজাজ সিনেই ছিলেন না। মিঃ বাজাজ জানিয়েছিলেন যে প্রিয়া অল্প বয়সেই নাকি কোন হতভাগা অপগণ্ডকে বিয়ে করবে বলে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিল।"

"প্রিয়া, রিয়ার থেকে কত বড়?"

"দশ বছরের বড়।"

"দশ বছর" অধিরাজের চোখে কেমন যেন বিষন্নতা। সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে "অভিশপ্ত শৈশব। রিয়ার থেকেও এর কপাল খারাপ। বাবার লম্পট্য, মায়ের হতাশা, অপমান, মৃত্যু বোঝার জন্য ১০ বছর বয়স যথেষ্ট। সে বুঝেছিল এবং গুনে গুনে বদলা নেওয়ার সম্ভাবনাটাও ফেলে দেওয়া যাচ্ছে না।"

"কিন্তু সঞ্জীব রায়চৌধুরী, অর্জুন শিকদার কেন? বাপের উপর রাগ যখন, বাপকেই মারলে পারে।"

"বাপকেই তো মারছে বারবার তাকেই তো খুন করে যাচ্ছে সে। শুধু তার দৃষ্টিকোণটা বুঝতে পারছি না আমরা।" তার কণ্ঠে একটু যেন ব্যথার আভাস। "বাবাকে এত ঘৃণা করে যে, যার মধ্যেই বাবার গুন গুলো দেখছে তাকেই খুন করছে। যেসব বেইমান পুরুষেরা নিজের স্ত্রী সন্তানকে ভাসিয়ে দিয়ে তার কাছে চলে যাচ্ছে তাদের মধ্যে নিজের বাপকেই দেখছে ও। নিজের নাম সর্বনাশিনী রেখেছে ঠিকই তবে হতভাগিনী নামটাও সঠিক হতো

বোধ হয়।” তার চোখে যেন দুনিয়ার রহস্য এসে জমেছে। “আমি খুব আশ্চর্য হব না, যদি কিছুদিন পরেই সর্বনাশীনির আর.আই.পি. পোস্টে উমঙ্গ বাজাজের ডেথ ফোরকাস্ট হয়। কিন্তু সেটা তো পরের কথা, আপাতত বিজয় জয়সওয়াল”।

“কিন্তু বিজয় জাসওয়াল তো সুস্থই আছেন।” পবিত্র অবাক “তাকে নিয়ে ভাবার কি আছে”

অধিরাজ যেন একটা ঘরের মধ্যে চলে যাচ্ছিল তার মনের মধ্যে অদ্ভুত এক আশঙ্কার মেঘ ঘনীভূত হচ্ছে। এমন হওয়ার তো কথা নয় যতটুকু খুনির মনকে পড়ে উঠতে পেরেছে তাতে এরকম ফাজলামি সে করবে না। কথা দিয়ে কথার খেলাপ করার লোক সে নয়। তার বারবার মনে পড়ে যাচ্ছে কৃষ্ণাঙ্গী রিপোর্টারের প্রশ্নটা- “পোস্টটা কি তবে প্রাঙ্ক ছিল”

অধিরাজের ভুরুতে ভাঁজ পড়ল। সর্বনাশিনীকে যতটুকু চিনেছে তাতে বিজয় জয়েসওয়ালের বাঁচার কথাই নয়। কিন্তু বিজয় জয়েসওয়াল দিব্যি বেঁচে-বর্তে আছন। ডাক্তাররা আজই ফাইনালি জানিয়েছেন যে কোন রকম বিষ তার দেহে নেই। তবু আরো কিছুদিন তাকে পর্যবেক্ষণে রাখতে চাইছেন ওরা। তাছাড়া সঞ্জীব রায় চৌধুরী আর অর্জুন শিকদারের প্রোফাইলের সঙ্গে ঠিক বিজয়ের প্রোফাইল মিলছে না। বিজয় লম্পট নন্। স্ত্রীয়ের সঙ্গে অসন্তোষ থাকলেও সেটার কারণ সম্পূর্ণ আলাদা। অন্য দু'জনের স্ত্রী কালো এবং অসুন্দর ছিলেন। কিন্তু মানসী জয়সওয়াল ডানাকাটা পরী! সুন্দরী ও সুতনুকা। মহিলার বয়েস প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি হওয়া উচিত। অথচ দেখলে ত্রিশ-বত্রিশের বেশি মনে হয় না! অন্য দু'জনের সন্তানও ছিল। বিজয় জয়সওয়াল নিঃসন্তান!

এতখানি পার্থক্য! দু’জন ভিকটিমের সঙ্গে বিজয়ের কোনও মিলই নেই! সর্বনাশিনী শিকার নির্বাচনে এত বড় ভুল কী কোরে করে বসল! সে তো এতবড় ভুল করার লোক নয়! নিজে ভুল করেছে, না অন্যদের ভুল করাতে চায়...!

অধিরাজ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো কেঁপে উঠল। একটা হাড় হিম করা ভয় তাকে স্পর্শ করেছে। সে ফিসফিস করে বলল, “কলকাতায় বিজয় জয়সওয়াল নামের শুধু একটা লোক নেই পবিত্র! এই বিজয় জয়সওয়াল যদি বেঁচে থাকেন তবে...।”

— "তবে...।" রুদ্ধশ্বাসে বলল অফিসার পবিত্র আচার্য।

—"অন্য কোনও বিজয় জয়সওয়াল মারা যাবেন!" অধিরাজ প্রায় লাফিয়ে ওঠে, "পবিত্র...! শহরে কতজন বিজয় জয়সওয়াল আছেন? ফাইন্ড আউট ইমিডিয়েটলি। তাঁরা ঠিকঠাক আছেন? আর.আই.পি পোস্টটা পড়েছে বাহাত্তর ঘণ্টার বেশি হয়ে গিয়েছে। বেশি সময় নেই।" ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠল পবিত্র। আর একটিও কথা না বলে দৌড়ে বেরিয়ে গেল।

(দশ)

মেয়েটা অতিকষ্টে একটা বস্তাকে টেনে নিয়ে চলেছিল। তার গায়ে এত শক্তি নেই যে অত বড় একটা বস্তাকে ঘাড়ে করে টেনে নিয়ে যাবে। শুধু বড় নয়, বড্ড ভারীও বটে। সে সর্বশক্তি দিয়ে বস্তাটাকে টেনে নেওয়ার চেষ্টা করছিল, কিন্তু বারবার হাত ফস্কে যাচ্ছে। কোমর টনটন করছে, বুক ধড়ফড়। হাত দুটোর পেশী ব্যথা করছে। তবু হাল ছাড়ছে না।

"ওঃ!"

তার নাকে একটা দুর্গন্ধ এসে ঝাপ্টা মারল! যেন ইঁদুর পচা গন্ধ। মেয়েটা একটু থমকে দাঁড়ায়। দুর্গন্ধের চোটে গা গুলিয়ে উঠেছে। ওয়াক তুলতে গিয়েও থেমে গেল। সন্তর্পণে চারদিকটা তাকিয়ে দেখছে। কেউ আছে? কেউ নেই তো? তার মিশমিশে কালো রঙ এখন অন্ধকারের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। কোঁকড়া চুলগুলো যেন শান্ত অন্ধকারের সমুদ্রে ছোট ছোট তরঙ্গ। এখন কেউ এসে পড়লেও এত অন্ধকারে তাকে চট করে দেখতে পাবে না। কালো হওয়ার এই একটাই সুবিধা। কিন্তু বস্তাটা...? গোটা পৃথিবীতে এখন অখণ্ড নীরবতা। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। শুধু তার চোখেই ঘুম নেই। বেশ কিছুদিন ধরেই ঘুমোতে পারেনি। যতবারই চোখ খুঁজেছে, ঠিক ততবারই চোখের সামনে ভেসে উঠেছে মিঃ বাজাজের ছুরি বিদ্ধ লাশটা! লোকটা মরেছে ঠিকই, কিন্তু তাতেও শান্তি নেই। বিছানায় শুয়েও স্থির থাকতে পারছিল না মেয়েটা। বারবার মনে পড়ছিল, পাশের ঘরে মিঃ বাজাজের লাশটা পড়ে রয়েছে! সেই সাপের মতো ঠান্ডা, ফ্যাকাশে সাদা মুখ, বাদামী চোখের মালিক এখনও তার কাছেই আছে! মৃত্যু হলেও এখনও মিঃ বাজাজ তার থেকে মাত্র একটা দরজার তফাতে! সে কথা মনে পড়তেই কেঁপে উঠল মেয়েটি। এখন তো প্রায়ই শুনতে পায় ও ঘরে নানারকম শব্দ হচ্ছে। কখনও মনে হয় কেউ যেন দাবা খেলছে! গম্ভীর অথচ ভীষণ ঠান্ডা স্বরে ঐ বুঝি কেউ বলে উঠল, "চেক অ্যান্ড মেট।" ঘুটির নড়াচড়ার আওয়াজ বেশ কয়েকবার শুনেছে। শুনেছে একটা পরিচিত খসখস শব্দ। যেন জুতো পরে একটানা পায়চারি করে চলেছে কেউ। দরজা বন্ধ থাকলেও স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিল, দরজার পেছনে একটা দীর্ঘকায় ছায়ামূর্তি অস্থিরভাবে হলঘরের এপ্রান্ত থেকে

ওপ্রান্ত হেঁটে বেড়াচ্ছে। আতঙ্কে একটা কথাও বলতে পারেনি সে। ঘুমের ঘোরেই নানারকমের অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দ শুনতে পেয়ে শিউরে উঠেছে। দুঃস্বপ্ন দেখে ধড়মড় করে উঠে বসেছে। সারা রাত আর ঘুম হয়নি। কেঁদে উঠলে যদি সবাই জেনে যায়! তাই ভয়ের চোটে মুখ চেপে ফুঁপিয়ে গিয়েছে একটানা। অ্যালিস সবই জানে। কিন্তু মাউ! তাঁকে কী বলবে সে? মাউ তাকে খুব ভালোবাসে। মাউ যদি জানতে পারে সে মিঃ বাজাজকে খুন করেছে, তবে তাকে ঘৃণা করবে। ছেড়ে চলে যাবে। যেমন মা ছেড়ে গিয়েছিল, তেমন মাউও...!

একটা শীতল হাওয়া মৃত মানুষের হাতের মতো ছুঁয়ে গেল তাকে। একটা শীতল নিঃশ্বাস যেন ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিল তার ঝামর চুল। মেয়েটা ভয়ে কেঁপে ওঠে। তার বুকের ভেতরে হৃৎপিণ্ডটা যেন চারগুণ জোরে চলতে শুরু করেছে। একরাশ হাওয়া তার কান ছুঁয়ে ফিসফিস করে বলে গেল, “ই ফোর টু ডি ফোর!” -

মেয়েটির মুখ থেকে একটা আর্ত চিৎকার প্রায় বেরিয়েই আসছিল। কিন্তু শেষমুহূর্তে নিজেই নিজের মুখে হাত চাপা দিয়ে ফেলেছে। একটা ভয়, ভীষণ কান্না ভূমিকম্পের মতো তার সারা শরীর জুড়ে আন্দোলন তুলেছে। কে বলল? কে বলল শব্দগুলো? এই কথাগুলো কি কখনও তার পেছন ছাড়বে না? এই অভিশাপ কি সারাজীবন ধরে বয়ে বেড়াতে হবে?

কান্নাভেজা গলায় উত্তর দিল সে, “ই সেভেন টু ই ফাইভ!”

কিছুক্ষণের জন্য কোনও উত্তর নেই। হাওয়া নিরুত্তর হয়ে হু হু করে বয়ে যাচ্ছে। যেন রেগে গিয়ে কিছু বলতে চাইছে! মেয়েটির কপাল বেয়ে ঘামের ফোঁটা আস্তে আস্তে গড়িয়ে পড়ে। ভয়ার্ত চোখ দুটো পরম সন্দেহে এদিক ওদিক দেখে নিল। কোথায় একটা জুতোর হিলের খটখট শব্দ হল না? কোথায়? অন্ধকারে কিছুই তো দেখা যাচ্ছে না। ওদিকে পচা গন্ধটা প্রবল হয়ে উঠছে! গন্ধেই বুঝি সবাইকে জানিয়ে দেবে, “আমি এখানে আছি। এই বস্তার মধ্যে। এই অন্ধকারে।”

তার কোমল মুখ শক্ত হয়ে ওঠে। নাঃ, ভয় পেলে চলবে না। এগোতে হবে। অসহ্য লাগছে এই দুর্গন্ধটা। তার হাতের পাতা ঘর্মাক্ত হয়ে উঠেছে। `ঠিক মতো বস্তাটাকে ধরা

যাচ্ছে না। তা সত্ত্বেও কোনোমতে আঁকড়ে ধরে প্রাণপণে টানতে লাগল সে। এত সহজে ছেড়ে দেবে না। অ্যালিস বলে, কিছুতেই হাল ছাড়লে চলবে না। ভয়ের সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়াতে হবে। এখন ও অন্ধকারকে ভয় পাচ্ছে, তার চেয়েও বেশি ভয় পাচ্ছে এই বস্তাটাকে। তবু বাজি জিততে হলে ভয়কে মাত দিতে হবে। সে দাঁতে দাঁত পিষল। এগোতে গিয়ে বারবার হোঁচট খাচ্ছে। তবু এগোচ্ছে!

এখন চতুর্দিকে কোনও শব্দ নেই। শুধু বস্তাটা ঘষা খেতে খেতে একটা প্রতিবাদী স্বর তুলছে, 'ঘস...ঘস...ঘস!' বাইরে রাতের প্রেক্ষাপটে নীলাভ ধোঁয়াশার স্তর আস্তে আস্তে গোটা দৃশ্যপটকে আপাত অদৃশ্য একটা চাদরে ঢেকে দিচ্ছে। আজকাল মধ্যরাতের পরেই হিম পড়তে শুরু করে। আজও স্থিত নৈঃশব্দের মধ্যে তার 'টুপ টাপ' শোনা যায়। আকাশটা আজ ছায়া ছায়া। জ্যোৎস্নায় ঔজ্জ্বল্য নেই! মরা জ্যোৎস্না বিষাদ-বিধুর আলো ছড়িয়ে হয়তো বা কোনও ট্র্যাজেডির আভাস দেয়। একফালি চাঁদ বাঁকা রহস্যময় হাসি হাসছে। দূরে কোথাও একটা একলা কুকুর কেঁদে উঠল...! "কিংস বিশপ টু সি ফোর!"

এবার আর মৃদু নয়! একদম স্পষ্ট ও জোরালো আওয়াজ ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল তার চতুর্দিকে। মেয়েটা চমকে ওঠে। একমুহূর্তের জন্য ফ্যাকাশে হয়ে গেল তার মুখ। জোরে জোরে নিঃশ্বাস নেওয়ার ফলে ঠোঁটের পাটা ফুলে ফুলে উঠছে। গলা দিয়ে আওয়াজ প্রায় বেরোচ্ছে না। তবু কোনওমতে কান্নারুদ্ধ কণ্ঠে বলল, "কুইনস নাইট টু সি সিক্স!" এক মুহূর্তের নিস্তব্ধতা। পরক্ষণেই আবার... "কুইন টু এইচ ফাইভ।"

— "চো...ও...প!"

এবার যেন আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ ঘটল। জ্বলন্ত লাভা উদ্‌গিরণের মতো একরাশ জ্বালাময়ী ক্ষোভ উগরে দিল মেয়েটা। পাগলের মতো চিৎকার করে উঠেছে সে, "তুমি এফ সেভেনে ক্যাপচার পয়েন্ট বানিয়ে রেখেছ। কী ভাবো? আমি কিছু বুঝি না? দুনিয়ার সব কিছু একা তুমিই বোঝো! চেস, টর্চার, ট্রমা, ঘেন্না, রাগ, খুন, সব তুমি একাই পারো? না, আমিও পারি। রাজাকে এবার রানি মাত দিয়েছে। এবার চুপ করে থাকার পালা তোমার! চুপ—একদম চুপ মিঃ বাজাজ! কি-প সা-ই-লে-ন্স!"

– "কে? কে কথা বলছে রে?" -

মেয়েটা একটু বেশি জোরেই কথাগুলো বলে ফেলেছে! ফলস্বরূপ তার এই উন্মত্ত চিৎকার কারোর কানে গিয়েছে। সে শুনতে পেল একটা জোরালো বুটের এদিকেই ছুটে আসার শব্দ! সে কী করবে বুঝে ওঠার আগেই আচমকা বস্তার মধ্য থেকে ভেসে এল একটা হাসির আওয়াজ! সে হাসি আস্তে আস্তে রূপান্তরিত হচ্ছে অট্টহাস্যে। মনে হল, সারা দুনিয়া কাঁপিয়ে কেউ হাসছে। সারা আকাশ, সারা পৃথিবী, গোটা মস্তিষ্কে সেই উন্মত্ত খলখল হাসি অনুরণন তুলতে তুলতে ফাটিয়ে দিচ্ছে তার দেহের সব ক'টা কোষ। সব স্নায়ুতন্ত্রীকে ছিঁড়ে ফদাফাই করে দিচ্ছে সেই ক্রূর, হিংস্র হাসি! সে হাসি মানুষের নয়, হতে পারে না!

কিংকর্তব্যবিমূঢ় মেয়েটা স্তম্ভিত হয়ে কয়েক মুহূর্ত ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকে। আর কিছু বোঝার আগেই চোখের সামনে এক ঝলক তীব্র আলো! অন্ধকার ফুঁড়ে এসে দাঁড়াল একটা অবয়ব।

"কে?"

মেয়েটা বস্তাটাকে ওখানেই ছেড়ে দিয়ে প্রাণপণে দৌড় লাগাল নিজের ফ্ল্যাটের দিকে। সে এমনভাবে দৌড়চ্ছে যেন তার পেছনে ধাওয়া করেছে কোনও ভয়াল মাংসাশী প্রাণী! তার কানের মধ্যে তখনও বাজছে সেই ব্যঙ্গকুটিল হাসি...।

হাসতে হাসতেই কণ্ঠস্বরটা বলল, "চেক মেট!"

(এগারো)

আহেলি মুখার্জী খুব মন দিয়ে বিজয় জয়সওয়ালের জামা কাপড় পরীক্ষা করছিল। কিন্তু যে পরিস্থিতিতে সে কিছু একটা ক্লু বের করার চেষ্টা করছে, সে পরিস্থিতিতে আর যাই হোক, কোনও কাজ করা যায় না!

কারণ সেই এক ও অদ্বিতীয় ডঃ অসীম চ্যাটার্জী। আহেলির ঠিক নাকের সামনে বসেই বোতাম মার্কা চোখ কটমটিয়ে তাকিয়েছিলেন। কোনওরকম টু শব্দটি না করে গুল্লু গুল্লু চোখে তার কাণ্ডকারখানা দেখছেন। আর আহেলি ঘেমে নেয়ে একসা হচ্ছে। এরকম 'স্রেফ জ্বালিয়ে দেব' মার্কা চোখের সামনে দাঁড়িয়ে শান্তিতে কাজ করা যায়? আহেলির মনে হচ্ছিল, সে বেচারি এক নিরীহ, শান্ত ছাগলছানা! দু' মুঠো ঘাস খেতে চাইছে, কিন্তু নাকের সামনে থাবা গেড়ে বসে আছে এক বিরাট কেঁদো বাঘ! আক্রমণ করছে না, গাঁক করে হাঁক দিচ্ছে না, থাবাও মারছে না, তবু ঐ চোখের দৃষ্টিতেই তার হার্টফেল হওয়ার উপক্রম!

ওদিকে ডঃ চ্যাটার্জী উশখুশ করতে শুরু করেছেন। তাঁর ধৈর্য আর উদোর বয়েসের কেস প্রায় একই। কখনই বাড়ে না, সবসময়ই কমতির দিকে। প্রথমে হাইড্রোক্লোরিকের বোতল থেকে খানিকটা জল ঢকঢক করে খেলেন। তারপর এক কাপ চা'কে ঠান্ডা করে রীতিমতো কোল্ডড্রিঙ্কস বানিয়ে ফেললেন। শেষপর্যন্ত যখন একটা সিগারেটকে দু টুকরো করে ধূমপান পর্বও সমাপ্ত হল তখন আর থাকতে পারলেন না। রেগেমেগে বলেই ফেললেন, "তুমি কি প্রতিটা সুতো আলাদা করে ইতিহাস বের করতে চাও? এখানে ফিঙ্গারপ্রিন্ট খোঁজা হচ্ছে, হরপ্পা-মহেঞ্জোদড়োর ধ্বংসস্তূপ নয়।"

আহেলি থতমত খেয়ে বলল, "কিন্তু ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেই যে!"

– "নেই!" ডঃ চ্যাটার্জী হুমহুম করে ওঠেন, "তা সেটা বললেই তো ল্যাঠা চোকে। তারপরও কীসের ইনভেস্টিগেশন চালাচ্ছ! এখন কি আগে ফিঙ্গারপ্রিন্ট তৈরি করে, সেটাকে বসিয়ে রিপোর্ট দেওয়ার তাল করছ তুমি?"

"না, মানে...।" সে আমতা আমতা করে বলে... "তবু খোঁজার চেষ্টা করছিলাম। যদি কোথাও পাওয়া যায় আর কী!"

"কোথাও পাওয়া যাবে মানে?" এবার আক্ষরিক অর্থেই খেঁকিয়ে উঠলেন তিনি, "শার্টে যদি ফিঙ্গারপ্রিন্ট না থাকে তবে কি তুমি চাঁদে যাবে? সেখানে গিয়ে নীল আর্মস্ট্রং এর ফিঙ্গারপ্রিন্ট আনতে তোমায় কে বলেছে?"

আহেলি মাথা নীচু করে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর বুকে মাথা গুঁজে বলল, "ফ্রিঙ্গারপ্রিন্ট নেই স্যার। তবে কিছু এমন আছে যা হয়তো দরকারি।"

– "সেটা শোনার জন্য কি আমায় লম্বকর্ণের মতো কান হ্যা হ্যা করে নাড়াতে হবে?"

আহেলি মনে মনে দাঁত কিড়মিড় করে। লোকটা কি সবসময়ই করলা খেয়ে থাকে? একটা, দুটো মিষ্টি কথাও কি বলতে নেই! সবসময়ই এত মেজাজ করার কী আছে? যেমন মাথাটা ভোঁ ভাঁ, তেমনই কাঠের মতো স্বভাব। শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠতি অগ্রে ! সবমিলিয়ে মানুষ তো নয়, শুষ্ক পর্ণমোচী গাছ!

মনে মনে লোকটার চোদ্দ গুষ্টির তুষ্টি করতে করতে বলল সে, "মিঃ জয়সওয়ালের শার্টে একটা লালচে ছোপ পাওয়া গিয়েছে। ওর মধ্যে ফেরিক অক্সাইডের ট্রেস পেয়েছি স্যার। অর্থাৎ মরচে। মিঃ জয়সওয়াল যেখানে ছিলেন, তার আশেপাশে কোনও মরচে পড়া লোহা গোছের কিছু ছিল। সেটা সব কিছুই হতে পারে। এক টুকরো লোহা থেকে শুরু করে আস্ত লোহার ফার্নিচার, সব কিছু হওয়া সম্ভব। সেই জং ধরা লোহার সঙ্গে ঘষা খেয়ে ওঁর শার্টে এই লাল দাগটা এসেছে।"

"হুম। আর কিছু?"

- "হ্যাঁ।" আহেলি এবার মিঃ জয়সওয়ালের বুট দুটো ডঃ চ্যাটার্জীর নাকের সামনে তুলে ধরল, "এটা পাওয়া গিয়েছে।"

—"কী! জুতো!"

ব্যস! আর যায় কোথায়! দুর্বাসা রেগে লাল হয়ে নাচতে শুরু করে। ,—"এত সাহস তোমার! তুমি আমাকে জুতোবে বলছ!"

যাব্বাবা! কী কথার কী ইন্টারপ্রিটেশন! আহেলি সঙ্গে সঙ্গে জুতোজোড়া নামিয়ে রাখে। কোনোমতে প্রবীণ ফরেনসিক বিশেষজ্ঞকে ঠান্ডা করার চেষ্টা করছে। অথচ তিনি কিছুই শুনবেন না। বুড়োর এই প্রবলেম! কী বললে যে কী বুঝে বসে থাকে তার ঠিক নেই। সে

বলতে যাচ্ছিল যে জুতোতে কিছু পাওয়া গিয়েছে। অথচ সবজান্তা গেঞ্জিওয়ালা ভাবলেন আহেলি তাকে জুতো পেটা করতে চাইছে! কী বিপদ!

"বসকে জুতো দেখানো হচ্ছে! বেড়ে পাকা ছুঁড়ি! তোমার নামে কমপ্লেন করবো...।"

— "স্যা...র!.. দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছিল আহেলির। এবার সে অগ্রপশ্চাত বিবেচনা না করেই একধমকই দিয়ে বসল তাঁকে, "আগে পুরো কথাটা শুনবেন তো! তারপর যা খুশি করুন।"

ধমকটা দিয়ে ফেলেই জিভ কাটল আহেলি! এই রে! মাথা গরম করে সেও কথা শুনিয়ে দিয়েছে ডঃ চ্যাটার্জীকে। এইবার তো বুড়ো তার মুণ্ডু চিবোবে! আর বোধহয় রক্ষা নেই!

কিন্তু তেমন ভয়ঙ্কর কিছুই ঘটল না। ডঃ চ্যাটার্জী কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তিনি ভাবতেই পারছেন না যে চিরপরিচিত শান্ত, ঠান্ডা আহেলি এইমাত্রই তাঁকে রামধমক দিয়ে দিল! চিরদিন সবাইকে ধমকে ধামকে ঠান্ডা করে এসেছেন। এখন পালটা বকা খেয়ে অভিমানী ছোট বাচ্চাদের মতো কাঁদো কাঁদো মুখ করে মিনমিন করে বললেন, "আচ্ছা, শুনছি।"

আহেলি স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে। যাক, ধমক খেয়েও ডঃ চ্যাটার্জী কিছু মনে করেননি। সে বুড়োকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই তড়বড়িয়ে এক নিঃশ্বাসে বলতে থাকে, "মিঃ জয়সওয়ালের জুতোতে একটা পেইন্ট সামান্য লেগেছে। পেইন্টটার রঙ চেরি রেড। ঐ পেইন্টটায় একটা ইন-অর্গ্যানিক পিগমেন্টের অস্তিত্ব আছে। হোয়াইট টাইটানিয়াম ডাই-অক্সাইড! সঙ্গে ভিনাইল । সচরাচর এই জিনিসটা সাধারণ পেইন্টে থাকে না। হোয়াইট টাইটানিয়াম ডাই-অক্সাইড যে পেইন্টে থাকে সেটা ভিনাইল স্যাটিন ফিনিশ ইমালশন্ পেইন্ট হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।"

– "ভিনাইল স্যাটিন ফিনিশ ইমালশন্ পেইন্টটা কী?" ডঃ চ্যাটার্জী টাক চুলকোতে চুলকোতে বললেন, "স্যাটিন তো একজাতীয় কাপড়! রঙ কবে হল!"

-"স্যাটিন কাপড়ের মতোই মোলায়েম রঙ।" আহেলি ডঃ চ্যাটার্জীকে বুঝিয়ে বলে, "যতদূর জানি মোটামুটি দু' ধরণের পেইন্ট ইউজ হয়। একটা অয়েল বেসড, আরেকটা ইমালশন বেসড। ইমালশন বেসড পেইন্টেরও নানা ভ্যারাইটি আছে। সিল্ক ফিনিশ

পেইন্ট, স্যাটিন ফিনিশ পেইন্ট তার মধ্যে অন্যতম। দুটোই অত্যন্ত গ্লসি, চকচকে। স্যাটিন আর সিল্ক ফিনিশ পেইন্ট দেখতে ভীষণ সুন্দর হয়। খুব চকচকে, একদম ভেলভেটের মতো মসৃণ। ভিনাইল স্যাটিন বা ভিনাইল সিল্ক ফিনিশ ইমালশন পেইন্ট এতটাই ঝকঝকে যে দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।"

– "আপাতত কান আর প্রাণ জুড়ালো। তারপর ডক্টর স্যাটিন?" আহেলি খোঁচাটাকে পাত্তা দিল না, "এই দুটো পেইন্টের মধ্যে মূলতঃ ভিনাইল স্যাটিন উড বেসড জিনিসের ওপরে ইউজড হয়। কারণ সিল্কের চেয়েও স্যাটিন পেইন্ট অনেক বেশি হার্ডি। একবার পেইন্ট করালে অনেক দিনের জন্য নিশ্চিন্ত থাকা যায়। এর প্লেজ, সৌন্দর্য বছরের পর বছর টিকে থাকে। এমনকি নোংরা পড়লেও মুছে দিলেই ফের আগের মতোই ঝকঝক করে। দেওয়ালেও স্যাটিন পেইন্ট করা যায় ঠিকই। কিন্তু এই বিশেষ পেইন্টটা দেওয়ালে ইউজড হয়নি।"

"সেটা আবার কে বলল? লেখা আছে নাকি?"

– "কালারটা দেখুন স্যার। চেরি রেড! এই ধরণের অ্যাগ্রেসিভ কালার কেউ দেওয়ালে পেইন্ট হিসাবে ব্যবহার করবে না। দেওয়ালের রঙ যদি তেড়ে খেতে আসে, তবে ঘরের সৌন্দর্যই মাটি! তাছাড়া এই রং ব্রাইটনেস কমায়। স্যাটিন পেইন্ট অত্যন্ত দামি জিনিস। কেউ সেটার ভুলভাল শেড দেওয়ালে লাগিয়ে নিজের পয়সা, আর ঘরের বিউটি বরবাদ করবে কেন?" -

"তবে?" আহেলির মুখের ওপরে একগোছা চুল এসে পড়েছিল। সে আঙুল দিয়ে অলকগুচ্ছ সরাতে সরাতে বলল, "যেহেতু ভিনাইল স্যাটিন ফিনিশ ইমালশন পেইন্ট অত্যন্ত হার্ডি এবং বছরের পর বছর চলে, তাই মূলত কাঠের জিনিসের ওপরই এই পেইন্ট লাগানো হয়। আর রঙটা চেরি রেড হওয়ার দরুণ বলতে পারি এই পেইন্টটা হয়তো দরজা, জানলার ওপরে লাগানো হয়েছে। সবচেয়ে বেশি অত্যাচার দরজা-জানলার ওপরেই হয়। লোকে নিজের শখে কয়েক বছর অন্তর অন্তর ঘরের রঙ পালটাতে পারে। কিন্তু দরজা-জানলায় রেগুলার কেউ রঙ করায় না। তাই ভিনাইল সিল্ক ফিনিশ ঘরের দেওয়ালের জন্য, আর ভিনাইল স্যাটিন ফিনিশ দরজা-জানলার জন্য পার্ফেক্ট!" -

-“মিঃ জয়সওয়ালের জুতোয় এই পেইন্টটা আছে।” অসীম চ্যাটার্জী বিড়বিড় করেন, “তার মানে তিনি যেখানে ছিলেন সেখানে এই কালারটার কনটেনারও ছিল।” -

“ইয়েস স্যার।” আহেলি যোগ করল, “আর সেখানে জং ধরা লোহাও কোনওভাবে উপস্থিত ছিল।” - “জং ধরা লোহা, মানে কোনও লোহার ফার্নিচারও হতে পারে। একটা রঙের কনটেনার...। ডঃ চ্যাটার্জী যেন অঙ্ক মেলাচ্ছেন, “সিল্ড কনটেনার নিশ্চয়ই নয়। তাহলে পেইন্টটা বাইরে আসত না, ওঁর জুতোয় লাগত না। তার মানে পেইন্টটা ইউজড। মর্চে পড়া লোহার বাতিল ফার্নিচার, ইউজড পেইন্ট এ দুটোই বাড়ির একটা জায়গাতেই একসঙ্গে থাকতে পারে...!”

– “স্টোররুম স্যার।” আহেলির চোখ সাফল্যে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, “মিঃ ব্যানার্জীর থিওরি যে মিঃ বিজয় জয়সওয়াল মেরিলিন প্ল্যাটিনাম কমপ্লেক্সের মধ্যেই ছিলেন, বাইরে কোথাও যাননি। ওঁর আন্দাজ যদি সত্যি হয়, তবে ওঁদের শুধু হাউজিং কমপ্লেক্সের মধ্যে সেই নির্দিষ্ট ফ্ল্যাটটা খুঁজে বের করতে হবে যেটার দরজা জানলার রঙ চেরি রেড। সেই ফ্ল্যাটে যদি কোনও স্টোররুম থাকে, তবে হয়তো সেখানে কোনও ক্লু পাওয়া যাবে।”

“হুম।” ডঃ চ্যাটার্জী তার দিকে আড়চোখে তাকালেন, “ওকে। বুঝলাম। রাজাকে আমি বলে দেবো। নাউ... শুঃ...!” -

আহেলি মুখ ব্যাজার করে চলে গেল। তার চলার ভঙ্গিতেই অসন্তোষ প্রকট। ডঃ চ্যাটার্জী একদৃষ্টে ওর গমনপথের দিকে তাকিয়েছিলেন। সে তাঁর দৃষ্টিপথের বাইরে চলে যেতেই তাঁর প্রখরদৃষ্টি নরম হয়ে আসে। এবার ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ স্বভাববিরুদ্ধ ভাবে মৃদু হাসলেন! খুব নীচু স্বরে বললেন,

- “গুড জব গার্ল! ওয়েল ডান!”

(বারো)

অবশেষে আরেক বিজয় জয়সওয়ালকে পাওয়া গেল।

এমনিতেই বিজয় জয়সওয়াল নামের লোক কলকাতা শহরে হাজারে হাজারে থাকার কথা নয়। বরং মুম্বাই বা দিল্লী হলে খুঁজে বের করা কঠিন ছিল। কিন্তু কলকাতায় বিজয় জয়সওয়াল নামের আর মাত্র দুটি লোকেরই খোঁজ পাওয়া গেল । অধিরাজ নির্দেশ দিয়েছিল, টেলিফোন ডিরেক্টরির 'বি' আর 'ভি', দুটো অ্যালফাবেটের পেজই যেন ভালো ভাবে দেখা হয়। অর্থাৎ 'বিজয়' ও 'ভিজয়' দুটোই দেখতে হবে। শঙ্কা ছিল যে টেলিফোন ডিরেক্টরিতে হয়তো সব বিজয় জয়সওয়ালের ঠিকানা নাও থাকতে পারে। মোবাইল ফোনের দবদবার চোটে অনেকেই আজকাল ল্যান্ড লাইন রাখছেন না। সেজন্য ফেসবুক, ট্যুইটার, ইনস্টাগ্রামসহ সব সোশ্যাল নেটওয়ার্ক তোলপাড় করে খোঁজা হল কলকাতাবাসী বিজয় জয়সওয়ালদের।

খুঁজে বের করতে খুব অসুবিধে অবশ্য হল না। একটু সময় লাগলেও শেষপর্যন্ত পাওয়া গেল অন্য দুই মিঃ বিজয় জয়সওয়ালের খোঁজ। সঙ্গে সঙ্গেই যোগাযোগ করা হল তাঁদের। প্রথম বিজয় জয়সওয়ালকে নিয়ে বিশেষ টেনশন নেই। কারণ তিনি দু' বছর আগেই কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে দেহ রেখেছেন। কিন্তু দ্বিতীয় বিজয় জয়সওয়ালকে নিয়েই আশঙ্কার মেঘ ঘনীভূত হল। তিনি পেশায় ডাক্তার। ঠিক ছ' দিন আগেই ডঃ জয়সওয়াল কোনও মেডিক্যাল কনফারেন্স অ্যাটেন্ড করতে গিয়েছেন। এখনও ফেরেননি। অবশ্য ফেরার সময় এখনও হয়নি। তাঁর স্ত্রী অহল্যা জয়সওয়ালকে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানালেন যে প্রায়ই ডঃ জয়সওয়াল এরকম কনফারেন্সে গিয়ে থাকেন। তাঁর ফোন সুইচড অফ থাকলেও তা নিয়ে বিশেষ চিন্তিত নন তিনি। দেশের বাইরে গেলে তাঁর ফোন সুইচড অফই থাকে। এই জাতীয় ট্যুরে তাঁর সঙ্গে সবসময়ই জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ রাধিকা যায়। এবার অবশ্য একাই গিয়েছেন। অধিরাজ সেদিনই অহল্যার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিল। কিন্তু ভদ্রমহিলা সবিনয়ে জানিয়েছেন যে তিনি এই মুহূর্তে দিল্লীতে নিজের এক আত্মীয়ের

বাড়িতে আছেন। পরের দিন ভোরের ফ্লাইটে কলকাতায় ফিরবেন। ওরা যেন পরদিন সকাল দশটা নাগাদ ওঁর কলকাতার বাড়িতে চলে আসে।

মিসেস জয়সওয়ালের কথায় টেনশনের কোনও ছাপ নেই। কিন্তু তাঁর কথা শুনে অধিরাজের ব্লাড প্রেশার হাই হওয়ার উপক্রম! সেই একই প্যাটার্ন! লোকটা আগে বাড়ি থেকে চলে গেল। তার অব্যবহিত কিছুদিন পরেই ঐ নামে আর.আই.পি পোস্ট! ব্যাপারটা মোটেই সুবিধার ঠেকছে না। অন্যদিকে তন্নতন্ন করে খোঁজা হচ্ছে স্বর্ণব্যবসায়ী বিজয় জয়সওয়ালের গাড়িটা। অধিরাজ সেটার হাপিশ হয়ে যাওয়াটা কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি। হিস্ট্রিশিটাররা কয়েক কেজি কাঁচালঙ্কা ও কয়েক গ্যালন গরম দুধ খেয়েও নিজেদের বয়ান থেকে নড়ছে না! প্রত্যেকেরই বক্তব্য, এরকম কোনও সাদা এস.ইউ.ভি তারা দশ-বারো দিন কেন, একমাসেও চোখে দেখেনি! টর্চারের চোটে গড়াগড়ি দিচ্ছে, হাতে পায়ে ধরছে আর বলছে, “বিশ্বাস করুন স্যার! আমরা কিছু জানি না।”

অধিরাজের মুখ শক্ত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তাও হাল ছাড়েনি সে। এইটুকু বলা যায় যে বিজয় জয়সওয়ালের এস.ইউ.ভি গাড়িটা প্রধান সড়ক ধরে কোথাও যায়নি। তাহলে কোনও না কোনও সিসিটিভিতে ধরা পড়তই। সেজন্য সে মেরিলিন প্ল্যাটিনামের আশেপাশের সমস্ত রাস্তা, সমস্ত গলিঘুঁজি খুঁজে দেখেছে। সমস্তরকম সম্ভাবনাকে মাথায় রেখে এগোলেও শেষপর্যন্ত সেই ডেড-এন্ডে গিয়েই পিঠ ঠেকে গেল। মেরিলিন প্ল্যাটিনামের সংলগ্ন এমন বেশ কয়েকটা কাঁচা রাস্তা আছে যেগুলো দিয়ে গাড়িটাকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া সম্ভব। সেই সমস্ত রাস্তাতে স্বয়ং অধিরাজ, অর্ণব, পবিত্রসহ গোটা টিম সারাদিন গাড়ির ফটো নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে বেড়াল। এমনকি আশেপাশে যে ক'টা গ্যারাজ চোখে পড়ল সেখানেও রীতিমতো তল্লাশি চলল। কিন্তু নিটফল জিরো।

এই পরিস্থিতিতে সি.আই.ডি হোমিসাইড টিম যখন হতাশার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে, তখন স্থানীয় সমস্ত জলাশয়ে ডুবুরী নামানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। মেরিলিন প্ল্যাটিনাম যেহেতু একটু ভেতরের দিকে, তুলনামূলক শহরতলীর পরিবেশে অবস্থিত, সেহেতু আশেপাশে বেশ কয়েকটা বিশাল ঝিল, আর বিরাট বিরাট পুকুরও আছে। এমনকি মেরিলিন প্ল্যাটিনামের ঠিক পেছনেই একটা বড় পুকুর রয়েছে। কোনও গাড়িকে সেইসব

ঝিল বা পুকুরে ডাম্প করা অসম্ভব নয়। সেই পরিকল্পনামতোই চলে এল ডুবুরীর দল। প্রত্যেকটা পুকুর এবং ঝিলে চিরুনি তল্লাশি চলল। ডাইভাররা অনেক চেষ্টা করেও কিছু পাচ্ছে না দেখে অধিরাজ নিজেই উত্তেজিত হয়ে দ্রুত হাতে শার্ট, বুট, বেল্ট, হাতের ঘড়ি খুলতে শুরু করে। অর্ণব তার কাণ্ড দেখে ঘাবড়ে গেল। পবিত্র বলল— "রাজা, এটা কী হচ্ছে!"

সন্ত্রস্ত কণ্ঠে উত্তরে রাগী রাগী চোখে তার দিকে তাকায় অধিরাজ। তার চোয়াল শক্ত। মুখ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কোনও কথা না বলে শার্ট, বুট, রিভলবার সমেত বেল্ট ও ঘড়ি এগিয়ে দিল অর্ণবের দিকে!অর্ণব হতভম্বের মতো জিনিসগুলো ধরতে না ধরতেই সে বিদ্যুৎবেগে লাফ মেরে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পবিত্র বিড়বিড় করে— "একেই সর্দি লেগেছে, তার ওপর গোঁয়ারের মতো রেগেমেগে অবেলায় জলে নামল। কেস সল্ভ করতে গিয়ে নিউমোনিয়ায় না মরে! এ মাল কিছুতেই শুধরোবে না।"

কিন্তু সেই তুমুল প্রচেষ্টাও ফলবতী হল না। ডাইভাররা আর স্বয়ং অধিরাজ আপ্রাণ জল তোলপাড় করে খোঁজ চালাল। আক্ষরিক অর্থেই প্রচুর জলঘোলা হল। তবুও সে গাড়ি খুঁজে পাওয়া গেল না। একটা একটা করে ঘণ্টা কাটছে আর অর্ণবের বুকের ভেতরে ভয় বাড়ছে। অধিরাজও ক্রমশ উতলা হয়ে উঠছে। তার স্বভাবগত স্থৈর্যও জবাব দিচ্ছে। ওদিকে ডঃ বিজয় জয়সওয়াল হয়তো একটু একটু করে মৃত্যুর দিকে এগোচ্ছেন, অথচ এদিকে কিছুতেই একটাও ক্লু পাচ্ছে না সি.আই.ডি। চেষ্টার ক্রুটি নেই, কিন্তু সর্বত্রই অন্ধকার।

সারাদিন খানা-তল্লাশিতে কাটল। রাতে অধিরাজ অফিসে ফিরে আবার ট্র্যাফিক ডিপার্টমেন্টের দেওয়া সিসিটিভি ফুটেজ দেখতে বসে গিয়েছিল। অর্ণবও তার সঙ্গে। কিন্তু ক্লান্তিতে তার চোখ ক্রমাগতই ভারী হয়ে আসছে দেখে অধিরাজই বলেছিল, "আজ তুমি বরং বাড়ি চলে যাও। আমি আছি এখানে। কাল না হয় আটটায় রিপোর্ট কোরো। একসঙ্গেই মিসেস জয়সওয়ালের কাছে যাওয়া যাবে।"

"আপনি সারা রাত এখানে জেগে বসে থাকবেন?"

- "আরেকবার এই ফুটেজগুলো দেখা দরকার।" সে আপনমনেই বিড়বিড় করে বলে, হয়তো কিছু মিস করে যাচ্ছি। এমন কিছু জিনিস, হয়তো নিতান্তই সামান্য, কিন্তু ক্লু হিসাবে টার্নিং পয়েন্ট হতে পারে।"

"কিন্তু আমরা তো অনেকবারই দেখেছি ফুটেজগুলো।" -

"আরও একবার দেখে নিই। কোনওদিকেই যখন এগোনো যাচ্ছে না, তখন হাতের কাছে যা আছে সেটাও আরেকবার খুঁটিয়ে দেখে নেওয়া ভালো। তুমি বরং আজ রেস্ট নাও।"

- "না স্যার।" অর্ণব সজাগ থাকার চেষ্টা করে, "আমি ঠিক আছি।" কিন্তু ঠিক আছি বললেই তো আর ঠিক থাকা যায় না। বেচারা নিজের অজান্তেই কখন যে চেয়ারে বসে বসেই ঘুমিয়ে পড়েছে মনে নেই। যতবারই চোখ খুলেছে ততবারই দেখেছে ধূমায়িত কফির কাপ ও জ্বলন্ত সিগারেট হাতে অধিরাজ চুপ করে সিসিটিভি ফুটেজগুলো দেখছে। তার চোখের পলক পড়ছে না। দৃষ্টি প্রখর। স্থির মুখমণ্ডল। ধ্যানমগ্ন তপস্বীর মতো বাহ্যজ্ঞানহীন। শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই!

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতেই অর্ণব দেখল অধিরাজ টেবিলের ওপরে মাথা রেখে ঘুমিয়ে আছে। সিসিটিভি ফুটেজের সিডিগুলো সব টেবিলের ওপরেই ছড়িয়ে আছে। অর্থাৎ সব দেখা হয়ে গিয়েছে। টেবিলে, মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে অজস্র কফির কাপ ও সিগারেটের টুকরো!

এখনও রীতিমতো ঘুম ঘুম পাচ্ছিল অর্ণবের। অহল্যার কথামতো সকাল দশটার অ্যাপয়েন্টমেন্ট রক্ষা করতে বেরিয়ে পড়েছে অধিরাজবাহিনী। সে আড়চোখে অধিরাজের দিকে তাকায়। সারারাত ঘুমোয়নি লোকটা! অথচ কী ফ্রেশ লাগছে! এই লোকটার কি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তি— কিছুই থাকতে নেই! অবশ্য সর্দি বেশ ভালোই লেগেছে। মাঝেমধ্যেই হেঁচে ফেলছে।

"স্যার, এমনও তো হতে পারে যে ডক্টর জয়সওয়াল সত্যিই কোনও কনফারেন্স অ্যাটেন্ড করতে গিয়েছেন।" গাড়িতে যেতে যেতে অর্ণব একটু হতাশ স্বরেই বলে ওঠে, "উনি হয়তো বিদেশে বসে লবস্টার আর রোস্টেড ল্যাম্ব খাচ্ছেন। আর আমরা তাঁর জন্য হন্যে হয়ে খাবি খাচ্ছি!" -

অধিরাজ আজ ড্রাইভ করছে। সে স্টিয়ারিঙ ঘুরিয়ে একটা টার্ন নিতে নিতে বলল, "খুব খিদে পেয়েছে নাকি অর্ণব? কিছু খেয়ে নেবে? ব্রেকফাস্টও তো করা হয়নি।"

অর্ণবের সত্যিই খুব খিদে পেয়েছিল। প্রায় ছিয়ানব্বই ঘণ্টা হতে চলল সে বাড়ি ফেরেনি। এই ছিয়ানব্বই ঘণ্টায় কী খেয়েছে, কী না খেয়েছে মনেই নেই! গোটা সময়টা জুড়ে শুধু তুলকালাম হয়েছে। পাগলের মতো একবার এদিকে দৌড়চ্ছে তো আরেকবার ওদিকে। ডঃ চ্যাটার্জী তো একবার বলেই ফেলেছিলেন, "সর্বক্ষণ পিংপং বলের মতো লাফিয়েই বেড়াচ্ছ দেখছি। কাজের কাজ তো কিছুই হল না!"

অধিরাজ একটুও রাগ করেনি। বরং তির্যক দৃষ্টিতে ডঃ চ্যাটার্জীর টাক আর ভুঁড়ির দিকে তাকিয়ে বলেছিল, "পিংপং বলের মতো লাফানোর অভ্যেসটা ভালোই। নয়তো খোদ নিজেকেই ফুটবল হয়ে যেতে হয়।"

এরপর ডঃ চ্যাটার্জী কী করেছিলেন সেটা বলাই বাহুল্য। যথারীতি তাঁর 'প্যান্ডা নৃত্য' শুরু হয়ে গিয়েছিল। সঙ্গে এক ও অদ্বিতীয় হুমকি— "হতভাগা, হতচ্ছাড়া, অলপ্পেয়ে ছোঁড়া! আমায় ফুটবল বলা! খু-ন করে ফেলব। একদম খু...উ...ন করে ফেলব!"

এখন এত খিদে পেয়েছে অর্ণবের যে মাথা রীতিমতো বোঁ বোঁ করছে। আজ ব্রেকফাস্টও করতে পারেনি। আর ওপরওয়ালাও যেন তাকে দেখিয়ে দেখিয়েই রাস্তার দু ধারে রেস্টোরান্ট আর খাবারের দোকানের লাইন লাগিয়েছেন! কোথাও 'মিও আমোরে', কোথাও 'কে এফ সি' বা 'পিৎজা কর্ণার', কোথাও বা 'আরামবাগস চিকেন'। যত্তসব! তার ওপর সামনে এক বাইকওয়ালা ঢিমে তালে চলেছে। কিছুতেই সাইড দিচ্ছে না!

- "স্যার, এই বাইকটাকে কাটান তো!' সে বিরক্ত হয়ে বলে, "কখন থেকে ঢিকিয়ে ঢিকিয়ে চলেছে। কিছুতেই নাকের সামনে থেকে সরছেই না!"

অধিরাজ দেখল সামনে ফুড ডেলিভারীর ব্যাগ নিয়ে এক ছোকরা বাইক চালিয়ে যাচ্ছে। সে ঘাড় ঘুরিয়ে অর্ণবের দিকে তাকিয়ে স্মিত হাসল। পরক্ষণেই কথা নেই, বার্তা নেই, 'ঘ্যাসস' করে ব্রেক!

অর্ণব ভয়ে ভয়ে জানতে চায়, "কী হল স্যার?"

— "জাস্ট টু মিনিটস। ব্রেকফাস্ট টাইম।" কথাটা ছুঁড়ে দিয়েই গাড়িটাকে সাইড করে, সিটবেল্ট খুলে, এক দৌড়ে অধিরাজ চলে গেল উলটোদিকে। অর্ণব দেখল, সে সটান 'পিৎজা কর্নারে' ঢুকেছে। নিজের নিবুদ্ধিতায় লাল হয়ে উঠল তার ফর্সা মুখ। পাশে বসা টপনট্ বাঁধা কৃষ্ণাঙ্গী লেডি অফিসার মুচকি মুচকি হাসছে। ওদের টিমে খুব একটা লেডি অফিসারদের দরকার পড়ে না। তাই একটু অস্বস্তি বোধ করছিল অর্ণব। দু' মিনিট হওয়ার আগেই অবশ্য অধিরাজ ফিরে এল। হাতে একটা

বিরাট পিৎজার প্যাকেট। সেটা লেডি অফিসারের হাতে ধরিয়ে দিয়েছে সে, "প্লিজ মিস্ গুপ্ত!"

অর্ণব এবার মোক্ষম একটা বিষম খায়। কাশতে কাশতেই কোনোমতে সামলে নিয়ে বলল, "উনি মিস ঘোষ স্যার!"

অধিরাজ কোমরে হাত রেখে সটান দাঁড়িয়ে তার দিকেই চোখ কুঁচকে দেখছে, "কিন্তু তুমি যে সেদিন বললে উনি মিস ঘোষ নন, মিস গুপ্ত!"

সে কপাল চাপড়াতে গিয়েও সামলে নিল, "যাঁকে আপনি ঘোষ বলেছিলেন, তিনি গুপ্তই ছিলেন। আর ইনি অরিজিনালি ঘোষ!"

– "পিকিউলিয়ার প্রবলেম।" অধিরাজ কাঁধ ঝাঁকায়। পরক্ষণেই মিস ঘোষের দিকে তাকিয়ে নম্র হাসল, "সরি মাদমোয়াজেল!" মিস ঘোষ হাসতে হাসতেই মাথা নাড়ে, "ইটস্ ওকে স্যার! আপনি বরং মাদমোয়াজেল বা শুধু মিসটাই বলুন। ওটাই সেফ।"

- "কোনটাই সেফ নয়।" অধিরাজ ড্রাইভিং সিটে বসতে বসতে বলল, —"এরপর হয়তো কাউকে মিস বলে ডাকলেই অর্ণব বলে বসে থাকবে, 'স্যার, উনি তো মিস নন মিসেস!' প্রেস্টিজে গ্যামাক্সিন দিতে ও ওস্তাদ! লেডি অফিসার ফের হেসে ফেলল। -

অর্ণব ঢোঁক গিলল।

ডঃ বিজয় জয়সওয়াল কোনও কমপ্লেক্সে থাকেন না। নিউ আলিপুরে তাঁর নিজস্ব বিরাট বাড়ি আছে। সে তো বাড়ি নয়, অট্টালিকা! বিরাট সাদ ধবধবে তিনতলা বাড়ি, সামনের প্রাচীন গাড়ি বারান্দা এবং একপাশে লাল প্রাচীন গুলমোহর গাছ রীতিমতো আভিজাত্যের প্রতীক। সামনে বিরাট লোহার দরজার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে উর্দি পরা

নেপালি গেটকিপার। স্পষ্ট বোঝা যায় যে এ বাড়ি আজকের নয়। এই অট্টালিকার পেছনে ডঃ জয়সওয়ালের পূর্বপুরুষদের অবদান আছে। অনেক প্রজন্মের ঘাম রক্ত মিশে আছে প্রত্যেকটা ইটে।

বাড়ির ভেতরেই গাড়ি রাখার বিরাট বাঁধানো জায়গা। গেটকিপারকে নিজেদের পরিচয় দিতেই লোহার দরজা সশব্দে খুলে গেল। অধিরাজ সেখানেই গাড়ি পার্ক করে নামতে নামতেই সাইড ভিউ মিররে দেখতে পায়, একজোড়া সুন্দর চোখ দোতলার জানলা দিয়ে উকি মেরে সকৌতূহলে তাদেরই দেখছে। সে ভদ্রতাবশত ওপরের দিকে তাকায় না। বরং গাড়ির পেছনের দরজা খুলে লেডি অফিসারকে সসম্ভ্রমে বলল, "প্লিজ মিস!"

মিস ঘোষের মুখে এবার একটু যেন অসন্তোষের ছাপ পড়ল। লেডি অফিসাররা এ ধরনের ট্রিটমেন্টে একেবারেই অভ্যস্ত নয়। এ যে একেবারে ভদ্রতার পরাকাষ্ঠা ! সে নিজে যথেষ্টই স্বয়ংসম্পূর্ণ। কেউ আজ পর্যন্ত তার জন্য এভাবে গাড়ির দরজা খুলে ধরেনি। সে মহিলা হতে পারে, তার মানে এই নয় যে তাকে সবসময়ই পুতুপুতু করতে হবে।

আপনি এগোন স্যার। আমি আসছি।"

"মেয়েটির কণ্ঠস্বরে সামান্য উষ্মার আঁচ পেল অধিরাজ। সে মৃদু হেসে নীচু গলায় বলে, "আপনাকে ভি.আই.পি ট্রিটমেন্ট দেওয়া হচ্ছে না মিস। আমি জানি আপনি নিজেই গাড়ি থেকে নামতে পারেন। আসলে দোতলার রাইট উইঙের জানলায় কোনও শ্রীমতি অত্যন্ত সন্তর্পণে আমাদের দিকেই তাকিয়ে আছেন। অর্ণব বা আমি তো তার দিকে প্যাটপ্যাট করে তাকিয়ে থাকতে পারি না। অতএব আপনিই একটু তার শ্রীমুখটা দেখে নিন। দরজা ধরে থাকার বাহানায় একথাটাই বলার ছিল। দূর থেকে চিৎকার করে তো বলতে পারি না, ওপরটা একটু দেখুন তো। ধীরে সুস্থে সময় নিয়ে নামুন। সেই ফাঁকে ভালো করে হুলিয়াটা দেখে নিন। বাট মেক ইট নর্মাল।" মিস ঘোষ এবার ব্যাপারটা বুঝল। সে ধীরে সুস্থে নেমে এল গাড়ি থেকে। তার অন্যমনস্ক দৃষ্টি তিনতলা বাড়িটাকে ছুঁয়ে গেল। খুব ক্যাজুয়ালি একবার দেখে নিয়ে দরজা ধরে শোফারের মতো অপেক্ষারত অধিরাজের দিকে তাকাল। সে মৃদু হেসে সামান্য ঝুঁকে দরজাটা বন্ধ করে দিতে যায়। সেই মুহূর্তের ভগ্নাংশে তার

কানের কাছে চাপা স্বরে বলল মিস ঘোষ, “সুন্দরী। আঠাশ থেকে তিরিশ মনে হয়। মাথায় সিঁদুর আর গলায় মঙ্গলসূত্র আছে।” অধিরাজ স্মিত হাসল, “থ্যাঙ্কস।”

বাড়ির দরজায় এসে অবশ্য কলিংবেল বাজাতে হল না ওদের। ওপরে বসে যিনি সকৌতূহলে দেখছিলেন, সম্ভবত তিনিই ডোরবেল বাজাবার আগেই দরজা খুলে দিলেন। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে জানতে চাইলেন, “আপনারা?”

মেয়েটাকে দেখেই চোখ ঝলসে গেল অর্ণবের। এক কথায় অসহ্য সুন্দরী এবং তন্বী! এত সৌন্দর্য দর্শকের পক্ষে সহ্য করাও মুশকিল! কুচকুচে কালো রেশমী চুল সাবলীল জলপ্রপাতের মতো কোমরের নিচে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। গায়ের রঙ যেন আইভরি সাদা! হালকা বাদামী চোখের তারা দুটো কিঞ্চিত বিস্ফারিত।অপুর্ব চোখদুটোর চারপাশে লম্বা ও ঘনকালো পাতা বুঝি কাকচক্ষু ঝিলের চারপাশে বেড় দেওয়া ঘন বৃক্ষশ্রেণী! একটু যেন চমকে ওঠা অভিব্যক্তি। লাল ঠোঁটদুটো দেখলে মনে হয় গুলমোহরের পাপড়ি খসে পড়েছে। আঁটোসাঁটো কমলা রঙের রাত পোষাক পরে থাকার দরুণ দেহের গড়নটাও বোঝা গেল। কন্যা দীর্ঘাঙ্গী পীনপয়োধরা ও মধ্যক্ষামা। নিম্ননাভী এবং সুগভীর শ্রোণীর অধিকারি ও বটে। চলার ছন্দে ছন্দে যেন যৌবন উপছে পড়ছে। প্রশ্নটা যখন করল মেয়েটি, তখন গুলমোহরের ফাঁকে সুডৌল ঝকঝকে মুক্তোর দানা ঝলসে উঠল।

অধিরাজ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মিস ঘোষে’র দিকে তাকায়। সে অর্থপূর্ণভাবে মাথা ঝাঁকায়। অর্থাৎ ইনিই একটু আগে দোতলার জানলা দিয়ে উকি মারছিলেন। অর্ণব কিছু বলার আগেই মিস ঘোষ কেসটাকে টেক-ওভার করল। স্মার্টভঙ্গিতে এগিয়ে গিয়ে বলল, “সি.আই.ডি।”

“সি.আই.ডি!” মেয়েটি যেন আকাশ থেকে পড়ে, “কেন?”

– “আপনি...?”

- “শিনা জয়সওয়াল। কিন্তু সি.আই.ডি এখানে কেন?” শিনার কণ্ঠে ভয়ের ছাপ প্রকট।

– “একটা কেসের ব্যাপারে মিসেস অহল্যা বিজয় জয়সওয়ালের সঙ্গে কথা বলতে এসেছি...। মিস ঘোষের চটজলদি উত্তর, “আমরা আগেই ফোন করে ওঁর সঙ্গে কথা বলেছি। উনি জানেন।”

“কী প্রমাণ আছে যে আপনারা সি.আই.ডি ব্যুরো থেকেই আসছেন?”

মিস ঘোষ নির্বিবাদে আইডি কার্ড দেখাল।

“বেশ। আসুন।”

শিনা বিনা বাক্যব্যয়ে দরজার সামনে থেকে সরে গিয়ে স্বাগত জানায়। ওদের তিনজনকেই সে নিয়ে গেল একটা বিরাট বিলাসবহুল হলঘরে। হলঘরটা অর্থের প্রাচুর্য ও রুচির মেলবন্ধনে গড়ে উঠেছে। ধবধবে সাদা ইটালিয়ান মার্বেলের মেঝে, দেওয়ালের রঙ, পর্দার কভার থেকে শুরু করে সোফা, ঝাড়বাতি, বড় বড় অয়েল পেইন্টিং, শ্বেতপাথরের মূর্তি পর্যন্ত সব কিছু থেকেই সুশিক্ষা, শিল্প ও আভিজাত্যের গন্ধ আসছে। দেওয়ালের মাঝখানে বিরাট বইয়ের শো কেসে শেক্সপীয়র, মঁপাসা, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র সহ আরও অনেক বরেণ্য সাহিত্যিক ঝলমল করছেন। আছে ইংরেজি থ্রিলার ও প্রচুর ভূতের গল্পের বই। শোকেসের নীচে এক সাইডে পোর্সেলিন টবে পাতাবাহারের সারি অপূর্ব রঙের সন্নিবেশ ঘটিয়েছে।

“আপনারা এখানে বসুন, আমি মাকে ডেকে দিচ্ছি।” শিনা জয়সওয়াল পিছন ফিরতেই স্পষ্ট দেখা গেল তার শ্বেতপাথরের মতো ধবধবে সাদা বাহুর একসাইডে লাল-কালো রঙের স্যুট পরা স্পাইডারম্যানের ট্যাটু জ্বলজ্বল করছে! চরম ফর্সা হওয়ার দরুণ লাল-কালো রঙের কম্বিনেশনটা দুর্ধর্ষ লাগছে। -

সে চলে যেতেই জোরে শ্বাস ছাড়ল অর্ণব। এতক্ষণ তার প্রায় দমবন্ধ হয়ে আসছিল। মহিলার উপস্থিতি যেন অসম্ভব শ্বাসরোধী। যে কোনও পুরুষের হৃৎস্পন্দন থামিয়ে দেওয়ার যোগ্যতা রাখে এই সুন্দরী!

– “আজকাল সব সুন্দরীই ট্যাটু করাচ্ছেন না কি?” অধিরাজ বিড়বিড় করে বলল, “মিসেস মানসী জয়সওয়াল কাঁকড়াবিছের ট্যাটু করিয়েছেন দেখলাম, ইনি আবার স্পাইডারম্যান! কিন্তু স্পাইডারম্যানের স্যুট লাল আর নীল নয়? লাল-কালোর কম্বিনেশন কোথা থেকে এল! ইচ্ছেমতো রঙ করিয়েছেন নাকি?”

—“না স্যার।” অর্ণব মুচকি হাসল, “ইচ্ছেমতো করাননি। ইনি মনে হয় মার্ভেল সুপার হিরো সিরিজের অত্যন্ত ভক্ত। আপনি দেখেননি? স্পাইডারম্যানের লাল কালো স্যুটও

আছে।”

“সে কী! স্পাইডারম্যান তো জীবনে একবারই কালো স্যুট পরেছিল।” এবার অবাক হওয়ার পালা অধিরাজের, “সেখানেও তো শুধু কালো! লাল তো ছিল না!”

– “স্যার, আপনি যার কথা বলছেন বা যাকে স্পাইডারম্যান হিসাবে চেনেন সে পিটার পার্কার।” অর্ণব বুঝিয়ে বলল, “পিটার পার্কারই কিন্তু একমাত্র স্পাইডারম্যান নয়। আসলে মার্ভেল কমিকস একটু অন্য লেভেলের কনসেপ্টে খেলে। পিটার পার্কার প্ল্যানেট আর্থ, মানে পৃথিবীর স্পাইডারম্যান। কিন্তু কমিকস সিরিজটায় প্যারালাল ইউনিভার্সে একসঙ্গে অনেকগুলো স্পাইডারম্যান আছে। এমনকী একজন স্পাইডার-ওম্যানকেও পাবেন। ইউনিভার্সেরই আরেকজন। স্পাইডারম্যান-টুও বলতে পারেন। এনার আসল নাম মাইলস্ মরালস। যিনি লাল-কালো রঙের স্পাইডারম্যান তিনি এই প্যারালাল আর্থ ফাইভের স্পাইডারম্যান। আলটিমেট ফল আউটে ফার্স্ট অ্যাপিয়ার করে এই নতুন স্পাইডারম্যান। দ্য অ্যামেজিং স্পাইডারম্যানেও তিনি আছেন। ইনফ্যাক্ট এঁকে অ্যানিমেটেড আল্টিমেট স্পাইডারম্যান টিভি সিরিজেও দেখা গিয়েছিল।”

“তার মানে লাল-কালো স্পাইডারম্যান পিটার পার্কার নয়।”

“না। লাল-কালো স্যুটের হিরো মাইলস মরালস স্যার।” সে জানায়, “এছাড়া আরও একজন স্পাইডারম্যান আছেন। মিগুয়েল ওহারা। আমি তিনজনের কথাই জানি। কিন্তু সম্ভবত আরও আছে।” “রক্ষে করো।” অধিরাজ মাথা ঝাঁকায়, “এর থেকে আমার কাঁকড়াবিছে সুন্দরীই ভালো। দ্য স্করপিয়ন কুইন।”

অর্ণবের মনে হয়, অধিরাজের বোধহয় মানসী জয়সওয়ালকেই বেশি মনে ধরেছে।সে বলল— “আরেকটা কথা। মাইলস মরালসের আরেকটা স্পেশ্যালিটি আছে। সব স্পাইডারম্যানদের মধ্যে ও-ই একমাত্র কালো মানুষ! নিগ্রোবটু।”

“সে কী!” -

সে কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল। হলঘরের দরজার দিকে তাকিয়ে তার ফের কণ্ঠরোধ হয়ে গিয়েছে। কোনোমতে ফিসফিস করে বলল, “স্যার, আমরা কি মিসেস ইউনিভার্সের প্রতিযোগী খুঁজতে এসেছি।” কথাটা বলার কারণ আছে। এই মুহূর্তে হলঘরে এক বয়স্কা

মহিলার সঙ্গে যে নারীটি ঢুকল, তাকে দেখলে এই কথাটাই মনে হয়। শিনা জয়সওয়াল অপূর্ব সুন্দরী। কিন্তু এখন যে সামনে এসে দাঁড়াল তাকে দেখলে মোটামুটি মমতাজমহল, পদ্মাবতী, হেলেন অব ট্রয়ের কথাই মনে পড়ে। শিনা যদি শ্বেতপদ্ম হয়, এ তবে ব্রহ্মকমল! কাচা সোনার মতো গায়ের রঙ যেন চতুর্দিক আলো করেছে। তপ্তকাঞ্চনবর্ণা! চেহারাটা অবশ্য ক্ষীণ নয়, একটু ভারীর দিকেই। কিন্তু ভারী বা তথাকথিত কার্ভি চেহারা যে কত সুন্দর হতে পারে এই মহিলা তার জলজ্যান্ত নিদর্শন! অনেক জিরো ফিগারের হিরোইন তাকে দেখলে অজ্ঞান হয়ে যাবেন। শিনার সৌন্দর্য পুড়িয়ে দেয়। অথচ এই নারীর রূপ দর্শকের প্রাণে আরাম দেয়। দেবী মূর্তির মতো টানাটানা চোখ, চোখের তারা সামান্য নীলাভ এবং স্বচ্ছ, পাকা করমচার মতো লাল ঠোঁট। একপিঠ কোঁকড়া কোঁকড়া চুল ছড়িয়ে রয়েছে। একটা বন্য সৌন্দর্যের পাশাপাশি স্নিগ্ধভাবের বৈপরীত্য। একটা কালো শাড়ি এবং স্লিভলেস কালো ব্লাউজ পরেছে। শিনা যতটা তীক্ষ্ণ, সে ততটাই লাবণ্যময়ী। হাঁটার ধরণটুকুও লাস্যে ঢলঢল করছে। উপস্থিত তিনজন অফিসারই মনে মনে স্বীকার করল, "রূপসী বটে।" অধিরাজ মৃদু হেসে নীচু স্বরেই বলল, "গুড ওয়ান অর্ণব।"

বয়স্কা মহিলা সম্ভবত বাতব্যাধিগ্রস্ত। তাই তাঁর হাত ধরে সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি আসছে। অধিরাজ বয়স্কা নারীটিকেই নিবিষ্টমনে দেখছিল। ইনিই সম্ভবত অহল্যা জয়সওয়াল। আগের মেয়েটির নাম যদি শিনা হয়, তবে পাশের সুন্দরী তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ রাধিকা হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। মেয়েটির কপালে সিঁদুরবিন্দু বা গলায় মঙ্গলসূত্র নেই! অহল্যার গাত্রবর্ণ বেশ কালো। চুল কাঁচা-পাকা। বয়েসের তুলনায় একটু বেশিই বুড়িয়ে গিয়েছেন। কিন্তু মুখখানা অদ্ভুত। ভীষণ মমতামাখা অথচ দৃঢ়তার সঙ্গম। সবচেয়ে অদ্ভুত তাঁর চোখ। এরকম চোখ অধিরাজ খুবই কম দেখেছে। কী যেন আছে অহল্যার চোখে! সেটা প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব, না অন্যকিছু বোঝা মুশকিল।।

অহল্যা কিন্তু অর্ণব আর মিস ঘোষের দিকে ফিরেও তাকালেন না। সোজা অধিরাজের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পরিষ্কার বাংলায় বললেন, "আপনিই মিঃ ব্যানার্জী তো? আমি অহল্যা জয়সওয়াল।"

অধিরাজ মহিলার প্রতি একটা গভীর শ্রদ্ধা অনুভব করছিল। গলার স্বর তো নয়, যেন জলতরঙ্গ বাজছে। সে নমস্কার করে, "আজ্ঞে। আমিই।"

- "বসুন।" অহল্যা সোফার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করলেন। পাশের সুন্দরীর দিকে তাকিয়েছেন তিনি, "ও রাধিকা। আমার বড় বৌমা। স্কলার বায়োকেমিস্ট।" রাধিকা মৃদু হেসে নমস্কার জানায়।

ওরা তিনজনেই তাকে প্রতি নমস্কার জানাল। - "রাধিকা শুধু আমার বৌমা নয়, ও আমার মেয়ের মতোই। আমার বড় ছেলে গৌরব অকালে ছেড়ে চলে গেলেও রাধিকা আমাদের ছেড়ে যায়নি। আমার নিজের মেয়ের তো আমাদের খেয়াল রাখার সময় নেই। রাধিকাই আমার আর বিজয়ের খেয়াল রাখে। একহাতে ল্যাব সামলায়, অন্যহাতে সংসার। বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে সবসময়ই থাকে। এককথায় ও বিজয়ের ডানহাত।" অহল্যা নিজেই এবার সোফায় আয়েশ করে বসে পড়েছেন, "আপনারা দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন প্লিজ।"

অহল্যার কথায় অধিরাজের আন্দাজটাই সঠিক প্রমাণিত হল। রাধিকার সিঁথিতে সিঁদুরবিন্দুর অনুপস্থিতি এবং গলায় মঙ্গলসূত্রের না থাকাটাই তার ম্যারিটাল স্ট্যাটাস বলে দিয়েছিল। এখন স্পষ্ট হল যে মেয়েটি বিধবা।

অধিরাজ অহল্যার প্রতিটি হাবভাব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জরিপ করছিল। ভদ্রমহিলা –"বসুন প্লিজ" কথাটা এমনভাবে বললেন যেন শুধু সামনের তিনজন নয়, গোটা দুনিয়াই তাঁর অঙ্গুলিহেলনে বসে পড়তে বাধ্য! অদ্ভুত কম্যান্ডিং টোন। অনুরোধ নয় অলঙ্ঘ্য আদেশ! ওরা আর কথা না বাড়িয়ে মুখোমুখি সোফায় বসে পড়ল। অর্ণব লক্ষ্য করল অধিরাজ যেমন একদৃষ্টে অহল্যার দিকে তাকিয়ে আছে, তেমন অহল্যাও ওর দিকেই অনিমেষে দেখছেন। যেন দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পরস্পরকে মেপে নিচ্ছে। মহিলা তিনজনকেই উদ্দেশ করে কথা বলছেন ঠিকই, কিন্তু চোখ অধিরাজের - ওপর থেকে সরছে না!

– "যে আপনাদের দরজা খুলে দিয়েছে, সে আমার ছোট বৌমা শিনা

- আমার ছোট ছেলে গৌতমের স্ত্রী। ও আপনাদের জন্য চা নিয়ে আসছে...।"

"থ্যাঙ্কস।" অধিরাজ অহল্যার দিকে একটু ঝুঁকে বসে বলল, "চায়ের দরকার নেই। আমরা একটু দরকারি কাজে এসেছি। কাজ হলেই চলে যাব।"

অহল্যা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার কয়েকমুহূর্ত অধিরাজের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর শান্ত স্বরে বললেন, "আপনার দৃষ্টিতে একটা সহানুভূতি আছে! আমার কেন মনে হচ্ছে যে আপনি কোনও দুঃসংবাদ শোনাতে যাচ্ছেন?"

অর্ণব চমকে উঠল! মিস ঘোষও স্তম্ভিত। আপাতদৃষ্টিতে মহিলাকে অত্যন্ত শান্ত ও ঘরোয়া মনে হয়েছিল। অন্য পাঁচজন প্রৌঢ়ার থেকে বিন্দুমাত্রও আলাদা মনে হয়নি। কিন্তু এই মুহূর্তে তাঁর কথা শুনে প্রায় পিলে চমকে ওঠার উপক্রম।

অধিরাজ অবশ্য একটুও অবাক হয়নি। সে তখনও শান্ত, স্থির দৃষ্টিতে অহল্যার দিকে তাকিয়ে আছে । ভাবটা এমন, "যখন বুঝেই ফেলেছেন, তখন আপনিই বলুন।"

একটা পায়ের শব্দে সচকিত হয়ে অর্ণব দরজার দিকে তাকায়। শিনা একটা ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকছে। অহল্যাও তার দিকে একটা আলগা দৃষ্টিক্ষেপ করে বললেন, "আমি রেগুলার টিভি দেখি। আমার একমাত্র মেয়ে সুপর্ণা ক্রাইম রিপোর্টার। তার দৌলতে সব খবরই আমরা জানতে পারি। সর্বনাশিনীর কেসটাও দেখেছি। এই মুহূর্তে তো ওটাই হেডলাইন! বিজয় জয়সওয়ালের ডেথ ফোরকাস্ট হয়েছে জেনে আমরাও শকড় হয়ে কিন্তু সুপর্ণা বলেছিল যে ওটা অন্য বিজয় জয়সওয়াল। নিশান জুয়েলার্সের মালিক...!" তিনি সামান্য একটু ছেদ দিয়ে ফের বলেন, "তিনি বোধহয় নাম। নন। তাই না?"

অধিরাজ একটা গভীর শ্বাস টানল, "না। হয়তো তিনি নন, অন্য কেউ।"

উত্তরটা শুনে একটা বিষণ্ন হাসি হাসেন অহল্যা। তাঁর দুই পুত্রবধূ রাধিকা ও শিনা ভয়ার্ত দৃষ্টিতে পরস্পরের মুখ দেখছে। তাদের মুখে চরম আশঙ্কার ছাপ। অহল্যার মুখ কিন্তু অত্যন্ত শান্ত। অত্যন্ত নির্লিপ্তভাবে বললেন, "আর আপনাদের সন্দেহ যে সেই 'অন্য' বিজয় জয়সওয়াল আমার স্বামী। তাই তো?"

– "আপনিও কি তাই সন্দেহ করেন না?" সে সহানুভূতি মাখা কণ্ঠে বলে, "আপনি বললেন না ডেথ ফোরকাস্ট শুনেই 'শকড' হয়েছিলেন? কেন? শহরে একাধিক বিজয় জয়সওয়াল থাকতেই পারে। তাই না? তবে শকড হওয়ার কারণ কী?" -

কথা তো নয়, যেন দাবাখেলা চলছে! অন্তত অর্ণবের তাই মনে হচ্ছিল। অহল্যা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে অধিরাজের দিকে তাকিয়ে আছেন। অধিরাজ অত্যন্ত শান্ত, ধীর-স্থির। সে ধৈর্য ধরে ভদ্রমহিলার উত্তরের অপেক্ষা করছে।

"আপনি বয়েসে আমার ছেলেদের থেকেও ছোট। হয়তো সেই কারণেই যা জানতে চাইছেন, তা জিজ্ঞাসা করতে সঙ্কোচ হচ্ছে।" শেষপর্যন্ত অহল্যাই মুখ খুললেন, "আপনার প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তরই হল 'না'।"

"মানে?" -

"বিজয় মদ্যপ লম্পট নন। তাঁর সঙ্গে কারোর এক্সট্রা ম্যারিটাল অ্যাফেয়ার ছিল না।"

বিদ্যুতের মতো এসে পড়ল উত্তরগুলো। অর্ণব আর মিস ঘোষ হতভম্ব হয়ে তাকিয়েছিল তাঁর দিকে। অধিরাজ মাথা নীচু করে একটু কী যেন ভাবল। তারপর বলল, "উনি তো পেশায় ডাক্তার। আপনি?"

– "আমিও আগে ডাক্তারই ছিলাম। বিয়ের পর হাউস ওয়াইফ হয়েছি।" অহল্যা সুমধুর হাসলেন, "এ বাড়িতে একমাত্র বেকার লোক আমিই। রাধিকা আর সুপর্ণার কথা আগেই বলেছি। শিনা আর গৌতম, দুজনেই মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ। গৌতম এখন এখানে নেই। কোম্পানির কাজে 'ইউ কে' তে গিয়েছে। শিনাও অষ্টপ্রহর ব্যস্ত থাকে। কখন বেরোয়, কখন ঢোকে কিছুই ঠিক নেই। সবার মধ্যে একমাত্র আমারই কিছু করার নেই।"

অধিরাজ স্পষ্ট বুঝতে পারে ঠিক যা যা সে জানতে চায় ভদ্রমহিলা সেগুলোই প্রশ্ন করার আগেই একদম নিখুঁত অঙ্ক কষে বলে গেলেন। সে হলঘরের টবের পাতাবাহারের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে বলে, "খুব সুন্দর গাছগুলো। মেইনটেইন কে করে? মালি আছে?"

"না।" প্রৌঢ়া মিটিমিটি হাসলেন, "ওটা আমার অন্যতম শখ। গার্ডেনিং করা। ছাতেও অনেক গাছ লাগিয়েছি।"

সে এবার বই ভর্তি শো-কেসের দিকে তাকিয়েছে, "বাংলা বই কে পড়ে?"

- "ওটাও আমারই হবি।" তিনি ফের অর্থপূর্ণ ভঙ্গিতে বলেন, "বেকার লোকের বই আর দাবার চেয়ে ভালো সঙ্গী আর নেই। আমি অবশ্য ক্ল্যাসিক সাহিত্যই পড়ি। রাধিকা আর

শিনা যত রাজ্যের ভূতের বই পড়তে ভালোবাসে। অবশ্য তেমন সময় পায় না। আমিও মাঝে-মধ্যে পড়ি। আর সুপর্ণা ইংরেজি মার্ডার মিস্ট্রি ছাড়া আর কিছুই পড়ে না।"

"আপনি দাবা খেলেন?"

"হ্যাঁ। আমার ফেভারিট স্পোর্ট।"

"বাংলা সাহিত্য পড়েন যখন, তখন আপনি...।"

অধিরাজের মুখ থেকে কথা ছিনিয়ে নিয়ে বললেন তিনি, "বাঙালি। আমি একা নই, আমরা সকলেই বাঙালি। আমার বাপের বাড়ির টাইটেল সেনগুপ্ত। রাধিকা গুহ। আর শিনা মৈত্র। জয়সওয়ালরাও অবশ্য নামেই জয়সওয়াল। সকলেই বাঙালি হয়ে গিয়েছে।" অহল্যা এবার একটু অধৈর্য, "আপনাদের চা বোধহয় ঠান্ডা হয়ে গেল।"

তাঁর কথার মধ্যে আবার সেই কম্যান্ডিং টোন! অর্থাৎ এখানেই শেষ করে দিতে হবে পুলিসি জেরা। এর বেশি আর কিছু বলবেন না তিনি।

- "সরি।" অধিরাজ অমায়িক হাসে, "আজ অনডিউটি। অন্য কোনওদিন এসে নিশ্চয়ই চা খেয়ে যাব।" বলতে বলতেই সে উঠে দাঁড়ায়, "ডঃ জয়সওয়ালের মোবাইল নম্বর আর একটা ছবি পেতে পারি কি? বুঝতেই পারছেন। জাস্ট রুটিন ফর্ম্যালিটি।"

— "নিশ্চয়ই।" অহল্যা রাধিকার দিকে তাকিয়েছেন, "তোমার বাবার ফোন নম্বর আর একটা ছবি দিয়ে দাও ওঁদের।

রাধিকা মৃদু হেসে হুকুম তামিল করতে চলে গেল। সে পেছন ফিরতেই অর্ণব ধরা গলায় বলল, "ড্রাগন!"

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে অধিরাজ দেখল রাধিকার পিঠের নীচে যেখানে কোমরটা চমৎকার একটা বাঁক নিয়েছে, সেখানে লাল রঙের জিভ বার করে আছে একটা ভয়ঙ্কর ড্রাগন। বলাই বাহুল্য, 'ট্যাটু'! অধিরাজ হাসতেই যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই...

"এক্সকিউজ...ওঃ!" -

মোক্ষম একটা হাঁচি! সে সামলে ওঠার আগেই ফের আরেকটা! অহল্যা একটু হেসে বললেন, "সর্দি লেগেছে দেখছি।"

“আজ্ঞে!” অধিরাজ একটু বিব্রত, অপ্রস্তুত। রুমালে নাক মুছছে সে, –“একটু ঠান্ডা লেগেছে।”

“একটু নয়, বেশ ভালোই।” তিনি তার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, “চোখ ছলছল করছে। একটু লালচে। জ্বর আসেনি তো?” -

“না।” সে সামলে নিল, “ঠিক হয়ে যাবে। থ্যাঙ্কস।”

অহল্যা জয়সওয়াল একটু হেসে চুপ করে গেলেন। তবু তাঁর চোখ অধিরাজের মুখ থেকে সরল না। ভগবানই জানেন তিনি নিবিষ্ট মনে কী দেখে চলেছেন। অবশ্য অর্ণব জানে যে কোনও মেয়েই তার স্যারের দিকে তাকালে সহজে চোখ ফেরাতে পারে না। কিন্তু অহল্যার মতো প্রৌঢ়াও যে কাত হবেন সেটা জানা ছিল না।

অধিরাজের চোখ এবার শিনার দিকে সরেছে— “আপনি খুব মার্ভেল কমিকস পড়েন না? সুপারহিরো ফিল্মও দেখেন নিশ্চয়ই?”

প্রায় আকাশ থেকে পড়ল শিনা— “না তো! কে বলল! কমিকস একদমই চলে না। সুপারহিরো ফিল্মও বোকা বোকা লাগে। তবে প্যারাসাইকোলজির ওপর খুব ইন্টারেস্ট আছে। তাই হরর ফিল্ম দেখি।” অহল্যা হাসলেন— “আমাদের বাড়িতে সর্বক্ষণই হয় কনজ্যুরিং নয় অ্যানাবেল চলছে! আর রাধিকার ফেভারিট চাইল্ডস প্লে! ভয়ও পাবে, আবার দেখাও চাই।”

অধিরাজ অর্ণবের দিকে ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিপাত করল। শিনা আদৌ মাইলস্ মরালসকে চেনেই না! সুতরাং মাইলস্ মরালস যে কৃষ্ণাঙ্গ তা তার জানার কথাই নয়। এবং তার মুখ দেখলেই বোঝা যায় যে আদৌ সে অভিনয় করছে না।

একটু পরেই রাধিকা ডঃ জয়সওয়ালের ছবি ও মোবাইল নম্বর নিয়ে এল। শিনা তাদের রিসিভ করেছিল। রাধিকা তাদের বিদায় দিতে এল। অহল্যা শুধু অধিরাজকে একবার বললেন, “পারলে ওষুধ খেয়ে নেবেন। জ্বর আসবে বলেই মনে হয়।”

রাধিকা তাদের এগিয়ে দিতে বাড়ির বাইরে এসেছিল। অধিরাজ তাকে একা পেয়ে কোনওরকম ভনিতা না করেই জানতে চায়, “কিছু মনে করবেন না। আপনার হাজব্যান্ড ঠিক কীসে মারা গিয়েছিলেন?”

রাধিকার সুন্দর মুখে বিষণ্ণতার ছাপ পড়ে। বুকে চিবুক ঠেকিয়ে বলল, —“অ্যাকিউট লিভার ড্যামেজ। অনেক চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু বাঁচানো যায়নি।”

“সঙ্গে রেনাল ফেইলিওরও ছিল? কিংবা মাল্টিপল অর্গ্যান ফেইলিওর?”

তার স্বচ্ছ চোখের তারা একটু বিস্ফারিত হল, “আপনি কীকরে জানলেন!”

অধিরাজ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে পালটা প্রশ্ন করে, “আপনি তো সবসময়ই ডঃ জয়সওয়ালের সঙ্গেই থাকেন। তাঁর সমস্ত প্রোগ্রাম, মিটিং— শিডিউল সবই জানেন। উনি ঠিক কোথায় কোথায় যেতেন? অবশ্যই হসপিটাল আর ক্লিনিক ছাড়া।”

রাধিকা একটু ভেবে বলল, “তেমন কোথাও তো যেতেন না। বেশিরভাগ সময়ই হসপিটাল আর ক্লিনিকেই কাটাতেন। তবে এছাড়া ‘গোল্ডেন মুন’ ক্লাবে যেতেন। প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় ওখানেই কাটাতেন।”

“বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে?”

– “বলতে পারব না।” সে মুখ নীচু করেছে, “আমি কখনও ওঁর সঙ্গে ক্লাবে যাইনি।”

“ডঃ জয়সওয়াল তো প্রত্যেক ট্যুরে আপনাকে নিয়ে যান। এবার নিয়ে যাননি কেন?”

এবার রাধিকাকে একটু বিপন্ন লাগল । সে ফ্যাকাশে হেসে বলল, “জানি না । বলতে পারব না!”

“ওকে।” অধিরাজ হাসল, “থ্যাঙ্কস আ লট।”

রাধিকা আর কোনও কথা না বাড়িয়ে চলে গেল। অধিরাজ আপনমনেই কিছু ভাবতে ভাবতে এগিয়ে যাচ্ছিল গাড়ির দিকে। অর্ণবের তখন পেটে একরাশ প্রশ্ন গজগজ করছে। বিশেষ করে একখানা অবধারিত প্রশ্ন। সে আর থাকতে না পেরে প্রশ্নটা করেই বসল, “স্যার, তার মানে কি সর্বনাশিনীর প্রথম শিকার সঞ্জীব রায়চৌধুরী নয়? গৌরব জয়সওয়াল!” – “ব্রিলিয়ান্ট অর্ণব! ভেরি গুড থিঙ্কিং। সে প্রশংসামাখা দৃষ্টিতে অর্ণবের দিকে তাকায়, নাইন্টিনাইন পার্সেন্ট চান্স আছে। কিন্তু ওয়ান পার্সেন্ট কো-ইনসিডেন্স!”

“তবে? রিয়া বাজাজ বা প্রিয়া বাজাজ নয়? জয়সওয়াল ফ্যামিলির কেউ?”

“আমারও অবস্থা তোমারই মতো।” অধিরাজ গাড়িতে ঠেস দিয়ে হাসছে— “শ্রীরাধিকে চন্দ্রাবলী / কারে রেখে কারে ফেলি! যে চারজন মিসেস জয়সওয়ালকে দেখলে তার মধ্যে

সবচেয়ে কাকে অ্যাট্রাকটিভ মনে হল?”

এরকম একখানা বাউন্সারের জন্য তৈরি ছিল না অর্ণব।

থতমতো খেয়ে বলল, “স্যার, এ বলে আমায় দ্যাখ, ও বলে আমায় দ্যাখ কেস!”

“আমার কিন্তু অহল্যা জয়সওয়ালকে সবচেয়ে অ্যাট্রাকটিভ মনে হয়েছে।”

অর্ণব বিস্ময়ে কী বলবে ভেবে পায় না! শেষপর্যন্ত অহল্যা জয়সওয়াল!

“অহল্যা সার্থক নামা। যা বলার সুন্দর বলে দিলেন। একেবারে পাথরের মতো ব্যক্তিত্ব! ডঃ জয়সওয়াল যে চূড়ান্ত মদ্যপ ও লম্পট ছিলেন তা তাঁর মতো কায়দা করে কেউ বলতে পারত না।”

এবার মিস্ ঘোষ মুখ খুললেন, “কিন্তু উনি তো তেমন কিছুই বললেন না!”

“বলেছেন বৈকি!” অধিরাজ ঠোঁট টিপে হাসল, “শুরুতেই তিনি দুঃসংবাদের আশঙ্কা করলেন। তারপর স্পষ্ট জানালেন যে টিভিতে বিজয় জয়সওয়ালের ডেথ ফোরকাস্ট শুনে তিনি ‘শকড’ হয়েছিলেন। সর্বনাশিনীর ভিকটিম কারা এবং তারা কী ধরনের সেটা তিনি জানেন। তাঁর স্বামী ধোয়া তুলসীপাতা হলে তিনি ‘শকড’ই বা হবেন কেন? দুঃসংবাদের আশঙ্কাই বা করবেন কীসের জন্য?”

“তবে কি স্যার জয়সওয়াল ফ্যামিলির কেউ...?”

“অসম্ভব নয় হোরেশিও...। অধিরাজ ড্রাইভিং সিটে বসতে বসতে বলল, “কাউকেই ছাড়া যাচ্ছে না। গৌরব জয়সওয়ালের মৃত্যুটাও স্বাভাবিক কি না কে জানে! এখন সেটা আর বের করা যাবে না।”

কথাটা বলতে বলতেই সে একটু অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকায়। অর্ণব শুনতে পেল অধিরাজ আপনমনেই বলছে, “খবরিদের অ্যালার্ট করে দাও অর্ণব। এই পরিবারটার ওপরে একটু নজর রাখা দরকার। আমার মনে হয় অহল্যা জয়সওয়াল একজন রীতিমতো প্রতিভাশালিনী খুনী হতে পারেন।”

অর্ণব বিস্ময়ের ধাক্কায় কী বলবে ভেবে পায় না।

(তেরো)

"মিসেস অহল্যা জয়সওয়াল স্যার?"

মিস ঘোষের বিস্ময়মাখা প্রশ্নটা শুনে কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল অধিরাজ। তারপর বলল, "কেন নয়? মহিলার রূপটাকে ইগনোর করে একবার তাঁর চরিত্রটা দেখুন । অসম্ভব ঠান্ডা মাথার মানুষ। স্বামীর জন্য কোনও আশঙ্কা, কোনও ভয় তাঁর মুখে দেখেছেন? তিনি বঙ্কিম, শরৎ, রবীন্দ্রসাহিত্য পড়েন। দাবাও খেলেন। অত্যন্ত চতুর। তিনি যে উত্তরগুলো দিয়েছেন সেগুলো একদম আগে থেকেই ভেবে রাখা। নিখুঁত অঙ্ক কষে তৈরি করা উত্তর। একটুও বেশি নয়, একটা শব্দও কম নয়। যেন আগে থেকেই জানতেন, আমি ঠিক কী জানতে চাইব। এরকম একজন মানুষকে সন্দেহ করব না?"

"বিজয় জয়সওয়ালের ঘর সার্চ করতে বললেন না তো! তাঁর গাড়িটাকে কি খুঁজব না আমরা?"

- "পণ্ডশ্রম।" সে ভাসা ভাসা অন্যমনস্ক চোখে তাকায়, "খুনী অত সহজে ধরা দেওয়ার লোক নয়। কাল সারাদিন বুনোহাঁসের পেছনে দৌড়ে দৌড়ে একটা কথা বুঝেছি। যিনি নেপথ্যে বসে এই কাণ্ডগুলো করছেন, তাঁর মস্তিষ্কটি বাঁধিয়ে রাখার মতো। নয়তো সঞ্জীব রায়চৌধুরী, অর্জুন শিকদার আর নিশান জুয়েলার্সের মালিক বিজয় জয়সওয়ালের গাড়ি অমন বেবাক ভ্যানিশ হয়ে যায়! আকাশে গেল না পাতালে, জানাই যাচ্ছে না! সুতরাং বাঁধা গতে তাঁকে ঘায়েল করা অসম্ভব।"

"লোকটাকে একবার দেখুন স্যার। কী বদখত দেখতে!এরকম লোকের মরাই উচিত।"

গাড়িতে উঠে বেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসেছিল অর্ণব। অহল্যা জয়সওয়াল সম্পর্কে অধিরাজের মন্তব্য শুনে কয়েক মুহূর্ত্ থম মেরে ছিল। এখন ডঃ বিজয় জয়সওয়ালের ছবিটা দেখে বলে ওঠে, "ঠিক যেন একটা থলথলে সীল! ওর মুখ দেখলেই বোঝা যায় — লোকটা এক নম্বরের - বজ্জাত।"

অধিরাজ গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বলল, "তুমিও তো ডঃ চ্যাটার্জীর মতো কথা বলতে শুরু করলে দেখছি! লোকের মুখ দেখেই যদি চরিত্র বোঝা যেত তবে পুলিসের সবার আগেই

ডঃ চ্যাটার্জীকে গ্রেফতার করা উচিত। কিন্তু সুন্দর মুখের পেছনেও একটা নৃশংস খুনী থাকতে পারে। অহল্যা জয়সওয়ালকে সন্দেহ করছি, তার মানে এই নয় যে তাঁর সুন্দরী পুত্রবধূরা খুনী হতে পারে না।"

অর্ণবের চোখের সামনে শিনা আর রাধিকার অপূর্ব সুন্দর মুখ ভেসে ওঠে। সে জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে অধিরাজের দিকে তাকায়।

- "আমরা রিয়া আর প্রিয়া বাজাজের অ্যাঙ্গেল নিয়ে আগেই ডিসকাস করেছি। এবার আরেকটা অ্যাঙ্গেলও দেখে নাও।" অধিরাজ গাড়িটাকে ডঃ জয়সওয়ালের বাড়ির লোহার গেটের বাইরে বের করে এনেছে, "ডঃ জয়সওয়াল, যাঁর রীতিমতো লম্পট হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাঁর বাড়িতে দু দুটি যৌবনবতী নিখুঁত সুন্দরী পুত্রবধূ! তার মধ্যে একজন আবার বিধবা আর কী অদ্ভুত ব্যাপার দেখো, সুন্দরী বিধবা পুত্রবধূটিকে নিয়েই তিনি আবার ট্যুরে যান! ব্যাপারটা গোলমেলে মনে হয়নি তোমার?"

"রাধিকা জয়সওয়ালের সঙ্গে বিজয় জয়সওয়ালের কোনও সম্পর্ক? মানে শ্বশুর ও বৌমার মধ্যে প্রেম?" -

"এমনই হয়েছে তা বলিনি। তবে সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। আমি পসিবিলিটির কথা ভাবছি। এমনও হতে পারে রাধিকাকে ডঃ জয়সওয়াল ব্যবহার করছিলেন। সুতরাং সে বিরক্ত হয়ে শ্বশুরকে যমালয়ে পাঠাতে চাইতেই পারে।" অধিরাজ অর্ণবের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল, "ঠিক একই কারণে শিনা জয়সওয়ালও খুন করতে পারে। হয়তো ডঃ জয়সওয়ালের –"নাল্পে সুখমস্তি!" রাধিকাকে ছেড়ে শিনার দিকেও হাত বাড়াতে পারেন। খেপে গিয়ে হয়তো শিনাই শ্বশুরমশাইকে একেবারে স্বর্গে ট্রান্সফার করার তাল করেছে। আবার দুই পুত্রবধুর সঙ্গে লটঘট করার জন্যঅহল্যা জয়সওয়াল অসহ্য হয়ে স্বামীকে পটলক্ষেত দেখাতেই পারেন! সব মিলিয়ে এমনও হতে পারে যে এত কাণ্ড কীর্তি শুধু বিজয় জয়সওয়ালকে মারবার জন্যই করা হয়েছে! তিনিই আসল টার্গেট! তার আগে সঞ্জীব রায়চৌধুরী আর অর্জুন শিকদার শুধুমাত্র সর্বনাশিনীর সিরিয়াল কিলিং ইমেজকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়েই মারা পড়েছেন।"

"কিন্তু এরা কেউই বোটানিস্ট নন।"

- "তাতে কী?" সে বলল, "অহল্যা জয়সওয়াল অতীতে ডাক্তার ছিলেন। বিষ এবং তার প্রতিক্রিয়া, ডোসেজ, এসব জানেন নিশ্চয়ই। শিনা মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ। তারও নির্ঘাৎ ফার্মাসিতে ডিগ্রি আছে। এম ফার্ম বা বি ফার্ম। সে বিষ সম্বন্ধে জানতেই পারে। অন্তত রোহিপুল জাতীয় নানারকম ড্রাগের সম্বন্ধে ভালো জ্ঞান তো আছেই।"

"কিন্তু রাধিকা? সে তো বায়োকেমিস্ট!"

– "বায়োকেমিস্ট ঠিকই।" অধিরাজ সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল, "কিন্তু কোন ফিল্ডে কাজ করে সেটা জানো কি? অহল্যা বলেছিলেন রাধিকা ল্যাব সামলায়। কীসের ল্যাব সামলায় সে? বায়োকেমিস্ট্রিতে একটা ফিল্ড আছে যাকে টক্সিকোলজি বলে। সেখানে নতুন নতুন বিষের ওপর ইনভেস্টিগেশন আর তার অ্যান্টিডোট তৈরি করা হয়। আমাদের কেসে বিষটা কী, এখনও ফরেনসিক বুঝতেই পারছে না! সুতরাং সেটা নতুন কোনও বিষ হওয়ার চান্সই বেশি। এক্ষেত্রে রাধিকা যদি টক্সিকোলজির সঙ্গে যুক্ত হয় তবে হাতের কাছে নিত্যনতুন বিষ পাওয়ার সম্ভাবনাকে অগ্রাহ্য করা যাচ্ছে না।"

অর্ণবের মাথা বোঁ বোঁ করতে শুরু করেছে। এরকম কনফিউশনে কনফ্যুসিয়াস সে কখনও হয়নি। মানসী জয়সওয়াল বোটানিস্ট, অহল্যা ডাক্তার, রাধিকা টক্সিকোলজিস্ট কিনা কে জানে, শিনা মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ! এরা সবাই খুনী হতে পারে। এদিকে রিয়া বাজাজ আর প্রিয়া বাজাজকেও ছাড়া যাচ্ছে না। তারাই বা কী খিচুড়ি পাকিয়ে বসে আছে কে জানে! অন্যদিকে ডঃ বিজয় জয়সওয়ালের টিকিটির খোঁজও পাওয়া যাচ্ছে না! লোকটা কি আদৌ বেঁচে আছে! তদন্ত যে এখনও সম্পূর্ণ অন্ধকারে।

তার মনের অবস্থা আন্দাজ করেই অধিরাজ রহস্যময় হাসল, "সব গুলিয়ে যাচ্ছে নাকি অর্ণব? তাও তো আমাদের জয়সওয়াল ফ্যামিলির খুনীশ্রী উপাধি পাওয়ার যোগ্য আরেকটি দাবিদারকে এখনও দেখোনি!" অর্ণব আবার বিষম খেল, "আরও একজন আছে।"

"অফকোর্স। ডঃ জয়সওয়ালের মেয়ে সুপর্ণা জয়সওয়ালকে তো আমরা দেখিইনি! তিনি আবার ক্রাইম রিপোর্টার! অপরাধীর কাজগুলো দেখো। স্পষ্টই বোঝা যায় যে পুলিসের প্রত্যেকটি পদক্ষেপ সে আগে থেকেই জানত। আমরা ডিপার্টমেন্টের লোকের

কথা ভাবলাম, ক্রাইম শো'র দর্শকের কথা ভাবলাম, কিন্তু ক্রাইম রিপোর্টারের কথা ভাবিনি! অথচ একজন ক্রাইম বিটের জার্নালিস্ট পুলিসের গতিবিধি, তদন্ত পদ্ধতি সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো জানে! নিজের পেশার খাতিরে প্রচুর কেস স্টাডি করেছে সে। পুলিসের প্রত্যেকটি পদক্ষেপ নিজের চোখে দেখেছে। ক্রাইম স্পটে সবসময়ই তার উপস্থিতি অনিবার্য। ক্রিমিনোলজি সে গুলে খেয়েছে। এইরকম একজনের সঙ্গে খুনীর চরিত্র যথেষ্টই খাপ খায়।"

"তাহলে তার সঙ্গেও তো দেখা করা দরকার ছিল।"

-"দরকার নেই।" অধিরাজ সামনের দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচায়, "যদি আমার ভুল না হয় তবে ঐ তিনি আসছেন! সামনের সিংহবাহিনীকে দেখো।"

গাড়িটা ডঃ বিজয় জয়সওয়ালের বাড়ি থেকে কিছুটা এগিয়ে গিয়েছিল। অর্ণব দেখল উলটোদিক থেকে একটা সিংহের মতো তাগড়াই বাইক আসছে। তার ওপরে বসে আছে এক শক্তপোক্ত চেহারার কৃষ্ণাঙ্গী। সে চমকে ওঠে। এ তো সেই কৃষ্ণাঙ্গী রিপোর্টার! যে জিজ্ঞাসা করেছিল, বিজয় জয়সওয়ালের ডেথ ফোরকাস্টটা প্র্যাঙ্ক কি না!

- "আরে! এই মেয়েটা!" বিস্ময়ের পাহাড় ভেঙে পড়ল অর্ণবের মাথায়,—"এ তো সেই হসপিটালের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল না?"

"কোনও সন্দেহ নেই তিনিই।" সে মুচকি হাসল, "ডঃ বিজয় জয়সওয়ালের কন্যে। বাপের চেহারার সঙ্গে যথেষ্টই মিল আছে।" মিস ঘোষ উত্তেজিত, "ধরব স্যার?" -

"একদম না।" সে গাড়িটাকে সাইড করতে করতে বলল, "জাস্ট একটু দেখে আসুন তিনি কোথায় ঢুকছেন। অর্থাৎ ডঃ জয়সওয়ালের বাড়িতেই ঢুকছেন কিনা।"

"ওকে স্যার।"

বাইকটা সবেগে গাড়িটাকে কাটিয়ে গেল। মিস ঘোষ যেন সেই অপেক্ষাতেই ছিলেন। সে চলে যেতে না যেতেই তড়াক করে গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে চিতাবাঘের মতো ক্ষিপ্রগতিতে তার পেছনে দৌড়লেন। অধিরাজ সামনের আয়নাতে তার চেজ দেখে প্রশংসায় চোখ নাচায়, "একদম লেপার্ড! পুরো বাঘিনী!"

কমপ্লিমেন্টটা শুনে অর্ণবের মুখ হাঁড়ি হয়ে যায়। অধিরাজ তার ভাবান্তরটা লক্ষ্য করে কুলকুল করে হেসে ফেলল। হাত বাড়িয়ে তার পিঠ চাপড়ে দিল সে, "তোমার চান্স এখনও আসেনি বস। নয়তো তুমিও কিছু কম যাও না।"

অধিরাজের স্পর্শ পেয়ে অর্ণব আশ্বস্ত হওয়ার বদলে আঁৎকে ওঠে, "এ কী! আপনার তো জ্বর হয়েছে!"

- "তা একটু হয়েছে।" অধিরাজ হাত সরিয়ে নিয়ে বলল, "চিন্তার কিছু নেই। দু একটা প্যারাসিটামল পড়লেই ঠিক হয়ে যাবে।"

একটু জ্বর! সার্টের উপর দিয়ে যেভাবে গায়ে ছ্যাঁৎ করে উঠল, তাতে কমসে কম একশো দুই ফারেনহাইট তো হবেই। এমনকী তার চেয়েও বেশি হলেও অবাক হবে না অর্ণব। তার মুখে চিন্তার ছাপ পড়ে।

"আপনি আজ রেস্ট নিন স্যার।" অর্ণব সস্নেহে বলে, "আমরা আপনার কথামতো তদন্ত চালিয়ে যাব।"

– "হবে না।" সে আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল, "রুটিন ইনভেস্টিগেশনে কিচ্ছু হবে না। কিছু হওয়ার নয়। প্রায় আটানব্বই ঘণ্টা হতে চলল আমরা ইনভেস্টিগেশন করছি। আটানব্বই ঘণ্টা অর্ণব! এর মধ্যে ঠিকুজি কুলুজিসহ ক্রিমিনাল ধরাও পড়ে যায়। কিন্তু আমরা একটা গাড়িই খুঁজে পাচ্ছি না!"

"নিশ্চয়ই পাবো।" অর্ণব মৃদু স্বরে বলল, "একটা আস্ত গাড়ি তো লোপাট হয়ে যেতে পারে না! অবশ্য যদি হিস্ট্রিশিটারগুলো মিথ্যে না বলে থাকে।"

"মিথ্যে বলছে না। অত টর্চারের পরও যখন মুখ খুলছে না, তখন হয়তো সত্যিই কিছু জানে না।" অধিরাজ কী যেন ভাবছে, "অন্য কিছু ভাবতে হবে। খুনী গাড়িগুলোকে ডাম্প করেছে তো বটেই। কিন্তু কোথায়? কোথায় হতে পারে? সে যেভাবে একটার পর একটা অদ্ভুত স্টেপ নিচ্ছে, নির্ঘাৎ ইউনিক কিছুই ভেবেছে। আমি এখানেও একটা চমক আশা করছি। কিছু ট্যুইস্ট তো নির্ঘাৎ আছে।" -

অর্ণব অনেক ভেবেও বুঝতে পারল না যে এর মধ্যে কী ট্যুইস্ট থাকতে পারে! গাড়ি ডাম্প করার সবচেয়ে ভালো উপায় হল কোনও গ্যারাজে দিয়ে দেওয়া, অথবা মাঠে ঘাটে

ফেলে রাখা। শেষ সম্ভাবনা কোনও জলাশয়ে ফেলে দেওয়া।

সে কথা বলতেই অধিরাজ বলল, "ওসব পরিচিত পাঁয়তাড়া কষেনি সে। এমন কিছু করেছে যেটা হয়তো সাধারণ ভাবনা চিন্তার বাইরে। আমি যদি তার জায়গায় থাকতাম তবে কী করতাম! কী এমন করতাম যাতে পুলিস তন্নতন্ন করে খুঁজেও গাড়িটাকে পেত না!... কী করতাম...!"

বলতে বলতেই সে চোখ খুঁজল। ড্রাইভারের সিটে দীর্ঘ দেহটাকে এলিয়ে দিয়েছে। অর্ণব দেখল তার কপালে চিন্তার রেখা। জ্বরের তাড়সে নাক আর গাল সামান্য রক্তাভ। চোখের দীঘল পল্লবগুচ্ছ স্থিরভাবে নেমে এসেছে। ঠোঁট দুটো অল্প অল্প নড়ছে, যেন কিছু বলছে। এই ভঙ্গি চিরপরিচিত অর্ণবের। অধিরাজ এখন মনে মনে কিছু ভাবছে। তার মন এখন অজ্ঞাত অপরাধীকে তাড়া করছে। তাকে বোঝার চেষ্টা করছে।

একটা অধরা হিসাবকে মেলানোর আপ্রাণ চেষ্টা চলছে তার মনে। ভাবে', 'কী করে', 'কোন প্রক্রিয়ায়', ইত্যাদি প্রশ্ন ক্রমাগতই উঠে আসছে। এতগুলো আস্ত গাড়ি লোপাট হয়ে যায় কী করে?... কোথায় থাকতে পারে...? মাটিতে নয়, জলে নয়, গ্যারাজে নয়, স্মাগলডও হয়ান, তবে...... কোথায় আছে...? কোথায়...?

ভাবতে ভাবতেই তার মস্তিষ্কের মধ্যে বিদ্যুৎ খেলে যায়। সে ধড়মড় করে সোজা হয়ে বসে উত্তেজিত স্বরে ডাকল, "অর্ণব।" "স্যার।" -

সে অর্ণবকে আরও কিছু বলার আগেই মিস ঘোষ দৌড়তে দৌড়তে ফিরে এসেছে। হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, "বাইকটা ডঃ জয়সওয়ালের বাড়িতেই ঢুকেছে। আপনার সন্দেহ সঠিক। উনিই সুপর্ণা জয়সওয়াল।"

অধিরাজ মাথা ঝাঁকায়। এই সন্দেহটা তার আগেই হয়েছিল। এখন দেখা গেল ধারণাটা সম্পূর্ণ সঠিক। এখন যে সন্দেহটা এই মুহূর্তে সে করছে, তাও সঠিক প্রমাণিত হয় কি না সেটাই দেখার।

"থ্যাঙ্কস।" অধিরাজ হাত বাড়িয়ে ডোর লক খুলে দেয়, 'উঠে আসুন। এখন আমাদের অনেক কাজ বাকি। মনে হচ্ছে সঞ্জীব রায়চৌধুরী আর অর্জুন শিকদারের গাড়ি খুঁজে না পেলেও দুই বিজয় জয়সওয়ালের গাড়ি খুঁজে পেলেও পেতে পারি।" -

অর্ণব কথাটা শুনে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। অধিরাজ এত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কথাটা বলল যে সে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছে। এত খোজাখুঁজির পরও যা মিলল না, এখন তা পাওয়া যাবে! কিন্তু কী করে? আকাশ থেকে নেমে আসবে না পাতাল ফুঁড়ে? !

অধিরাজ গাড়ি স্টার্ট করতে করতে আপনমনেই বলল, "জিনিয়াস জিনিয়াস!"

-"কিছুই তো বুঝলাম না।" অর্ণব অবাক, "এখন কোথা থেকে পাওয়া যাবে গাড়িগুলো!"

সে গাড়ি চালাতে চালাতেই মিটিমিটি হাসছে, "এতক্ষণ সেই প্রশ্নটাই নিজেকে করছিলাম। গাড়িগুলো ঠিক কোথায় যেতে পারে! ইনফ্যাক্ট আমি তার জায়গায় থাকলে গাড়িগুলো কোথায় ডাম্প করতাম যাতে সেগুলো পুলিস খুঁজে না পায়।"

"কোথায়?" মিস ঘোষ কৌতূহলী, "এমন কোনও জায়গা আছে?"

"আছে বৈকি!" সে হেসে বলে, "ধরো পুলিস কোনও ক্রিমিনালের জন্য উঠে পড়ে তল্লাশি চালাচ্ছে। লোকটা মৃত নয়। শহরের বাইরে কোথাও যায়নি। প্রতিটা টোল-নাকা, প্রতিটা ট্র্যাফিক সিগন্যালে পুলিসি পাহারা বসে গিয়েছে। বাসস্ট্যান্ডে, স্টেশনে, এয়ারপোর্টে সাদা পোষাকের পুলিস রাউন্ড দিচ্ছে। প্রত্যেকটা লজে, প্রত্যেক হোটেলে পুলিসের শ্যেন চক্ষুর নজরদারি। খবরিরা তার ফটো সার্কুলেট করে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তবুও লোকটাকে পাওয়া গেল না!" -

"তা কী করে সম্ভব! অবশ্য যদি না লোকটা ইতিমধ্যেই ছাই হয়ে যায়, বা কয়েক ফুট মাটির নীচে কেত মেরে পড়ে থাকে!" অর্ণবের কথায় হেসে ফেলল অধিরাজ, "সম্ভব। কারণ পুলিস সর্বত্রই দেখেছে, শুধু একটি জায়গা ছাড়া।" -

"কোথায়?" অর্ণব ও মিস ঘোষ একসঙ্গেই প্রশ্নটা করে বসল। "স্বয়ং পুলিসের লক-আপ! সে মাল হয়তো অন্য কোনও ছুটকো ছাটকা কেসে বেনামে গ্রেফতার হয়েছে। শুধু কলকাতা পুলিশেরই আন্ডারে প্রায় সত্তরটার মতো থানা! গোটা পশ্চিমবঙ্গ বা বাংলায় ক'টা হবে ভাবো! এখন সমস্ত পুলিস স্টেশনের পক্ষে তো আর সব রেকর্ড, সব আসামীকে মনে রাখা সম্ভব নয়। এক একদিনে গুচ্ছ গুচ্ছ ফাইল জমা পড়ছে। একসঙ্গে আর কত মনে রাখবে! সুতরাং মিস-কমিউনিকেশনের সম্ভাবনা প্রবল। হয়তো যে মুহূর্তে

ব্যাটার হুলিয়া জারি হয়েছে, তার অনেক আগেই তিনি অন্য একটা কেসে, অন্য কোনও পরিচয়ে অন্য এরিয়ার পুলিসের হাতে ধরা পড়েছেন। পুলিস যখন বাইরে তাকে হন্যে হয়ে খুঁজছে, তখন তিনি শ্রীঘরে বসে মহা আরামে জেলের লাপসি খাচ্ছেন।"

—"তার মানে গাড়িগুলো অন্য কোথাও যায় নি!" অর্ণব চোখ কপালে তুলে ফেলেছে, "খোদ পুলিসের হেফাজতেই আছে।"

"ব্রাভো অর্ণব।" সে সম্মতিসূচক মাথা ঝাঁকায়, "ব্রিলিয়ান্ট ডিডাকশন। পুলিসের হেফাজতে আছে বলেই পুলিস খুঁজে পায়নি। তারা বাইরে খুঁজেছে। কিন্তু ভাবতেই পারেনি যে আসামী স্বয়ং তাদেরই ঘরে বসে আছে! তুমি নিশ্চয়ই জানো পুলিস শহরের পঁচিশটারও বেশি অ্যাকসিডেন্ট প্রোন জায়গায় নাইট সার্জেন্ট সিস্টেম রিক্রুট করেছে। আজকাল রাত্রে ড্রিঙ্ক অ্যান্ড ড্রাইভের জ্বালায় কলকাতা পুলিসকে ঠিক রাত এগারোটা থেকে ভোর পাঁচটা অবধি নাইট সার্ভেইলেন্স অ্যাকটিভ করতে হয়েছে। আর লক্ষ্য করে দেখো, সঞ্জীব রায়চৌধুরী, অর্জুন শিকদারও রাতেই হাওয়া হয়েছেন। জুয়েলার বিজয় জয়সওয়ালের গাড়ি ঠিক চারটে নাগাদ গেট দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ডঃ বিজয় জয়সওয়ালও রাতেই বেরিয়েছিলেন। অহল্যা জয়সওয়ালের পার্সোনাল নম্বরটা আছে না? ফোন করে জেনে নাও যে ভদ্রলোক ঠিক কখন বেরিয়েছিলেন।"

"গাড়ির মডেল আর নম্বর?" সে সোৎসাহে প্রশ্ন করে। -

"দরকার নেই।" অধিরাজ একটা বাম্পারকে খুব মসৃণভাবে কাটাল—"ছবিতে ভদ্রলোকের ঠিক পেছনেই গাড়িটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। স্টিল কালারের হোন্ডা সিটি। নম্বরটাও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।"

"ওকে।" -

অর্ণব তৎক্ষণাৎ অহল্যাকে ফোন করল। প্রশ্নটা শুনে তিনি বিস্মিত হয়েছেন কি না বোঝা গেল না। বরং বেশ নির্লিপ্তভাবেই জানালেন যে ডঃ জয়সওয়াল রাত বারোটায় বেরিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর নাকি রাত তিনটের ফ্লাইট ছিল।

কথাটা অধিরাজকে বলতেই সে স্টিয়ারিঙের ওপর একটা চাপড় মেরে বলল, "আই নিউ ইট! নিউ আলিপুর এরিয়ার মধ্যে ও আশেপাশে যতগুলো পুলিস স্টেশন আছে,

সবগুলোয় খুঁজব। আমার দৃঢ় ধারণা, পাওয়া যাবে। সেম কেস জুয়েলার বিজয় জয়সওয়ালের ক্ষেত্রেও।

বালিগঞ্জ এলাকার মধ্যে বা আশেপাশের কোনও পুলিস স্টেশনেই নির্ঘাৎ দাঁড়িয়ে রয়েছে গাড়িটা। আমরা সব জায়গা খুঁজেছি, শুধু পুলিস স্টেশনগুলোতেই খুঁজিনি।"

"কিন্তু রাতেই বেরোতে হবে কেন?" -

"সিম্পল। রাতে লোকের চোখে ধরা পড়ার চান্স কম।" অধিরাজ উত্তর দেয়, "ধরো রাতের অন্ধকারে কোথাও একটা অ্যাক্সিডেন্ট হল। অ্যাক্সিডেন্ট মানে কোনও মানুষ মারার কেস নয় কিন্তু। এমন অ্যাক্সিডেন্ট যেটা অন্য কারোর দেখার চান্স নেই। যেমন কোনও গাছে ঠুকে দেওয়া, বা ডিভাইডারে, ল্যাম্পপোস্টে জোরে ধাক্কা খাওয়া। এইরকম। কারণ গাছ বা ল্যাম্পপোস্ট তো সাক্ষী দিতে যাবে না। বলাই বাহুল্য সেখানে সিসিটিভি নেই বা সিসিটিভি থাকলেও তার রেঞ্জের সামান্য বাইরে অ্যাক্সিডেন্টটা ঘটেছে। গাড়িটাকে ফেলে ভয়ের চোটে চালক ধাঁ। শুনশান রাস্তায় কেউ দেখার বা শোনার নেই। এবার যেহেতু রাতের বেলায় ট্র্যাফিকের বালাই নেই, ১১টা থেকে ৫টার মধ্যে নাইট সার্জেন্ট সিস্টেম আর নাইট সার্ভেইলেন্স অ্যাকটিভ আছে, সেহেতু গাড়িটা পুলিসের নজরে পড়তে বাধ্য। এবার পুলিস এসে দেখল যে একটা ড্যামেজড কার দাঁড়িয়ে আছে! চালক নেই, কাগজপত্র নেই, এমনকি হয়তো নাম্বারপ্লেটও নেই। পুরো বেওয়ারিশ! পুলিস তখন কী করবে?"

"গাড়িটাকে তখনই সিজ করবে। নিয়ে থানায় দাঁড় করিয়ে রাখবে।ওটা আস্তে আস্তে গাড়ির ভিড়ে হারিয়ে যাবে। শেষপর্যন্ত যদি কেউ ক্লেম না করে তবে হয় বিদ্যাসাগর সেতুর কাছের ডাম্পইয়ার্ডে ডাম্প করবে, নয়তো একটু বেটার কন্ডিশনে থাকলে অকশনে বেচে দেবে...।" অর্ণব বলতে বলতেই থেমে গেল, "কী সর্বনাশ! এই তো মাসখানেক আগেই একটা অকশন করল কলকাতা পুলিস। সেজন্যই আপনি বলছিলেন যে সঞ্জীব রায়চৌধুরী আর অর্জুন শিকদারের গাড়ি পাওয়া যাবে না।"

- "দুরন্ত ! একদম ঠিক রাস্তাতেই ভাবছ।" অধিরাজ সপ্রশংস দৃষ্টিপাত করে, "সম্ভবত ঐ অকশনেই বেরিয়ে গিয়েছে সঞ্জীব আর অর্জুনের গাড়ি। এখন ভোল-টোল পালটে, নম্বর পালটে অন্য কাউকে সার্ভিস দিচ্ছে গাড়িগুলো। ওগুলোকে আর পাওয়া সম্ভব নয়। তবে

দুই বিজয় জয়সওয়ালের গাড়ি পাওয়া যাবে। এইজন্যই রাতের অন্ধকার দরকার ছিল। প্রথমতো, অ্যাক্সিডেন্ট করে পালিয়ে যাওয়া সহজ। দ্বিতীয়ত, রাতের বেলায় পুলিস খুব তাড়াতাড়িই গাড়িগুলোকে সিজ করে বিনা বাধায় থানায় পাঠিয়ে দেবে। দিনের বেলায় সেটা সম্ভব নয়। তখন ট্র্যাফিকের ভিড় থাকে। ঐ একটা গাড়ির জন্যই হয়তো অনেক গাড়ি দাঁড়িয়ে যাবে। লোক জানাজানি হবে। অনেক লোক গাড়িটাকে পড়ে থাকতে দেখত। সেটা সর্বনাশিনী কী করে হতে দিতে পারেন?"

"কিন্তু স্যার..." অর্ণবের ধন্দ তখনও কাটে না, "মানলাম গাড়িগুলো সিসিটিভির আওতায় আসার আগেই অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে। এখনও শহরের সর্বত্র সিসিটিভি নেই। জুয়েলার বিজয় জয়সওয়ালের বাড়ি থেকে ফার্স্ট সিসিটিভিটা বেশ দূরে। ডঃ বিজয় জয়সওয়ালের বাড়ি থেকেও যতখানি দূরত্ব, তার মধ্যেই অ্যাক্সিডেন্ট হওয়া সম্ভব। কিন্তু পুলিস তো গাড়িটাকে সিজ করে ব্রেক-ডাউন ভ্যানে করে টেনে নিয়ে তো যাবে। টেনে নিয়ে গেলে দেখতে পাব না? আমরা তো নাইট ফুটেজও দেখেছি।"

– "দেখতে তখনই পাবো যখন গাড়িটা টেনে নিয়ে যাওয়া হবে।" অধিরাজের কপালের ওপরে একগোছা চুল এসে পড়েছিল। মাথা সামান্য ঝাঁকিয়ে সেটাকে যথাস্থানে পাঠিয়ে জবাব দিল সে, "কিন্তু গাড়িটা তখনই টেনে নিয়ে যাওয়া হবে যখন ওর অন্তত দুটি চাকা অক্ষত থাকে। আমার মনে হচ্ছে এক্ষেত্রে গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে যাওয়া, বা টেনে নিয়ে যাওয়া হয়নি। ওর চারটে চাকাই পাংচার হয়ে গিয়েছিল। তাই ব্রেক-ডাউন ভ্যানে নয়, পাঞ্জাব বডি ভ্যানে তুলে ঢেকে-ঢুকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আরেকটা গাড়ির ভেতরে ঢুকিয়ে নিয়ে গেলে সিসিটিভি ধরবে কী করে? এবং যেখানে স্বয়ং পুলিসই গাড়িটাকে নিয়ে যাচ্ছে, সেখানে কারোর বাপের সাধ্য নেই যে সন্দেহ করে।"

অর্ণবের মুখটা পুরো হাঁ হয়ে যায়! কী ভয়ঙ্কর প্ল্যান বানিয়েছে অপরাধী ।

পুলিসের ঠিক চোখের সামনেই রয়েছে গাড়িটা। হয়তো গত কয়েকদিন ধরেই কোনও থানার বাইরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অথচ পুলিস সেই গাড়িটাকে কী গরুখোঁজাটাই না খুঁজেছে! ভাবতেই পারেনি যে গাড়িটা আর কোথাও নয়, তাদের হেফাজতেই রয়েছে।

সঞ্জীব রায়চৌধুরী এবং অর্জুন শিকদারের গাড়িদুটো অজান্তেই হয়তো তারাই অকশনে তুলে দিয়েছে।

'পুলিসেরও দোষ নেই!" অধিরাজ অর্ণবের মনের কথা বুঝতে পেরে হাসল, "ঐ যে বললাম, অনেকসময়ই মিস কমিউনিকেশনের কেস হয়। সঞ্জীব রায়চৌধুরী আর অর্জুন শিকদারের মৃত্যুর পর পুলিস গাড়িদুটোকে খুঁজতে ব্যস্ত হয়েছে। কিন্তু মোস্ট প্রব্যাব্লি তার অন্তত বারো থেকে তেরোদিন আগেই গাড়িদুটো পুলিসি হেফাজতে চলে গিয়েছিল। তখনও সর্বনাশিনীর কেসটা ওদের চোখে পড়েনি। তাই তেমন গুরুত্ব দেয়নি। এবারও জুয়েলার বিজয় জয়সওয়াল যেদিন নিখোঁজ হন, সম্ভবত সেদিনই তাঁর গাড়িটা সিজড হয়েছে। আমরা খবর পেয়েছি তার দশদিন পরে। স্বাভাবিকভাবেই তখন থেকেই পুলিস অ্যালার্ট হয়েছে। বাইরে খুঁজেছে। তাদের মাথাতেই আসেনি অপরাধী এরকম ভয়ঙ্কর চাল চেলে বসে আছে। শহরে প্রত্যেকদিনই গুচ্ছ গুচ্ছ গাড়ি সিজ করা হয়। সিজড কার কলকাতা পুলিসের কাছে একরকম হেডেক। একটি বিশেষ গাড়িকে নিয়ে সন্দেহ করার কোনও কারণ নেই। তারা স্বাভাবিকভাবেই সিজড কারের মধ্যে খোঁজেনি। আর ডঃ বিজয় জয়সওয়ালের গাড়ির খোঁজও পড়েনি। আমরাও কি ভেবেছিলাম যে এরকম কিছুও হতে পারে!"

—"এ তো সব ভাবনাচিন্তার উর্দ্ধে খেলছে স্যার!" শ্বাসরুদ্ধ কণ্ঠে বলল অর্ণব, "ইনফ্যাক্ট আমাদেরও মাথায় আসেনি।"

– "জিনিয়াস লেভেলের অপরাধী।" সে বিড়বিড় করে, "সিম্পলি জিনিয়াস। একদম দাবার মতো করে চাল দিচ্ছে। এ পাবলিক নির্ঘাৎ দাবা খেলে।"

সেটা আবার কী করে বোঝা গেল! অর্ণব ও মিস ঘোষ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে তার দিকে। অধিরাজ মৃদু হাসল, "একজন ভালো খেলোয়াড়ের নিয়ম হচ্ছে সবসময়ই প্রতিপক্ষের চাল বুঝে যাওয়া। অর্থাৎ । প্রতিপক্ষ কী চাল দিতে পারে, কোন স্ট্র্যাটেজিতে আক্রমণ করবে, সবটাই ভালো করে বুঝে শুনে খেলা। প্রতিপক্ষ কী ভাবছে, কী করতে পার, সেটা আগে থেকেই বুঝে নিয়ে পরপর চাল রেডি করে রাখা। ক্রাইমের প্যাটার্নটা

দেখো। অবিকল সেভাবেই এগোচ্ছে খুনী। আমি খুব আশ্চর্য হব না যদি খুনী একজন এক্সপার্ট দাবাড়ু হয়!"

"রিয়া বাজাজ বা প্রিয়া বাজাজ নিশ্চয়ই দাবা খেলতে জানে।" অর্ণব কোন লাইনে ভাবছে সেটা বুঝতে পেরেই শ্রাগ করল সে, "প্রখ্যাত দাবাড়ুর মেয়ে যখন, তখন সে সম্ভাবনাটাকেও ফেলে দেওয়া যাচ্ছে না। বাপের গুণ মেয়ের মধ্যে থাকতেই পারে। আবার অহল্যা জয়সওয়ালও দাবা খেলেন! মানসী জয়সওয়ালের ঘরেও একটা চেসবোর্ড দেখেছি আমি।" -

অর্ণব বুঝল এবার আর ছড়িয়ে ছিয়াশি নয়— ছড়িয়ে ছ'শো হল! কোথায় রিয়া বাজাজ বা তার দিদি প্রিয়া বাজাজ! কোথায় জয়সওয়াল পরিবার! আর কোথায় মানসী জয়সওয়াল!

"আরেকটা লিডও কিন্তু আছে অর্ণব।" অধিরাজ রেড সিগন্যাল দেখে ব্রেক কষল, "গোল্ডেন মুন ক্লাব। ডঃ জয়সওয়াল ওখানে যেতেন। আমাদেরও যেতে হবে। খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে সঞ্জীব রায়চৌধুরী, অর্জুন শিকদার আর জুয়েলার বিজয় জয়সওয়ালও গোল্ডেন মুন ক্লাবের মেম্বার কিনা। ক্লাবটা ঠিক কী ধরনের। মদ্যপান, পার্টি ছাড়া আর কী কী হয় ওখানে। কিন্তু তার আগে দেখি, যা গেস করছি তা ঠিক কিনা।" ঠিক বলে ঠিক! এরপর যা ঘটল তা এককথায় ভোজবাজি! অর্ণব আর মিস ঘোষ ঘটনার গতিপ্রকৃতি দেখে রীতিমতো ঘাবড়ে গেল। ইনভেস্টিগেশন যেভাবে ইউ টার্ন মারল তাতে গায়ে রীতিমতো কাঁটা দিল তাদের। এত দিন যে গাড়ির খোঁজ মিলছিল না, সেটা খুঁজতে বেশি দূর ওদের যেতে হল না। নিউ আলিপুরের পুলিস স্টেশনেই পাওয়া গেল ডঃ বিজয় জয়সওয়ালের গাড়িটা! অনেক গাড়ির ভিড়ে মুখ লুকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সেই স্টিল কালারের হোন্ডা সিটি! অধিরাজের সন্দেহই ঠিক। তার চারটে চাকাই ধ্বসে গিয়েছে। মাডগার্ডটা তোবড়ানো। যথারীতি নম্বরপ্লেট নেই! অর্ণবের মনে তবু সন্দেহ ছিল। কী করে জানা যাবে এটাই সেই গাড়ি! নম্বরপ্লেট নেই। তাছাড়া অন্য কোনও হোন্ডা সিটিও তো হতে পারে। ডঃ বিজয় জয়সওয়াল ছাড়া আর কি কেউ এই গাড়ি চড়ে না?

অধিরাজ মাথা নাড়ল, "চান্স কম। তাছাড়া যেমন মানুষ ট্যাটু করায় তেমনই গাড়িতে স্টিকার লাগানো হয়। ডঃ বিজয় জয়সওয়ালের গাড়িতে দেখো স্টিকার আছে। সামনেই একটা কালো-হলুদ রঙের লাইটনিং স্টিকার। আর এটাতেও তাই।"

সত্যিই তাই! ছবির সঙ্গে মিলিয়ে দেখা গেল অবিকল একই স্টিকার গাড়িটাতে জ্বলজ্বল করছে। কোনও সন্দেহই নেই যে এটা ডঃ বিজয় জয়সওয়ালের গাড়ি। থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার যা বললেন, তা অধিরাজেরই কথার পুনরাবৃত্তি। ছ' দিন আগে রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ নাইট সার্জেন্টরা এই গাড়িটাকে ডঃ জয়সওয়ালের বাড়ির কিছুটা দূরেই আবিষ্কার করে। দেখে মনে হয়েছিল অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। কোনও চালক ছিল না। কাগজপত্র এবং নম্বরপ্লেট না থাকার দরুণ পুলিস গাড়িটাকে সিজ করে। গাড়িটার চলার অবস্থা ছিল না বলেই অন্য একটি গাড়িতে তুলে আনতে হয়েছিল। অফিসার অসহায়ভাবে শ্রাগ করে বললেন, 'রোজ এরকম কত গাড়িই তো আসছে স্যার। গুচ্ছ গুচ্ছ আনক্লেইমড কার পড়ে আছে! এখন তো পুলিস স্টেশনকে পুলিস স্টেশন কম আর গাড়ির শোরুম বেশি মনে হয়! পুরো মগজমারি হয়ে গিয়েছে। কী করে বুঝব যে এর সঙ্গে সর্বনাশিনীর যোগ আছে?" সে অফিসারের সঙ্গে সহমত হয়ে বলল, "ন্যাচারালি। তাছাড়া আপনারা জানতেনও না। এনিওয়ে, কাইন্ডলি গাড়িটাকে আমাদের ফরেনসিক ল্যাবে পাঠিয়ে দেবেন?"

"নিশ্চয়ই। ইমিডিয়েটলি পাঠিয়ে দিচ্ছি।" অফিসার অধিরাজের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করেই চমকে উঠলেন, "এ কী! আপনার তো....... "

"আমি ঠিক আছি।" সে কঠিন স্বরে বলল, "গাড়িটা প্লিজ..."

"হ্যাঁ স্যার।"

সেখান থেকে সোজা বালিগঞ্জ চলে গেল ওরা। বালিগঞ্জ থানাতেই ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল জুয়েলার বিজয় জয়সওয়ালের গাড়ি। আর অবস্থাও একইরকম। গাড়ির সামনে গণপতির মূর্তি দেখেই চেনা গেল গাড়িটাকে। গল্পও সেই একই। কোনও হেরফের নেই। যে গাড়িটাকে এত খুঁজেও পাওয়া যায়নি সেটাকে পাওয়া গেল

ঘণ্টাকয়েকের মধ্যেই। ভারপ্রাপ্ত অফিসার কথাও দিলেন যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গাড়িটায়ে ফরেনসিক ল্যাবে পাঠিয়ে দেবেন।

অর্ণব আড়চোখে দেখল, এখানে অফিসারের সঙ্গে করমর্দন করল না অধিরাজ। তাকে দেখেও ঠিক লাগছিল না। চোখদুটো বেশ রক্তাভ হয়ে উঠেছে। নাকের ডগা লাল। এখন যেন কথা বলতেও কষ্ট হচ্ছে তার। হাঁচি হচ্ছে না, কিন্তু নাক মুছছে ঘন ঘন। জ্বরটা বোধহয় ক্রমশ উঠছে।

– "আপনি এই ব্যাপারটা বুঝলেন কী করে স্যার!" অর্ণব বিস্ময়াভিভূত, "আপনি ঠিক যা বলেছেন, তেমনই ঘটেছে। মনে হচ্ছে আপনি যেন অ্যাক্সিডেন্ট স্পটে দাঁড়িয়েছিলেন!"

"সর্বনাশিনী যা করেছে, আমিও সেটাই করছি। সে যেমন আমাদের মনস্তত্ব বুঝে বুঝে এগিয়েছে, আমিও স্রেফ তাই করছি। ব্লাইন্ড গেম খেলছি। মহিলা কেমন নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে দেখেছ!" অধিরাজ পুলিস স্টেশন থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে একটু স্খলিত, ক্লান্ত গলায় বলল, "এখন তার জন্য চাঁদেও যেতে হবে। তার ওপরে সোনালি চাঁদ! মিশন গোল্ডেন মুন।" অথচ শরীরটা -

অর্ণব প্রমাদ গুণল। কথাতেই স্পষ্ট, এ লোক থামার নয়। বোধহয় একটু বেলাগাম। নয়তো এত ক্লান্ত কখনই লাগে না তাকে। - "স্যার, আজ কি যেতেই হবে?" সে একটু আমতা আমতা করেই বলল, "মানে, আমি আর মিস ঘোষ যাচ্ছি। আপনি বরং বাড়ি ফিরে যান।

তাছাড়া লাঞ্চও তো হয়নি। আপনি কাল রাত থেকে না খেয়ে আছেন। আমাদের সঙ্গেও খাননি...।"

- "তাই তো!" অধিরাজ ঘড়ি দেখল – "ছি ছি! খেয়ালই নেই। খালি পেটে কি তদন্ত চলে! তুমি আর মিস...।" বলতে বলতেই হোঁচট খেল সে। একটু থেমে বিড়বিড় করে বলল, "মিস্ কী যেন!"

এমনিতেই অধিরাজ মহিলা অফিসারদের নাম ভুলতে ওস্তাদ। কিন্তু একটু আগেও নামটা ঠিক বলছিল সে। এর মধ্যেই ভুলে গেল! অর্ণব বুঝল, লক্ষণ মোটেই ভালো নয়।

সে শুধরে দেয়, 'মিস ঘোষ'।

"হ্যাঁ। তোমরা কোনও রেস্টোর‍্যান্টে খেয়ে নাও।"

"আপনি?"

"আমার আজ উপোস!" সে স্মিত হাসল, "খেতে ইচ্ছে করছে না। তোমরা খেয়ে নাও।"

অর্ণব বুঝল কিছুতেই এ লোককে বোঝানো যাবে না। অধিরাজ যখন ঠিক করেছে তখন সে গোল্ডেন মুন ক্লাবে গিয়েই ছাড়বে। এ বিষয়ে কারোর কোনও কথা শোনার লোক সে নয়।

"আচ্ছা!" বাধ্য হয়েই সে খুব নরম স্বরে বলল, "ড্রাইভটা তবে আমি করি?"

অধিরাজ তার দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকায়। এককথায় অপূর্ব দৃষ্টি! খানিকটা ছেলেমানুষী, একটু কৌতুক আর অনেকটা স্নেহ তার চোখে চিকচিক করছে। যেন বুঝতে পেরেছে, দুনিয়ার সব লোককে ফাঁকি দিতে পারলেও অর্ণবকে ফাঁকি দেওয়া মুশকিল! কয়েকমুহূর্ত তাকিয়ে থেকে আলতো করে তার কাঁধে হাত রাখল সে। খানিকটা যেন আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতেই বলে, "বেশ। তুমিই চালাও। আমারও শরীরটা একটু খারাপ লাগছে।"

অর্ণব হেসে মাথা ঝাঁকাল। স্যারের সঙ্গে থেকে থেকে সে অধিরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমস্ত ঘোঁৎঘাত সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। তার 'শরীরটা একটু খারাপ' মানে, বেশ ভালোই খারাপ! কিন্তু কিছুতেই স্বীকার করবে না! – "তার আগে তোমারা খেয়ে নাও, সামনেই একই ভালো রেস্টোর‍্যান্ট আছে। লাঞ্চ সেরে নাও। তারপর যাওয়া যাবে।"

অর্ণব আর প্রতিবাদ করতে সাহস পেল না। একটি কথাও না বলে মিস ঘোষকে সঙ্গে নিয়ে রেস্টোর‍্যান্টের উদ্দেশে চলে গেল। অধিরাজ গাড়িতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আপনমনেই সিগারেট ধরার। সিগারেটের ধোঁয়াটাও এখন ভালো লাগছে না। মুখটা বিস্বাদ। চোখ জ্বালা জ্বালা করছে। সিগারেটে একটা টান মারতেই বেদম কাশি উঠে এল। ফুসফুস থেকে। সে কাশতে কাশতেই বিরক্ত হয়ে হাতের সিগারেটটা রাস্তাতেই ফেলে দিল। গা গুলোচ্ছে! এখন জ্বর কত কে জানে। খিদে পেয়েছে অথচ খেতে ইচ্ছেই করছে না। কেমন যেন বমি বমি পাচ্ছে। মাথায় তীব্র যন্ত্রণা! নিঃশ্বাসে আগুনের হল্কা!

সে কাতর দৃষ্টিতে গাড়িটার দিকে তাকায়। খুব ইচ্ছে করছে পেছনের সিটে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে। মাথাটা এখন অল্প অল্প ঝিমঝিমও করছে। চূড়ান্ত ক্লান্তিতে চোখ বুঁজে আসলেও সে সজাগ থাকার চেষ্টা করে। এখনই হাল ছেড়ে দিলে হবে না। দরকার হলে ওষুধ খেয়ে নিতে হবে। উলটোদিকের ফুটপাথেই পর পর বেশ কয়েকটা ওষুধের দোকান। জ্বরের ওষুধ খেয়ে নিলেই হয়। তার চোয়াল ফের শক্ত হয়ে ওঠে। একটা জোরে শ্বাস টেনে মনে মনে বলল, "আমি ঠিক আছি... ঠিক আছি...!" অধিরাজ আর কিছু ভাবার আগেই পেটের ভেতরে তীব্র একটা মোচড়! অতর্কিতেই তীব্র বিবমিষা উঠে এল কণ্ঠনালী বেয়ে। ধাক্কাটা সামলাতে পারল না সে। ফলস্বরূপ...!

"ওঃ! গ...ড।"

(চোদ্দো)

গোল্ডেন মুনে পৌঁছতে পৌঁছতে বেলা গড়িয়ে গেল। কিন্তু সোনালি চাঁদের দর্শনমাত্রই তিন অফিসারের চোখ ব্রহ্মতালুতে! এটা ক্লাব! না ফাইভ স্টার হোটেল! কিংবা রিসর্ট! ক্লাবের গেটে সুসজ্জিত উর্দিধারী গেটকিপার সসম্ভ্রমে দরজা খুলে দিল। ক্লাবের সামনের মসৃণ বাঁধানো রাস্তার পাশে সবুজের দুরন্ত কারিকুরি। দু'পাশে গাছের বর্ডার লাইনের পেছনেই বিরাট পান্নাসবুজ মাঠ। সেখানে টেনিসকোর্ট আছে। কয়েকজন টেনিস খেলছেন। মাঠের পাশেই সার সার দামি দামি গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। একপাশে বিরাট সুইমিংপুলকে সামনে রেখে দাঁড়িয়ে রয়েছে গোল্ডেন মুন।

রাজারহাটে বেশ অনেকখানি ফাঁকা জমিকে ঘিরে বছর দেড়েক হল গড়ে উঠেছে ঝাঁ চকচকে নতুন ক্লাব। পুরো এরিয়া জুড়ে বিরাট প্রাচীর! মেইন বিল্ডিঙের পেছনে অর্ধচন্দ্রাকারে ছড়িয়ে আছে ছোট ছোট বাংলো টাইপের শৌখিন কটেজ। প্রত্যেকটি কটেজের সামনে সুন্দর ফুলের বাগান। চতুর্দিকে নানারকম গাছ দিয়ে এমন সাজিয়েছে যে তাকালেই চোখ জুড়িয়ে যায়। তাদের ঠিক কেন্দ্রেই দাঁড়িয়ে আছে আধুনিক স্টাইলের মেইন বিল্ডিং। চারতলা বিল্ডিংটাই কাচের! তার ওপরে সূর্যরশ্মি প্রতিফলিত হয়ে সোনালি আলো ঠিকরে দিচ্ছে। নীল স্যুইমিংপুলে তখনও স্যুইমিং স্যুট পরে সাঁতার দিচ্ছে কয়েকজন সুন্দরী জলপরী! সুন্দরীদের মসৃণ রেশমের মতো ত্বকের ওপরে অভ্রের গুঁড়োর মতো জলবিন্দু চিকমিক করে উঠছে। স্যুইমিং স্যুট পরা অর্ধনগ্ন দেহ জলের সঙ্গে রতিক্রিয়ায় উল্লাসে মেতেছে যেন। অর্ণব সেদিকে তাকিয়েই ব্যোমকে গিয়েছিল। অধিরাজ তার চোখের সামনে হাত দিয়ে আড়াল করে দিয়েছে, "চাঁদ দেখতে এসে আমি তোমায় দেখে ফেলেছি! ওদিকে নয় অর্ণব।"

মিস ঘোষ হেসে ফেলল, "নিসর্গশোভাও দেখা যাবে না স্যার?" –

"আপনি মনের আনন্দে দেখুন। কিন্তু অর্ণব দেখবে না।" সে ছদ্মরাগে বলে, "আমার হিংসে হচ্ছে!"

অর্ণব হেসে ফেলল। কোন কুক্ষণে যে কথাটা বলেছিল। এখন উঠতে বসতে খোঁচা খেতে হবে! অধিরাজ তার দিকে বক্রকটাক্ষে তাকিয়ে গুজগুজ করল, "স্পেশ্যাল কেউ! স্পেশ্যাল কেউ!"

স্যুইমিং পুলটা কাটিয়েই সামনে বিরাট কাচের দরজা পড়ল। দরজার ওপ্রান্তেই রিসেপশনে কমলা রঙের শাড়ির সঙ্গে ম্যাচিং কমলা রঙের লিপস্টিপ মেখে আরেক জান-লেওয়া সুন্দরী বসে আছেন। অর্ণবের আবার একই কথা মনে হয়। সম্ভবত খুনী নয়, তারা ব্রহ্মাণ্ডসুন্দরীর খোঁজই করছে।

— "মহিলা ডাকসাইটে - সুন্দরী।" মিস ঘোষ রিসেপশনের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলে।

অধিরাজ মুখে হাসলেও ভেতরে ভেতরে বেশ কষ্ট পাচ্ছিল। অর্ণবরা যখন লাঞ্চ করতে গিয়েছিল সেই ফাঁকে প্রচণ্ড বমি করেছে সে। তারপর কিছুক্ষণ নিজের পায়ে দাঁড়াতেই বেশ কষ্ট হচ্ছিল। মাথা চক্কর দিচ্ছে, সর্বশরীর যন্ত্রণায় ভেঙে আসছে। উপায়ান্তর না দেখে কোনোমতে ওষুধের দোকান থেকে প্যারাসিটামল কিনে খেয়ে নিয়েছে। এখন টেম্পারেচার নামলেও ক্রমাগতই ঘামছে। বুকের ভেতরটা অস্থির অস্থির করছে। অসম্ভব কাহিলও লাগছে। একটা সম্বৃত তন্দ্রা নেমে আসছিল চোখে। অথচ ঘুমোনোর উপায় নেই। রবার্ট ফ্রস্টের মতো তাকেও এখন ঘুমোনোর আগে অনেকদূর যেতে হবে। 'মাইলস্ টু গো বিফোর আই স্লিপ।' খুনী এখনও কয়েক যোজন এগিয়ে। তাকে ধরতে হবে।

— "এক্সকিউজ মি।" সে সুন্দরী রিসেপশনিস্টের দিকে একটা নরম হাসি ছুঁড়ে দেয়, "আমাদের কিছু জিজ্ঞাস্য ছিল।"

রিসেপশনিস্ট পূর্ণদৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকাল, "আপনারা? মেম্বার? না হতে চান?"

– "কোনওটাই না।" অধিরাজ আইডি কার্ড বের করে এনেছে, —"সি.আই.ডি, হোমিসাইড।"

নিতান্তই দুটো শব্দ। কিন্তু রিসেপশনিস্টের মুখভঙ্গি যা হল তা অবর্ণনীয়। ভয়, কৌতূহল, সতর্কতার ছাপ একসঙ্গে তার মুখে পড়ে মিলেমিশে যায়। দ্বিতীয়বার যখন সে মুখ খুলল

তখন কণ্ঠস্বরে যথেষ্ট সাবধানতার আঁচ পাওয়া গেল, "সি.আই.ডি! কিন্তু কেন স্যার? আমরা তো এখানে ইললিগ্যাল কিছু করছি না।"

অধিরাজ সে প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়ে ডঃ বিজয় জয়সওয়ালের ছবিটা তার নাকের সামনে তুলে ধরল, "ইনি এখানকার মেম্বার ছিলেন?"

মেয়েটি বেশ কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "সরি স্যার, আমি এ বিষয়ে কিছু বলতে পারব না। আপনি আমাদের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলুন।"

"হুঁ।" তার ভুরু কৌতুকে নেচে উঠল, "তাঁদের এখন কোথায় পাওয়া যাবে?" -

তরুণীটি আর বিলম্ব না করে কাকে যেন ফোন করে। ফোনে ঠোঁট বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে এক মিনিট কথা বলেই অধিরাজের দিকে তাকাল, "ওঁরা কিছুক্ষণের মধ্যেই আসছেন স্যার। আপনারা ততক্ষণ একটু বসুন।"

রিসেপশন কাউন্টারের উলটোদিকেই বসার ব্যবস্থা। লাল ভেলভেটে মোড়া সোফাগুলো এত নরম যে বসলেই প্রায় ডুবে যেতে হয়। মিস ঘোষ আর অর্ণব একটা সোফা ভাগাভাগি করেই বসল। অধিরাজ ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে একটু তফাতে। রিসেপশনিস্ট এসে জিজ্ঞাসা করল যে চা কিংবা কফি দেবে কি না । বলাই বাহুল্য, তিনজনেই সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করল। মেয়েটি ওদের দিকে একটা সন্ত্রস্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চলে যায়।

"লাঞ্চে কী খেলে?" অধিরাজ অর্ণবের দিকে তাকিয়ে ফিচেল হাসছে –"প্লিজ, বোলো না যে চাউমিন তথা হাক্কা নুডল্স খেয়েছ।" অর্ণব গোল গোল চোখ করে তার দিকে তাকায়। যাব্বাবা! ধরে ফেলেছে! -

"বুঝলেন কী করে!" মিস ঘোষ হাসলেন, "উনি ঠিক তাই খেয়েছেন! মাল্টিকুইজিন রেস্টোর‍্যান্ট ছিল। বিরিয়ানি, কাবাব থেকে শুরু করে দোসা অবধি সবই ছিল। দারুণ দারুণ থালিও! তা সত্ত্বেও উনি সব ফেলে হাক্কা নুডল্সই খেলেন!"

অধিরাজ উত্তর না দিয়ে মিটিমিটি হাসল। অর্ণব যেমন তাকে হাড়ে হাড়ে চেনে, তেমন সেও অর্ণবকে মজ্জায় মজ্জায় জানে। চাউমিন পেলে সে দুনিয়া ভুলে যায়। এমনকি এ.ডি.জি শিশির সেনের মেয়ের বিয়ের রিসেপশন পার্টিতে সে আরেকটু হলেই হায়াত রিজেন্সির হাক্কা নুডল্সের স্টক একাই শেষ করে ফেলছিল। শেষমেষ শিশির সেন স্বয়ং এসে

গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, "অর্ণব, এখানে নুডল্স ছাড়া আরও অনেক ডিশ আছে। প্লিজ সেগুলোও ট্রাই করে দেখো। নয়তো আর কেউ নুডল্স পাবে না।"

অর্ণব কিছু বলার জন্য মুখ খুলতেই যাচ্ছিল। তার আগেই অধিরাজ বলে উঠল, "ঐ দ্যাখো, ক্লাবের কর্তৃপক্ষ আসছেন। নোন ডেভিল। স্ট্রেট জেরা করা যাবে না। প্ল্যান বি। অর্ণব, সামলে।"

অর্ণব সামনের দিকে তাকিয়েই প্রায় প্রস্তরীভূত হয়ে যায়। এর চেয়ে বোধহয় ডাইনোসোর তেড়ে এলেও ভালো হত। সেই একইরকম স্লো মোশনে 'ক্যাট ওয়াক' করতে করতেই এগিয়ে আসছেন মানসী জয়সওয়াল। সঙ্গে আরেকজন 'দিলতোড়' সুন্দরী! লাল রঙের সিফন আর স্লিভলেস ব্লাউজে মানসী অপ্রতিরোধ্য। সঙ্গের সুন্দরী মফ রঙের টপলেস গাউন পরেছেন। ক্লিভেজে আর উত্তুঙ্গ স্তনে যৌবন উপছে পড়ছে। উন্মুক্ত কাঁধ আর বাহু প্রায় স্বচ্ছুই বলা চলে। মরালগ্রীবা! চুলে প্ল্যাটিনাম ব্লন্ড কালার করিয়েছেন। ঠিকই করেছেন। কারণ ওঁর মধ্যে একটা বিদেশিনী মার্কা সৌন্দর্য আছে। চোখের তারা ঘন সবুজ। গোলাপি ঠোঁট। দুধে আলতা গায়ের রঙ। তাই প্ল্যাটিনাম ব্লন্ড চমৎকার মানিয়েছে। কিন্তু অন্যান্য সুন্দরীদের মতো ঢলঢলে নন। তাঁর সৌন্দর্যে একটা বুদ্ধিদীপ্ত ধারালো ভাব আছে। ঠিক যেন শান দেওয়া সোনালি রঙের তরোয়াল।

– "নিজেকে কেমন দেবরাজ ইন্দ্র মনে হচ্ছে।" অধিরাজ উঠে দাঁড়িয়ে নীচু গলায় বলল, "কেমন চারিদিকে উর্বশী, মেনকা, তিলোত্তমা, রম্ভারা নৃত্য করছে দেখেছ?"

সে অতিকষ্টে বলল, "ইন্দৰ কিন্তু চূড়ান্ত মদ্যপ আর লম্পট ছিলেন স্যার!"

চোখ টিপল অধিরাজ, "আমিও এইমুহূর্তে ব্রহ্মচারী থাকার গ্যারান্টি দিতে পারছি না অর্ণব। তোমার হনুমান চালিসা লাগবে?" অর্ণব আড়চোখে তাকিয়ে হেঁচকি তুলে থেমে গেল। মানসী জয়সওয়াল | ততক্ষণে সামনে এসে দাঁড়িয়ে সুমধুর অথচ বঙ্কিম কটাক্ষে তাদের দিকেই দেখছেন। অধিরাজকে দেখলেই কেমন যেন মাংসাশী প্রাণী মার্কা একটা লুক দেন মহিলা। এবারও তার ব্যতিক্রম হল না। লাল টুকটুকে ঠোঁট বেঁকিয়ে বললেন, "আপনারা? স্পা করাতে এসেছেন বুঝি? না জেরা?"

অত্যন্ত বাজে রসিকতা! অর্ণবের মুখ ব্যাজার হয়ে যায়! মহিলা যতটা সুন্দরী ঠিক ততটাই বোকা! মুখ খুললেই সব সৌন্দর্য মাটি। ওঁকে মনে মনে খুনীর লিস্ট থেকে বাদ দিল সে। এত মূৰ্খ মহিলা কিছুতেই খুনী হতে পারে না!

"জেরার উদ্দেশ্যেই এসেছিলাম। তবে এখনই মাইন্ড চেঞ্জ করলাম।" অধিরাজ ভারী মিষ্টি হেসে বলে, "আপনি নিজের হাতে ম্যাসাজটা দিলে আপত্তি নেই! এমনিতেই একটু স্ট্রেসড আছি। ভাবছি একটা ম্যাসাজও নেব।"

- "ফুলবডি।"

সে চোখ সরু করে বলল, "অফকোর্স।" এবার আর আকাশ নয়, হিমালয়টাই বোধহয় টেথিস সাগরে পরিণত হয়ে অর্ণবের মাথায় ঝুপ্পুস করে পড়ল! মনে হল, একটা কোকিল বুঝি মাল্টিপল পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডারে ভুগে কাও কাও করে ডাকছে! অথবা একটা জিরাফ হয়তো ঠ্যাং তুলে এক্কা দোক্কা খেলছে। কিংবা সে নিজে একটা ব্ল্যাক হোলে ঢুকে গিয়েছে, সেখানে সোফিয়া লোরেন দোলনায় দুলে দুলে গান গাইছেন, 'পা-খি পা-খি পরদেসি-ই-ই.........।'

মানসী জয়সওয়াল একটা ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে অধিরাজের সুঠাম পুরুষালি দেহটাকে আপাদমস্তক মেপে নিলেন। অর্ণব একদম গরম হয়ে গেল। কী নির্লজ্জ মহিলা রে বাবা! অধিরাজ আবার তাঁকে হাওয়া দিচ্ছে!

"ওয়েল, মিট মাই পার্টনার, অ্যাডেলিন বাজাজ। ভেরি গুড চেস প্লেয়ার! অ্যান্ড অ্যাডেলিন, হি ইজ দ্য মোস্ট হ্যান্ডসাম অ্যান্ড বিউটিফুল ম্যান আই হ্যাভ এভার সিন। অফিসার অধিরাজ ব্যানার্জী!"

মানসী সঙ্গের মফসুন্দরীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন । অ্যাডেলিন মনে হয় কম কথার মানুষ। মৃদু হাসলেন। তারও বয়েস বোঝা দায়। পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ অবধি সবই হতে পারে। তাঁর কাঁধের দিকে তাকিয়েই আঁৎকে উঠল অর্ণব। সর্বনাশ! ইনি তো মাকড়সা সুন্দরী! একটা ভয়ঙ্কর কালো ধোঁয়া ওঠা মাকড়সা কাঁধের কাছে ঘাপ্টি মেরে বসে আছে। ট্যাটু! সুন্দরীদের চয়েস এমন খতরনাক কেন!

"কিন্তু...।" অধিরাজ একটু ন্যাকা সেজে বলল, "একটা ক্লাবে চেস প্লেয়ার আর বোটানিস্ট একসঙ্গে কী করছেন!"

"আপনাদের জন্যই আছি।" মানসী বাঁকানো হাসি হাসলেন, "ক্লাবটা মানুষের এনজয়মেন্ট আর রিফ্রেশমেন্টের জায়গা। তাই এখানে সবরকমের ফেসিলিটিস আছে। জিম, যোগা থেকে শুরু করে নানারকমের স্পোর্টস, সবই পাবেন। একদিকে স্যালোন আর স্পা আছে। ইংলিশ বার কাম মাল্টিকুইজিন রেস্টোর‍্যান্ট আছে। কনফারেন্স রুম আছে। কিছুদিন নিরুপদ্রবে বা একা কাটাতে চাইলে কটেজে থাকতে পারেন। অন্যদিকে লন টেনিস, টেবল টেনিস, বিলিয়ার্ড, ইনডোর বাস্কেট বল, বলিং গেম, সব খেলা যায়। আর প্রতি সানডে ব্রিজ গেম আর চেস টুর্নামেন্ট হয়। সানডেতে চেষ ক্লাবও বসে। আপনার কোনটা চাই?" -

অধিরাজ উত্তর না দিয়ে অদ্ভুত একটা হাসি হাসল। অর্ণবের প্রায় মাথা ঘোরার উপক্রম! এই হাসিটাকে বর্ণনা করতে গেলে একটা শব্দই বলতে হয়! মারকাটারি ! সে অবশ্য অর্ণবের দিকে দৃকপাতও না করে মানসী জয়সওয়ালের খুব কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁর কানের কাছে গিয়ে ফিসফিস করে বলল, —"আপাতত একটা কমপ্লিমেন্টারি ম্যাসাজের লোভ সামলাতে পারছি না।" মানসীও অদ্ভুত ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হাসলেন, "শিওর। আপনার কী পছন্দ বলুন?"

এইবার অধিরাজ থমকে যায়, "মানে?"

"মানে অনেকেরই অনেকরকম পছন্দ।" মানসী জানালেন, "কেউ ম্যাশ্যু পছন্দ করেন, কেউ বা ম্যাশ্যুজ পছন্দ করেন। আই মিন মেল অ্যান্ড ফিমেল। পুরুষেরা সচরাচর মেয়েদেরই পছন্দ করেন। তবে তাদের মধ্যে অনেকে আবার মেয়েদের দক্ষতার চেয়ে সৌন্দর্যকেই বেশি প্রাধান্য দেন। অনেকে কালো মেয়ে পছন্দ করেন না। সেই নিয়ে বেশ কয়েকজন সদস্য অবজেকশনও দিয়েছিলেন। তাই জানতে চাইছি, আপনার কী পছন্দ?"

সে উষ্ণ স্বরে জানায়, "আমার তো আপনাকেই পছন্দ।"

-“নটি বয়!” অবিকল কিশোরীদের মতো খিলখিলিয়ে হেসে উঠলেন মানসী, “বেশ, চলুন।”

“এক মিনিট।” অধিরাজ স্মিত হাসল, “আমার সঙ্গীরা কী করবেন? ওঁদেরও তো রিফ্রেশমেন্ট দরকার তাই না? অর্ণব খেতে খুব ভালোবাসে। আর মিস ঘোষ দাবা খেলতে ভালোবাসেন।”

অর্ণব তার ধরন-ধারণ দেখে খেপে লাল হয়েছিল। সে প্রায় খ্যাঁক করে ওঠে, মোটেও না। আমি দাবা খেলতে বেশি ভালোবাসি, আর মিস ঘোষ খেতে।”

মিস ঘোষ তার রাগ দেখে হাঁ করে তাকিয়েছিল। অর্ণবকে এমন তুমুল চটতে সে কখনও দেখেনি!

“ওকে। অর্ণব তবে মিস বাজাজের সঙ্গে দাবাই খেলো, আর মিস্ ঘোষ কিছু খেয়ে নিন।”

অর্ণব অবাধ্য ঘোড়ার মতো ফোঁস ফোঁস করে বলে, “আপনি এদিকে আসুন তো স্যার। কথা আছে।”

অধিরাজ হাসতে হাসতে মানসীর দিকে তাকায়, “কিছু মনে করবেন না। একটু স্মোক করে আসি। এটা বোধহয় নো-স্মোকিং জোন। জাস্ট গিভ মি আ সেক

-“অফকোর্স।”, মিসেস জয়সওয়াল মদির হাসলেন, “তবে একদিনই কমপ্লিমেন্টারি। নয়তো আমরা মেম্বারদের ছাড়া অন্য কাউকে সার্ভ করি না। আমি নিজে কোনও ক্লায়েন্টকে অ্যাটেন্ড করি না। মেয়েরা করে।

—“মাই প্লেজার।” সে মিষ্টি হাসল, “চলো অর্ণব। একটু ধূমপান করে। নেওয়া যাক।”

অর্ণব হুম হাম করতে করতে অধিরাজের পেছন পেছন চলল। সঙ্গে সঙ্গে মিস ঘোষও।

—“এটা কী হচ্ছে?” কাচের দরজা ঠেলে বাইরে পা রাখতেই অর্ণব প্রায় ভিসুভিয়াসের মতো ফেটে পড়ল, “আমরা এখানে জেরা করতে এসেছি, না ম্যাসাজ নিতে আর দাবা খেলতে! আপনি কি পাগল হলেন? ঐ মানসী জয়সওয়াল এক নম্বরের লুচ্চি বেগম ! ওদিকে বর হসপিটালে, এদিকে তিনি পুরুষদের ম্যাসাজ দিয়ে বেড়াচ্ছেন! আপনাকে হাতে পেলে ছাড়বেন!”

—"কে কাকে ছাড়ে? আমি একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ। কচি খোকা তো নই যে ইলোপ করবেন। যা করব নিজের মর্জিতেই করব। ঐ মহিলাকে উলটো-পালটা বলছ কেন? উনি কি আমার গলায় বকলস লাগিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন?" অধিরাজ একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, "আপাতত কাজের ওপর ফোকাস করো। অ্যাডেলিন বাজাজের সঙ্গে দয়া করে দাবাটা ভালো করে খেলো। গো হারা হেরে অন্তত নাকটা কাটিও না।"

"কিন্তু কেন? আমরা তো সরাসরিই জেরা করতে পারি!" উত্তেজিত অর্ণবকে থামিয়ে দিয়ে বলল সে, "সরাসরি কেউ কিছুই বলবে না। অন্তত মানসী জয়সওয়াল এবং অ্যাডেলিন বাজাজ থাকতে। বিশেষ করে আমাদের টার্গেট ম্যাশুয়জরা। অর্থাৎ ফিমেলরা। তাও সবাই নয়। মিস ঘোষ!"

—"স্যার?"

"এই কাজটা আপনি ছাড়া আর কেউ পারবে না। আমি এদিকে মিসেস জয়সওয়ালকে আটকে রাখছি, অর্ণব অন্যদিকে অ্যাডেলিন বাজাজকে আটকে রাখবে। আপনার পুরো ফাঁকা মাঠ। আপনি প্রথমে রেস্টোর‍্যান্টে গিয়ে চমৎকার একটা ডার্ক ফ্যান্টাসি আইসক্রিম উইথ সস অ্যান্ড চকোলেট চিপ্স খেতে চাইবেন। তারপর একটু খোঁজখবর করে জানবেন যে ম্যাশ্যজদের মধ্যে ক'জন কালো মেয়ে আছেন।"

– "ওকে স্যার।" মিস ঘোষ সম্মতিসূচক মাথা নাড়ায়।

— "আপনি স্ট্রেট সেই সব মেয়েদের কাছে জানতে চাইবেন যে এদের মধ্যে কারা ক্লায়েন্টদের হাতে অপমানিত হয়েছে। কতজন তাদের কাছে। ম্যাসাজ নিতে প্রত্যাখ্যান করেছিল। মেয়েরা আর কিছু মনে রাখুক না রাখুক, নিজেদের ইনসাল্ট খুব ভালো মনে রাখে। আমার ধারণা, একদম মনে করে বলে দেবে। এমনকি নামধাম বলে দিলেও আশ্চর্য হব না। পুলিসি কড়া ধরনের জেরা করবেন না। আপনার কমপ্লেক্সন ডার্ক। ওরা আপনাকে যাতে সমব্যথী ভাবে এমনভাবেই এগোবেন।"

অর্ণব ততক্ষণে অধৈর্য হয়ে উঠেছে, "এসবের দরকার কী? পাকড়াও করে জেরা করলেই তো হয়!"

– "হবে না।" অধিরাজ এক মুখ ধোঁয়া ছাড়ল, "মালকিনরা সামনে থাকলে কেউ নিজের ব্যক্তিগত ক্ষোভের কথা বলবে না। দেখলে না, রিসেপশনিস্ট একটা কথাও বলল না! কালো মেয়েদের রিজেকশনটা মালকিনদের কাছে প্রফেশনাল। কিন্তু ওদের কাছে পার্সোনাল। আর মানসী জয়সওয়াল এবং ক্লাবটাকে দেখে আমার কেন জানি না মনে হচ্ছে, সর্বনাশিনীর গল্পটা ঠিক এখান থেকেই শুরু হয়েছে। আমার দৃঢ় ধারণা, কেউ এই রিজেকশনটাকে পার্সোনালি নিয়ে নিয়েছে। আমি ড্যাম শিওর, সর্বনাশিনীর পেছনে কোনও কালো মেয়ের ব্যক্তিগত আঘাতের গল্প রয়েছেই। তাছাড়া ক্লাবে রিসর্ট সিস্টেম আছে। সর্বনাশিনী ও তার ভিকটিমের প্রেম ও অভিসারপর্ব এখানে জমে ওঠার সম্পূর্ণ চান্স আছে। হয়তো তিন ভিকটিমের সঙ্গে এই রিসর্টেই তিনি গোপনে ফুলশয্যা সেরেছেন! চান্সেস ফিফটি ফিফটি। তবু রিস্কটা নিতে হবে।"

অর্ণব চুপ করে যায়। বসের সঙ্গে তো আর নাকে নাক বাজিয়ে ঝগড়া করা যায় না। তার অসন্তুষ্ট মুখ দেখে হেসে ফেলল অধিরাজ, "ওরকম হাঁড়ির মতো মুখ না করে দাবায় কনসেনট্রেট কোর। ভুলে যেও না, তুমি যাঁর সঙ্গে খেলতে বসছ তাঁর সারনেম বাজাজ! বাজাজ সারনেমটা মিস কোর না। একে বাজাজ, তায় দাবাড়ু।"

– "ওঃ!" এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝল অর্ণব। নিজের বোকামিতে নিজের গালেই একটা থাপ্পড় মারার ইচ্ছে করছিল। 'বাজাজ' সারনেমটা কী করে মিস করল! তবু একটা ধন্দ কিছুতেই কাটছিল না। সে বলল, "কিন্তু ওঁর নাম তো অ্যাডেলিন!"

– "হ্যাঁ, ওটা ওনার খ্রীষ্টান নেম। কিন্তু তার আগে কী আছে সেটা কি জানো? রিয়ার ফুল নেম ছিল, রিয়া সামান্থা বাজাজ। কে বলতে পারে যে অ্যাডেলিনের পুরো নাম প্রিয়া অ্যাডেলিন বাজাজ নয়? প্রিয়ার ছবি আমাদের হাতে নেই। কিংবা তার পুরো নাম এখনও জানতে পারিনি আমরা।"

অর্ণব এবার ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পারে। কিন্তু তার জন্য সিংহীর গুহায় ঢোকা কি খুব জরুরি?- মহিলা একনম্বরের পুরুষ শিকারী!

"খেলতে খেলতে ওঁর সঙ্গে একটু খেজুর করবে। ক্লাবে কারা কারা চ্যাম্পিয়ন দাবাড়ু আছে জানতে চাইবে। উমঙ্গ অ্যান্ড বাজাজের কথা একদম তুলবে না। আমরা জানাতে

চাই না যে ঐ অ্যাঙ্গেলটার কথা আমরা জানতে পেরেছি। লক্ষ্য করবে উনি কোন্ দিকের ঘুঁটি বাছেন। সাদা না কালো? নিজেই ধমাস করে নিজের কালার বেছে নিও না। ওঁকে আগে বেছে নিতে দেবে! আর যে করেই হোক, অন্তত ঘণ্টাখানেক আটকে রেখো।"

অর্ণব সবটা না বুঝলেও সম্মত হল। মনের আশঙ্কা তবু কাটছে না। আতঙ্কিত গলায় বলল, "কিন্তু স্যার! আপনি একটু বেশি ঝুঁকি নিচ্ছেন না? মিসেস জয়সওয়াল কী প্রকৃতির মহিলা বোঝেননি!"

– "খুব ভালোই বুঝেছি। অধিরাজ শেষ টানটা দিয়ে সিগারেটটা ডাস্টবিনে ফেলে দেয়, তবে আরও একটু ভালো করে বোঝা দরকার!"

"উনি আপনাকে বরবাদ করে ছাড়বেন।"

– "ইন দ্যাট কেস...।" সে উষ্ণদৃষ্টিতে কয়েকমুহূর্ত অর্ণবের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর মৃদু স্বরে বলল, – "আমি বরবাদ হতেই চাই।"

(পনেরো)

ঘরটা আলো-আঁধারি! একটা মিষ্টি নীল আলো মৃদু নেশার ঘোর নিয়ে চলকে পড়ছে। রেশমী নরম আলো খানিকটা রহস্য নিয়ে ঝিমঝিমে তন্দ্রালু আবেশমেদুর। ঘরটার চতুর্দিকে আয়না! কাচে নীলাভ রশ্মি পড়ে তেলের মতো পিচ্ছিল ভঙ্গিতে বুঁদ হয়ে আছে। একপাশে বিরাট সাদা ধবধবে বাথটব। সুগন্ধি রঙিন জল ফুলের পাপড়ি বুকে নিয়ে স্থির। গোটা ঘর সুন্দর ফুলে সাজানো। কোথা থেকে যেন একটা সুমধুর সুর ভেসে আসছে। সব মিলিয়ে রীতিমতো নেশা ধরানো পরিবেশ।

তার ঠিক মাঝখানেই সাদা ধবধবে বিছানায় টানটান হয়ে শুয়ে ছিল অধিরাজ। একটা সাদা তোয়ালে শুধু কোমর থেকে হাঁটু আবৃত করেছে। বাকিটা অনাবৃত। এইমুহূর্তে তার নিজেকে আস্ত একটা ফুলের তোড়া মনে হচ্ছিল। তার ওপর চিলড এসির হিমেল স্পর্শ। বেশ শীত করছে। মুখে প্রকাশ না করলেও বুকের মধ্যে একটা অস্থিরতা। যখন এই রুমে ঢুকেছিল তখনই মানসী বলেছিলেন, "ধড়াচূড়ো এবার খুলতে হবে যে!"

অধিরাজের হৃৎপিণ্ড তৎক্ষণাৎ হাইজাম্প মেরেছিল। কিন্তু সে জানে যে জামাকাপড় পরে স্পা বা ম্যাসাজ হয় না। তাই স্মার্টলি নির্বিবাদে নারীটির সমস্ত কথা মেনে নিয়েছে। মানসী মোহিনী হেসে জিজ্ঞাসা করেন, "কী অয়েল দেব?"

অধিরাজ যেন প্রশ্নটার জন্য তৈরিই ছিল— "ল্যাভেন্ডার।"

কিন্তু যতই সাহসী হোক, বুকের ভেতরটা যে ঢিপঢিপ করছে। এ ভাবে নগ্নদেহে আজ পর্যন্ত কোনও মহিলার সামনে আসেনি সে। এমনকি বড় হওয়ার পর মায়ের সামনেও শার্ট খোলেনি। অথচ...!

অধিরাজ একবার ভয়ে ভয়ে বাথটবের দিকে তাকায়। এরপর কি ওটাতেও স্নান করতে হবে! তাহলে পবিত্রর ভবিষ্যদ্বাণীর অব্যর্থ হওয়া থেকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। নিউমোনিয়াতেই মরবে সে! অবশ্য তার আগেই যদি মানসী জয়সওয়ালের কৃপায় হার্টফেল না করে!

-"বিউটি!"

মানসী জয়সওয়ালের করকরে গলা এখন একদম মাখনের মতো মসৃণ। তাঁর হাত এখন অধিরাজের দেহে যত্র তত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিশেষ করে প্রত্যেকটা প্রেশার পয়েন্টে এমনভাবে স্পর্শ করছে যে অস্বস্তির চেয়ে বেশি আরামই লাগছে তার। কখনও কখনও চোখ বুজেও আসছে। কিন্তু আপ্রাণ নিজেকে সতর্ক রাখার চেষ্টা করছে সে।

মানসী জয়সওয়াল মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তার দিকে। মসৃণ বাদামী রঙের খোদাই করা ভাস্কর্যের মতো শরীর! কোথাও এতটুকু ত্রুটি নেই। ত্বক এককথায়— ফ্ল লেস! এরকম পারফেক্ট ভি শেপড চেহারা বাঙালি ছেলেদের মধ্যে খুব কমই দেখা যায়। এরকম হাইটও সহজে পাওয়া যায় না। অনেকে স্টেরয়েড নিয়ে প্রচুর চর্বিওয়ালা মাসল বানায় ঠিকই। কিন্তু সেগুলো দেখলেই বোঝা যায়, অস্বাভাবিক। কিন্তু এ চেহারার পেশীগুলো এতটাই স্বাভাবিক যে মনে হয়, এমনটাই হওয়া উচিত ছিল। কে বলে পুরুষের দেহে রহস্য নেই! সামনের পুরুষটি তো নিজেই আপাদমস্তক রহস্য! চেহারা গ্রীক ভাস্কর্যের মতো, অথচ মুখশ্রীটুকু ছেলেমানুষিতে ভরা। চোখদুটো ভীষণ ভাষাময়, বুদ্ধিদীপ্ত! কিন্তু তার মধ্যে কোথাও যেন ভীষণ ইনোসেন্স! অদ্ভুত! তিনি আরেকবার তার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "বিউটি! আপনার প্রেমিকা খুব লাকি!"

"প্রেমিকা নেই।" তার সংক্ষিপ্ত উত্তর।

– "সে কী!" মানসী বিস্মিত, আপনি ইয়ং, হ্যান্ডসাম। অথচ প্রেমিকা নেই!"

"নাঃ।"

'কেন? মেয়েদের পছন্দ নয়?"

অধিরাজ এবার হেসেই ফেলল। মহিলা এবার অবিকল তার বাবার মতো কথা বলছেন। বাবা মাঝে-মধ্যেই প্রশ্ন করেন, 'রাজা, তোর কোনও বয়ফ্রেন্ড নেই তো! তোর মুখে তো শুধু অর্ণবের কথাই শুনি! অর্ণব না হয়ে অর্ণবী হলে তবু স্বস্তি পেতাম!' মানসী সরাসরি প্রশ্নটা করেননি। কিন্তু হাবভাব তেমনই।

"কলেজে মেয়েবন্ধু ছিল। তবে প্রেমিকা ছিল না।" সে এবার একটু খেজুরে গল্পই জুড়ে দিল, "পরে তো আর সময়ই হল না!" মানসীও অবশ্য খেজুরে গল্প করতে কম ওস্তাদ নন। কিছুক্ষণের মধ্যেই অধিরাজের বাবা কী করেন, মা কী করেন, কী ডায়েটে সে অভ্যস্ত, দিনে

কত ঘণ্টা জিম করে থেকে শুরু করে তাদের বাড়ির বাসনমাজুনি কত টাকা নেয়, মোটামুটি সবই জেনে ফেললেন। নিজের কথাও কিছুটা বললেন। বাঙালি ঘরের মেয়ে। বিজয়ের সঙ্গে বিদেশেই দেখা এবং প্রেম। তারপরেই বিবাহ। অধিরাজ পরম ধৈর্য নিয়ে তার কথা শুনছে। মহিলা আপনমনেই বকছেন। তার মধ্যেই অবশ্য কী সব সযত্নে মাখিয়ে চলেছেন। প্রথম দিকে একটু অস্বস্তি বোধ করলেও কিছুক্ষণের মধ্যেই বেশ সহজ বোধ করল সে। মেয়েদের স্পর্শ কখনই সেভাবে পায়নি। তার ওপর ইনি আবার ওস্তাদ লোক। এমন এমন প্রেশারপয়েন্টে এমনভাবে স্পর্শ করছেন যে প্রবলভাবে ইন্সটিংটের বৈদ্যুতিক ঝটকা খাচ্ছে। বিশেষ করে হাতটা যখন নাভির আশেপাশে আর উরুতে চলে যাচ্ছে তখন নিজেকেই সামলে রাখা কষ্ট! তবু মুখে হাসি রেখে দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করছে।

"এত স্টিফ হয়ে যাচ্ছেন কেন?" মানসীর কুন্দশুভ্র দন্তপংক্তি ঝিলিক মারল, "রিল্যাক্স ! আপনাকে আমি খেয়ে ফেলব না! ইজি, ই-জি!" -

তাঁর কণ্ঠস্বর যেন নেশা ধরানোর মতো মধুর লাগল অধিরাজের। অদ্ভুত বিষয়! যে কড়কড়ে গলাটা প্রথম দিন শুনেছিল, এখন সেটাই অদ্ভুত শ্রুতিমধুর। তাহলে ঐ খড়খড়ানি বোধহয় বেচারি স্বামীর জন্য বরাদ্দ। - "আসলে আপনার মতো সেলিব্রিটি মহিলা নিজের হাতে ম্যাসাজ করছেন কি না! তাই হয়তো...!"

দাঁতে ঠোঁট কামড়ালেন মানসী, "রিয়েলি? তবে এটা ঘটনা কোনও ক্লায়েন্টকে আমি নিজে অ্যাটেন্ড করি না। আমার এখানে অনেক গোয়ানিজ সুন্দরী মেয়ে আছে। তারাই করে। তবে আপনার কেসটা আলাদা। আপনি আবার ম্যাসাজের নামে মেয়েদের কে জেরা করতে শুরু করবেন ঠিক নেই।" তিনি খিলখিল করে হেসে উঠলেন, "আপনাকে বিশ্বাস নেই!"

অধিরাজ ঠোঁট টিপে হাসে। সেজন্যই তো সে সেধে বাঁশটা ঘাড়ে নিয়েছে। ওদিকে মিস ঘোষ এগোল কতদূর কে জানে! সে সরলভাবেই প্রশ্ন করে—"গোয়ানিজ মেয়ে কেন?"

"কারণ তারা এসবে ওস্তাদ। গোয়ানিজ মেয়েরা ম্যাসাজ খুব ভালো করে। গোয়া তো এসব বিজনেসের জন্য স্বর্গ।" মানসী বললেন, "ইনফ্যাক্ট, আমার পাশের ফ্ল্যাটেই একটি গোয়ানিজ মহিলা থাকে। আমি নিজের ম্যাসাজ আর স্পা ওকে দিয়েই করাই। নিজেরটা

তো আর নিজেই করা যায় না। আই মাস্ট অ্যাডমিট, ও আমার থেকেও বেটার অপশন। এত সুন্দর ম্যাসাজ করে যে ঘুম এসে যায়।" -

অধিরাজ প্রসঙ্গ পালটালো। মানসী জয়সওয়াল ফের হাসলেন, "কারণ ক্লাবটা আমার নয়। আমার স্বামীর। আর ঐ যে অ্যাডেলিনকে দেখলেন না? ওর স্বামী দুবাইতে থাকে। মিঃ এ বাজাজ। বিজয় আর মিঃ বাজাজের পার্টনারশিপেই ক্লাবটা হয়েছে। মিঃ বাজাজ স্লিপিং পার্টনার। তিনি এ দেশে খুব একটা আসেন না। বিজয়েরও বিশেষ সময় নেই। তাই আমাদের ঘাড়েই দায়িত্ব চাপিয়েছে।"

"আপনার ক্লাবও যে আছে, সেটা তো আগে বলেননি।"

- "মিঃ -এ বাজাজের ফুল নেম কী?" সে সকৌতূহলে জানতে চায়।

- "আমি জানি না।" তিনি আস্তে আস্তে বলেন, "আসলে অ্যাডেলিন ব্যক্তিগত কথা খুব একটা বলে না। এমনিতেই খুব কম কথা বলে। ও কিন্তু ভারতীয় নয়। তবে কয়েক জেনারেশন ধরে এখানেই আছে। স্বামীর সঙ্গে খুব ভালো কেমিস্ট্রি নয় বলেই মনে হয়। কিন্তু দুর্ধর্ষ দাবা খেলে। চেসক্লাবটা ওই সামলায়। আপনার বন্ধুর কপালে দুঃখ আছে। অ্যাডেলিন হারতে ভালোবাসে না।"

"কপালে দুঃখ তো আমারও আছে।"

অধিরাজ মুখে কথাটা না বললেও মনে মনে ঠিক এই বাক্যটাই বলল। মুখে অবশ্য অন্য বাক্য উচ্চারণ করে, "আপনি হারতে ভালোবাসেন?" আলো-আঁধারিতে মিসেস জয়সওয়ালের হাসিটা যেন একটু বিষণ্ণ ঠেকল,—"দাবার কথা বলছেন? নাঃ আমিও হারতে ভালোবাসি না। তবে দাবার বাইরে অনেক হেরেছি মিঃ ব্যানার্জী।"

- অধিরাজ বিহ্বল দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। এ তো পরিচিত মানসী জয়সওয়ালের কথা বলে মনে হচ্ছে না! সে মহিলাকে একটু খোঁচা দেয়, -"এরকম কেন বলছেন ম্যাডাম? আপনি কলকাতার অন্যতম সফল বিজনেস-ওম্যান! স্পা আর স্যালোন বিজনেসকে আপনার মতো এমন শিল্পের পর্যায়ে কেউ নিয়ে যেতে পারেনি!"

মানসী জয়সওয়াল কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। তারপর মৃদু হেসে গভীর গলায় বললেন, "আপনার কথায় মনে হল আপনি খুব সুখী একটা ফ্যামিলি থেকে বিলং করেন! বয়েসটাও কম। তাই এসব বুঝবেন না! `সবসময়ই টাকা, সাকসেস আর বিজনেসটা বড় কথা নয়। এই ক্লাবের রিসর্টগুলোয় একদিন ঘুরে দেখে আসুন। বুঝবেন মানুষ কতটা একা আর কী ভীষণ অসুখী!"

অধিরাজ এইবার মোক্ষম সুযোগ পেয়েছে, "কেন? কী এমন হয় রিসর্টগুলোয়? আই মিন, কোনও সেক্স র‍্যাকেট.......?"

— "এ বাবা! না...না!" তিনি জিভ কাটছেন, "ইললিগ্যাল কিছু নয়। কিন্তু আমাদের ক্লায়েন্টরা সব পয়সাওয়ালা লোক। ধরুন আপনি দেখলেন যে মিঃ অমুক সঙ্গে একটি মেয়েকে নিয়ে দশ বারো দিন মহানন্দে রিসর্টে কাটিয়ে গেলেন। তার ঠিক কয়েকদিন পরেই দেখলেন, মিঃ অমুকের গিন্নী আরেকজন পুরুষকে নিয়ে এসে হাজির! মিঃ তমুক সুজানের সঙ্গে মর্ণিং ওয়াকে যাচ্ছেন তো মিসেস তমুক সুজয়ের সঙ্গে ইভনিং ওয়াকে! অনেক পুরুষ আবার বয়ফ্রেন্ড নিয়ে আসে। আবার অনেক মহিলা গার্লফ্রেন্ড নিয়ে। এখানে কিছুদিন থাকলেই বিবাহ সম্পর্কে মোহ উড়ে যাবে আপনার। কিন্তু কাকে কী বলবেন? এখন তো সবই লিগ্যাল!" অধিরাজ মনে মনে একটা হিসাব কষে নিয়ে বলল, "ক্লাবের সঙ্গে এই রিসর্টের ব্যাপারটা ইউনিক। কার মাথা থেকে বেরিয়েছে এই আইডিয়া?"

"বিজয় ছাড়া এসব আইডিয়া আর কার মাথা থেকে বেরোবে।" ভদ্রমহিলার চোখ জ্বলছে, "মানুষের সম্পর্ক, দুর্বলতা বেচে নিজের ব্যাঙ্কব্যালান্স বাড়ানোর কথা একমাত্র ওই ভাবতে পারে।" তিনি চিড়বিড় করে ওঠেন। —"বিজয়ের মানুষের সম্পর্ক, অনুভূতি নিয়ে কোনও মাথাব্যথা নেই। আমার বিজনেস, আমার ডিগ্রিতে কোনও ইন্টারেস্ট নেই ওর। ও আমার পেছনে টাকা ঢালে আমায় অ্যাপ্রিশিয়েট করার জন্য নয়, শুধুমাত্র আমায় বিজি রাখার জন্য। ও আমার সময় বেচতে চায়, কারণ ওর আমাকে দেওয়ার জন্য অনেক টাকা আছে, কিন্তু সময় নেই। ওর আমাকে দেওয়ার জন্য কিছু নেই! সময় নেই, শরীর নেই, সন্তান নেই! না-থি-ং! সেখানে আমি একটা বিশ্রি বাঁজা বুড়ি ছাড়া আর কিছু নই। আ লুজার!"

অধিরাজ একদৃষ্টে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকে। বোধহয় ঢিলটা যথাস্থানেই পড়েছে। সম্ভবত মানসী জয়সওয়ালের দুর্বলতম স্থানে! ভদ্রমহিলা একটু চুপ করে থেকেই ফের মুখ খুললেন, "আপনি আমায় ক্যারেক্টারলেস, শেমলেস, পার্ভার্টেড ভাববেন। কিন্তু সত্যি কথাটাই বলি। আপনার দেহ আমায় প্রথম থেকেই ভীষণ টানছে। কারণ বহুবছর আমি কোনও পুরুষের দেহ, স্পর্শ পাইনি। আমি নিজেকে সুন্দর করে সাজাই, কিন্তু কেউ দেখে না। সবাই আমাকে বাইরে খুব তোষামোদ করে, কিন্তু আসলে একটা 'গা রগড়ানি ঢলানি মাগী' ভাবে! আই রিপিট, 'গা রগড়ানি ঢলানি মাগী!" কথাগুলোর মধ্যে এমন একটা জ্বালা ছিল, যা অ্যাসিডের মতো কান বেয়ে জ্বালাতে জ্বালাতে চলে গেল! অধিরাজ স্তম্ভিত, হতবাক। এ কোন মানসী জয়সওয়াল! কোথায় সেই লাস্যময়ী, ছলনাময়ী! মানসী যখন ফের মুখ তুলে তাকালেন তখন তাঁর দু চোখে জল আর আগুন, দুই-ই। পাশাপাশি ঝিলিক মারল, "আপনার সহযোগীদের চোখেও সেই একই ব্যঙ্গ দেখতে পেয়েছি আমি। একমাত্র আপনিই আমায় আন্ডার এস্টিমেট করেননি। একমাত্র আপনিই...!"

এবার তাঁর চোখের কাজল গলে লম্বা কালো দাগ নিয়ে অশ্রুবিন্দুর সঙ্গে ঝরে পড়ল। এই মুহূর্তে মহিলা নিজেকে আয়নায় দেখলে আঁৎকে উঠতেন! ওয়াটার প্রুফ কাজল নয় হয়তো। তাই ধেবড়ে গিয়েছে। অদ্ভুত অসহায় অসুন্দর এবং আনসফিস্টিকেটেড ভঙ্গিতে বললেন, "কেউ বোঝে না! কেউ বুঝবে না! আমারও মন আছে! আমারও শরীর আছে! সে শরীরেও আগুন জ্বলে! ড্যা-ম ই-ট!"

অধিরাজ খুব শান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে। এই মুহূর্তে মানসীকে কুৎসিত লাগছে। তাঁর মুখে বয়সের ভাঁজগুলো স্পষ্ট। উত্তেজনায় বুকের আঁচল খসে পড়েছে মহিলার। কিন্তু এই বিজনেস-ওম্যান কোটিপতির কতটা ভিখারি তা সে খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারছে। ইনি কোটি কোটি টাকার ওপরে শুয়ে আছেন! কিন্তু সে শয্যা শরশয্যা ছাড়া কিছুই নয়! মানসী জয়সওয়াল! এইমুহূর্তে পৃথিবীর সবচেয়ে নিঃস্ব-রিক্ত মানুষ।

– "আপনি ম্যাচিওর! আপনার যৌবন আছে! সৌন্দর্য আছে! আপনার চোখ, দেবদূতের মতো! ইনোসেন্স অ্যাট ইটস বেস্ট। আমি নির্লজ্জের মতোই বলছি, ক্যান আই টাচ ইউ!"

অবিকল সর্বহারা ভিখিরির মতোই বললেন তিনি, “আপনার সুন্দর শরীরটাকে একটু স্পর্শ করতে পারি? ক্যান আই কিস ইউ? ক্যান আই হাগ ইউ? প্লিজ!”

মাথায় যেন বাজ পড়ল। এরকম মুখের ওপর কেউ বলতে পারে! অধিরাজ বিহ্বলভাবে মানসীর দিকে তাকিয়ে থাকে। জীবনে অনেক প্রেমপত্র পেয়েছে। কিন্তু এমন ভয়ঙ্কর প্রস্তাব আগে কখনও আসেনি। এই কিম্ভূতকিমাকার প্রস্তাব শুনে তার এখনই লম্ফ মেরে পালিয়ে যাওয়া উচিত। উনি তো প্রেমপ্রার্থিনীও নন, স্রেফ শরীর চাইছেন! মহিলাকে স্বৈরিণী, ব্যভিচারিণী ভেবে ঘৃণা করা উচিত। কিন্তু কোনটাই তার ভাবনার এল না। মানসী ঠিকই বলেছেন, মানুষ বড় একা! বড় দুঃখী! নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছেন বলেই কথাটা এভাবে বলতে পারলেন। প্রেমের ভান না করে প্রস্তাবটা একদম স্পষ্টাস্পষ্টি রেখেছেন। মানসীকে সে ঘৃনা করতে পারছিল না। বরং তাঁর প্রতি করুণা অনুভব করছিল।

মানসী জয়সওয়াল তার বলিষ্ঠ হাতদুটো নিজের নরম হাতে ব্যাকুলভাবে তুলে নিয়েছেন, “বেশি কিছু চাইছি না আপনার কাছ থেকে। আপনি এখানে তদন্ত করতেই এসেছিলেন। কাজ শেষ হলেই চলে যাবেন। আর কিছু আপনার মনে থাকবে না। বাট জাস্ট ওয়ান কিস... ! আমি আপনাকে ছুঁ... ছুঁতে চাই....!”

ভীষণ আবেগে থর থর করে কাঁপছেন মানসী। শেষ বাক্যটায় প্রবল আকুলতা ঝরে পড়ল। অধিরাজ আস্তে আস্তে উঠে বসল বিছানায়। মানসী তার একদম কাছে ঘনিয়ে এসেছেন। তাঁর সুগন্ধী গরম নিঃশ্বাস আছড়ে পড়ল অধিরাজের মুখে। কাঁপা কাঁপা নরম আঙুল স্পর্শ করে যাচ্ছে ধারালো মুখ, নাক, চিবুক, ঠোঁট...! যেমন একটা বুভুক্ষু মানুষ একমুঠো ভাতের দিকে তাকিয়ে থাকে, তেমনই পরম কামনায় তাকিয়ে আছেন। তিনি। অধিরাজ টের পেল তাঁর তর্জনী ঠোঁট থেকে আস্তে আস্তে গলার দিকে নামছে। ঘাড়ে, বুকে খেলা করে বেড়াচ্ছে। স্পর্শ নয়, কয়েক ভোল্টের ইলেক্ট্রিক শক!

সে একটু ইতস্ততঃ করছে দেখে মানসী যেন হতাশ হলেন। মুখ নীচু করে বললেন, “সরি, আপনাকে এসব উলটোপালটা বলা উচিত নয়। আমার। আপনি বোধহয় অনডিউটি... !”

অধিরাজ একমুহূর্তের জন্য চোখ বন্ধ করে ফেলেছে। নিজেকে কয়েক মুহূর্তের জন্য বহু বিভাজিত স্বত্ত্বা বলে মনে হল তার। একসঙ্গেই সে বিপন্ন এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ়। একটা সিদ্ধান্ত কিছুতেই নিতে পারছিল না। কিন্তু তা কয়েক সেকেন্ডের দ্বিধা মাত্র। পরক্ষণেই একটা সজোরে শ্বাস টেনে বলল, "ওকে! ডোন্ট বি আ কাওয়ার্ড!"

মনে মনে নিজেকেই মানসী জয়সওয়াল দেখলেন অধিরাজ বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। দেবতার মতো উন্নত, ঋজু মানুষটা তাঁর দিকে অদ্ভুত ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। বুকের খসে পড়া আঁচলটা সযত্নে তুলে নিয়ে তাঁকে ঢেকে দিল সে। মৃদু হেসে বলল, "ওয়েল মিসেস জয়সওয়াল, আমি বোধহয় এখন উর্দিতে নেই!"

মুহূর্তের ভগ্নাংশ সব স্থির! পরক্ষণেই বিস্ফোরণ! মানসী দু হাতের নাগপাশে তাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে পাগলের মতো চুমু খেতে লাগলেন। এলোপাথাড়ি ভাবে এক সুঠাম যুবকের সুগঠিত গলা, বুক, কাঁধের ওম শুষে নিচ্ছে তার দস্যু ঠোঁট। অবশেষে কপাল, চোখ, নাক ছুঁয়ে নরম ঠোঁটজোড়া ঠিক ঠোঁটের ওপরে এসে থমকে দাঁড়ায়। অধিরাজ দেখল, আধখোলা একজোড়া নেশাচ্ছন্ন অথচ কাতর দুটো চোখ তার দিকেই তাকিয়ে আছে। আধখোলা ঠোঁটদুটো থিরথির করে কাঁপছে। অধীর আগ্রহে চুম্বনপ্রত্যাশী।

সে আস্তে আস্তে মানসীর নরম ঠোঁটে ঠোঁট ডুবিয়ে দেয়। তিনি একেবারে অজগরের মতো তাকে জাপ্টে ধরে চিত করে ফেলেছেন বিছানার ওপরে। পাগলের মতো শ্বাসরোধী চুম্বনে পাগল করে দিচ্ছেন।

অধিরাজের চোখ আস্তে আস্তে বুঁজে এল।

(ষোলো)

ঠিক কাঁটায় কাঁটায় চারটে নাগাদ অর্ণব ব্যাজার মুখে ক্লাবের মেইন বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে আসে। বলাই বাহুল্য তার মেজাজ অত্যন্ত খারাপ। অ্যাডেলিন বাজাজের কাছে বারবার হেরে এখন নিজেকে স্রেফ টুয়ের ধ্বংসস্তূপ মনে হচ্ছে। মহিলা যতটা সুন্দরী, ঠিক ততটাই ধুরন্ধর! কোথা দিয়ে আক্রমণ করছে, কী স্ট্র্যাটেজিতে খেলছে বোঝার আগেই অর্ণব মাত। এত দুঃখ হয়েছে যে ভাবছে সর্বনাশিনীকে ডেকে বলবে, "এবার পরের পোস্টটায় আর.আই.পি অর্ণব সরকার লেখ মা আমার!" যতবার হেরেছে, মাকড়সা সুন্দরী ততবারই হেসেছেন। বলেছেন, "আপনি হাল ছাড়বেন না। তাই না?"

অর্ণব রুমালে মুখের ঘাম মুছে মৃদু হেসেছে। কৌতুকে স্বর্ণকেশীর চোখের সবুজ তারা ঝিলমিল করছিল। একটা ছোট্ট হাই তুলে বলেছেন, "বাঃ! দ্যাটস রিয়েলি গ্রেট! আপনার ধৈর্য আর চেষ্টার জবাব নেই।" আর চেষ্টা! শুধু চেষ্টাই সার হল। তবে মন্দের ভালো যে কথায় কথায় ইনফর্মেশনগুলো নিয়ে নিয়েছে। অ্যাডেলিন খুব বেশি কথা বলার লোক নন। তবু অর্ণব কায়দা করে কথাগুলো তাঁর পেট থেকে বের করতে সক্ষম হয়েছে। অ্যাডেলিন ভুল বলেননি। অর্ণবের আর কিছু না থাক, ধৈর্য আছে!

"আপনার কাজ হল?"

কাজ সেরে ততক্ষণে মিস ঘোষও বেরিয়ে এসেছে। অর্ণবকে হুঁকোমুখো হয়ে থাকতে দেখে জানতে চাইল— "ফেল মেরেছেন নাকি?"

– "টোট্যাল পনেরোবার!" সে স্যাড সং গাওয়ার মতো মিনমিন করে বলে, "একবার তো তিনমিনিটেই কুপোকাত করে দিয়েছিল। অত্যন্ত পাজি - মহিলা!"

- "পাজি নয়।" পেছন থেকে অধিরাজের গম্ভীর স্বর শোনা যায়।

সে লম্বা লম্বা পা ফেলে এদিকেই এগিয়ে আসছে, "জিনিয়াস মহিলা! মেল ইগোটা একটু কমাও।"

অর্ণব ঢোঁক গেলে। অধিরাজ সামনে এসে দাঁড়াতেই মিষ্টি ফুলের গন্ধ ওদের দু'জনের নাকে এসেই ঝাপ্টা মারল। ম্যাসাজটা তবে ভালোই হয়েছে। আর কী কী হয়েছে কে

জানে! সে আড়চোখে একবার তাকে আপাদমস্তক দেখে নেয়। আস্ত আছে তো লোকটা!

– "চলো, আপাতত এখান থেকে বেরোনো যাক।" অধিরাজ বলতে বলতেই ফের হেঁচে ফেলল, "ওঃ! মহিলা পুরো বাথটবে চুবিয়ে ছেড়েছেন!"

অর্ণব আর কথা না বাড়িয়ে ড্রাইভিং সিটে বসে গেল। সামান্য তির্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, "মিসেস জয়সওয়াল আপনাকে এগিয়ে দিতে এলেন না তো!"

কথার মধ্যে যে বঙ্কিম ভঙ্গিটা ছিল তা বুঝতে পেরে বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসল সে, "অ্যাকচুয়ালি উনি তো আমায় বাড়িতেই ড্রপ করতে চেয়েছিলেন! তুমি রাগ করবে বলে আর চান্স নিলাম না!"

বুমেরাং খেয়ে চুপ করে গেল অর্ণব। এই ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলাই বৃথা! সে প্রায় ভামের মতো মুখ করে গাড়িতে স্টার্ট দেয়।

গাড়িটা হুশ করে ক্লাবের ক্যাম্পাস দিয়ে বেরিয়ে গেল। ওরা ভালো করে দেখলে টের পেত মিসেস জয়সওয়াল দোতলার জানলা দিয়ে ওদের গাড়ির দিকেই স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। তাঁর চোখে অদ্ভুত আলো খেলা করছে।

প্রথমে অন্তত মিনিট পাঁচেক কেউ কোনও কথা বলল না। বেশ কিছুক্ষণ নীরবতার পর অধিরাজই ফের মুখ খোলে, "বলো, কী কী জানতে পারলে। লেডিজ ফার্স্ট। মিস্ ঘোষ প্লিজ।"

মিস ঘোষ বলল, "আইসক্রিম পেলাম না স্যার! বাট ইনফর্মেশন পেয়েছি।"

— "এক মিনিট।" তার ভুরু কুঁচকে গিয়েছে, "আইসক্রিম পেলেন না কেন?"

"কারণ গত দু'দিন ধরে আইসক্রিম পার্লার বন্ধ। কীসব প্রবলেম হয়েছে যেন।" মিস ঘোষ জানালেন, "রেস্টোর‍্যান্টের ম্যানেজার ঠিক করে বলতেই পারল না। আইসক্রিম পার্লারের শাটারই বন্ধ।"

– "দু'দিন ধরে বন্ধ ! সে কী!" অধিরাজ চিন্তান্বিতভাবে অর্ণবের কাঁধে হাত রাখল, "অর্ণব, একটু সাইড করে দাঁড় করাও তো! মিস ঘোষ, প্লিজ কন্টিনিউ...।"

- "আইসক্রিম না পেয়ে শেষপর্যন্ত একটা কোল্ড ড্রিঙ্ক খেয়ে মিসেস জয়সওয়ালের মেয়েদের খোঁজে গেলাম। ওখানে একটি মেয়েই কালো। স্যার। মারিয়া ডি'সেনা। প্রথমে কিছুতেই মুখ খুলছিল না। বেটিকে বারে নিয়ে গিয়ে কয়েকগ্লাস ভদকা উইথ লাইম খাওয়ালাম। তারপর কানের কাছে রীতিমতো কান্নাকাটি জুড়ে নিজের দুঃখের কাহিনী ফলাও করে শোনালাম। বাড়িতে অসুস্থ বাবা, ছোট ছোট ভাই-বোনদের দায়িত্ব, এটসেটা এটসেট্রা। ঐ বাংলা ফিল্মের প্লট আর কী!" মিস ঘোষ ফিক করে হাসল, "ওকে বললাম যে আমিও এখানে কাজ খুঁজছি। আজ মিসেস জয়সওয়াল আমায় দেখা করতে বলেছেন। পাঁচটায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট। সেই শুনে মারিয়া খচে লাল! আমায় স্ট্রেট বলল, 'এখানে তোমার আমার মতো মেয়েদের চাকরি করা মানে কাস্টমারের জুতো খাওয়া! নিজের মানসম্মান বোধ থাকলে ফোটো'!"

"ব্রিলিয়ান্ট!" অধিরাজ সপ্রশংস কণ্ঠে বলল-

"তারপরই তো ঝুলি থেকে বিড়াল বেরোল।" মিস ঘোষ বললেন, "আমাকে আর কারোর নামই নিতে হয়নি। মারিয়া খেপে গিয়ে আরও কয়েকটা পেগ মেরে সব উগরে দিল। আপনার তীর একদম বুলস্ আই এ লেগেছে স্যার। বেছে বেছে আপনার তিন মক্কেল, সঞ্জীব রায়চৌধুরী, অর্জুন শিকদার আর ডঃ বিজয় জয়সওয়ালের নামই নিল ও। সঙ্গে আরেকজনের নামও বলেছিল। কী সাম বাজাজও যেন। বলেছিল, এই ক্লাবের আরেক মালিক। ঐ লোকটাও নাকি ভীষণ অসভ্য। খুব খারাপ ব্যবহার করে। ওর ঐ তিন মক্কেলের নাম মনে আছে কারণ প্রথম দু'জনের মরার খবর টিভিতে দেখেছে। আর ডঃ বিজয় জয়সওয়াল আর ওদের মালিকের একই নাম। সর্বনাশিনীর কেসটা ও রীতিমতো ফলো করে। স্পষ্ট বলল, দু'জন মরে পৃথিবীর পাপের ভার কমিয়েছে। বাকি দুটোরও মরাই উচিত।"

- "টেরিফিক!"

-"মারিয়া আরও বলল, যে সঞ্জীব, অর্জুন আর বিজয়কে ও ম্যাসাজ দিতে গিয়েছিল। তিনজনেই ভয়ঙ্কর হল্লা করেছিলেন। মানসী জয়সওয়ালকে রীতিমতো অসুবিধেয় পড়তে হয়েছিল। ওঁরা এমন সিনক্রিয়েট করেছিলেন সবার সামনে যে প্রায় গোটা ক্লাবই কেসটা

জেনে গিয়েছে। আর মিঃ বাজাজ কয়েকদিনের জন্য দুবাই থেকে এসেছিলেন। মারিয়াকে দেখলেই নাকি গালিগালাজ করতেন। বলতেন, "এই কালো বিড়ালটা এখানে কী করছে? মোমপালিশ নাও মানসী, ভার্নিশ নিয়ে কী করব?"

—"গ্রেট!" অধিরাজ একটু অন্যমনস্ক হয়ে বলে, "তার মানে এই তিনজনই যে এই ক্লাবে আসতেন, এবং রীতিমতো সুন্দরীদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করতেন, সেটা এখন প্রতিষ্ঠিত সত্য। এবং এই তিনজনই কালো মেয়েদের ওপর বিতৃষ্ণা প্রকাশ করেছিলেন।"

"বিতৃষ্ণা মানে! প্রচণ্ড অপমান করেছিলেন ওঁরা মেয়েটিকে।" মিস্ ঘোষ রীতিমতো উত্তেজিত, "মারিয়ার কথা শুনে তো আমারই রাগ হয়ে গিয়েছিল। সামনে থাকলে তিনটেকেই কষিয়ে থাপ্পড় মারতাম।"

—"চারটেকে। মিঃ বাজাজও আছেন যে!" অধিরাজ সংযোজন করল।

-"ঠিক।" মিস ঘোষ জানাল, "মারিয়া এটাও বলল যে ঐ তিন পাবলিক প্রায়ই কোনও এক মুসলিম মেয়ের সঙ্গে রিসর্টে এসে বেশ কিছুদিন থাকতেন। তবে মেয়ে বা মহিলা কে তা ও দেখেনি বা জানে না। কারণ তিনি বোরখা পরে আসতেন। আর রিসর্টগুলো সব সেলফ হেল্প প্রসেসে চলে। নিজস্ব কিচেন আছে। ফ্রিজে সবরকমের খাদ্যই মজুত। ইচ্ছে করলে বোর্ডাররা নিজের রান্না নিজেরাই করে নিতে পারেন। মিনিবারও আছে। তা না করলে নিজেদের ক্লাবের ডিনার টাইমে এসে খেয়ে যেতে হবে। বিছানার দশটা ফ্রেশ চাদর বেডরুমের কাবার্ডে থাকে।

সয়েলড চাদরটা ফেলার জন্য প্রত্যেকটা রিসর্টেই লন্ড্রী বাস্কেট অথবা বোর্ডাররা নিজেরাই কেচে নিতে পারেন। সে ব্যবস্থাও আছে। এমনকি বোর্ডারদের নামও লেখা হয় না। অর্থাৎ বোর্ডারদের প্রাইভেসি রক্ষা করার জন্য একদম বজ্র-আটুনি ব্যবস্থা স্যার। মারিয়া কেন, কোনও কর্মীর পক্ষেই বোঝা সম্ভব নয় যে কার সঙ্গে কে আসছেন! বুঝতেই পারছেন রিসর্টে কী চলছে!"

—"তা পারছি।" তার মসৃণ কপালে ভাঁজ পড়ে, "দুই মৃত ব্যক্তির মাঝখানের এই লিঙ্কটা পুলিস বুঝে ওঠেনি। হয়তো ভিকটিমদের স্ত্রী'রা কর্তাদের সোনালি চন্দ্র অভিযানের কথা জানতেন না! অথবা জানলেও ক্লাবটা ঠিক কী জাতীয় সে সম্পর্কে একেবারেই

ধারণা নেই। তবে এখন কোনও সন্দেহই নেই যে সর্বনাশিনীর বেস অব অপারেশন এই গোল্ডেন মুন ক্লাব অ্যান্ড রিসর্টস। এখানেই তাদের পূর্বরাগ। এবং কোনও হোটেল বা রেস্টোরান্ট নয়, এটাই তাদের মিলনের জায়গা। এবং সঞ্জীব ও অর্জুন মৃত্যুর আগে এখানেই ছিলেন। বাড়ি থেকে বেরোবার সময়ই ফোন অফ করে দিয়েছেন বলে এই লোকেশনটা শো করেনি ফোন ডিটেলসে। গ্রেট।" অধিরাজ স্মিত হাসল, "এবার অর্ণব বলো।" অর্ণব বিরসবদনে বলল, "আমি আর কী বলব স্যার। পনেরোবার হেরেছি।"

- "তুমি যে হারবে তা আমি আগেই জানতাম। ওটাও প্রতিষ্ঠিত সত্য।" সে হাসছে, "বাকি খবর কী?"

"এখানে প্রতি সানডে তে চেসক্লাব বসে স্যার। অ্যাডেলিন বাজাজও কখনও সখনও খেলেন। তবে আমি মহিলাকে একট খচিয়েই দিতে চেয়েছিলাম। বলেছিলাম, আপনার থেকেও ভালো খেলোয়াড় নিশ্চয়ই আছে এখানে। উনি রেগেমেগে বললেন, "একমাত্র অহল্যা জয়সওয়াল আর অর্জুন শিকদার ছাড়া আর কেউ আজ পর্যন্ত তাকে চ্যালেঞ্জও করতে পারেনি, হারানো তো দূর। আমি বিশ্বাসই করছিলাম না। মহিলার যে ভয়ঙ্কর ইগো, তা বুঝতে পেরেছিলাম বলে একটা ধাক্কা দিয়েছিলাম। তাতেই তিনি রেগে লাল হয়ে আমার মুখে টুর্নামেন্টের স্কোরশিট প্রায় ছুঁড়ে মারলেন। আমি সুযোগ বুঝে অহল্যা জয়সওয়াল আর অর্জুন শিকদারের খেলার বেশ কয়েকটা স্কোরশিট ঝেড়ে দিয়েছি। অ্যাডেলিনের সঙ্গে ঐ দুই প্লেয়ার জিততে পারেননি। ড্র করেছেন। তবে অর্জুন শিকদারকে অহল্যা জয়সওয়াল বেশ কয়েকবার বলে বলে হারিয়েছেন। অহল্যা গুরুদেব খেলোয়াড় স্যার।"

"ব্রেভো অর্ণব।" অধিরাজ তার পিঠ চাপড়ে দেয়, "পুরো বাঘের বাচ্চা। কাজ তো অনেকদূর এগিয়ে রেখেছ বস।" অর্ণব প্রশংসা পেয়ে গদগদ হয়ে প্যান্টের পকেট থেকে চার পাঁচটা স্কোরশিট বের করে এগিয়ে দেয় অধিরাজের দিকে। অধিরাজ স্কোরশিটগুলোয় নজর বোলাতে বোলাতেই বলে, "অ্যাডেলিন কোন কালারে খেলছিলেন? ব্ল্যাক না হোয়াইট?"

– "হোয়াইট স্যার।" -

– “প্রত্যেকবারই ?”

– “একদম। আপনার কথামতোই আমি ওঁকে বেছে নিতে দিয়েছি। এবং উনি প্রত্যেকবারই সাদা বেছেছেন।”

অধিরাজের দু চোখে গভীর আত্মমগ্নতা। সে সংক্ষেপে উত্তর দিল, “হুম। সেটাই স্বাভাবিক। কারণ নিয়মমাফিক সাদাই প্রথম চাল দেয়। কালো তার পরে।”

“আরও একটা অদ্ভুত খবর আছে স্যার, জানি না কতটা কাজে লাগবে। অর্ণব একটু আমতা আমতা করে, “একটু পিকিউলিয়ার!”

“বলে ফেলো।”

—“আমি অহল্যা জয়সওয়াল সম্পর্কে বলতেই অ্যাডেলিন বললেন, ‘ন্যাস্টি ফ্যামিলি। মেয়েটা কালো কুচ্ছিত! পুরুষ না মহিলা বোঝাই যায় না। একটা বৌ শ্বশুরের পেছন পেছন ঘোরে, আরেকটা লেসবিয়ান, একখানা মুসলিম মেয়েকে গার্লফ্রেন্ড বানিয়ে ঘুরছে।”

“অ্যাডেলিনের জিভটা বেশ কড়া দেখছি! কায়দা করে তোমাকে কেচ্ছা শুনিয়েছেন।” অধিরাজ গম্ভীরমুখে বলে, “কিন্তু শিনা জয়সওয়ার যে লেসবিয়ান তা উনি জানলেন কী করে? শিনা ওঁকেই প্রেম নিবেদন করেছেন নাকি?”

- “ভগা জানে” অর্ণব মৃদু হাসল, “পনেরোবার হারার জন্য ফাউয়ে সংবাদ দিয়েছেন! তবে অহল্যার ওপর খার আছে।” “সেটাই স্বাভাবিক। কারণ অহল্যা ওঁর থেকেও ভালো চেস প্লেয়ার।” সে স্কোরশিটগুলো দেখতে দেখতেই বলে, “অর্জুন শিকদার ও কিন্তু মারাত্মক দাবাড়ু। যে দুটো খেলায় জিতেছেন, তার স্কোরশিট দেখলেই বুঝবে ব্রিলিয়ান্ট প্লেয়ার! অথচ যতবার অহল্যার সঙ্গে খেলেছেন, ততবারই গো হারান হেরেছেন। উনি হোয়াইটে খেলছিলেন। অহলা ব্ল্যাক। মুভগুলো দেখো! পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে একটুও মন দিয়ে খেলেননি।”

“কেন?”

– “হয়তো একটু বেশিই টেনেছিলেন।” অধিরাজ আচ্ছন্ন স্বরে বলল, —“শুধু একটা প্রশ্নের উত্তরই পেলাম না। মিস্ ঘোষ আইসক্রিম কেন খেতে পারলেন না?”

– "হ্যাঃ!"

বিস্ময়সূচক শব্দটা উচ্চারণ না করে পারল না অর্ণব। সর্বনাশিনী একা কি কম মগজমারি ছিল যে আইসক্রিম প্রবলেমও এসে জুটেছে! সে ইতস্ততঃ করে বলে, "হয়তো আইসক্রিম মেশিন খারাপ!"

"দু' দিনের জন্য। - এরকম একটা ক্লাবে দু' দিনের জন্য মেশিন খারাপ আর কেউ কোনও স্টেপ নেয়নি। আর তাছাড়া আইসক্রিম মেশিন কেন? এসব ক্লাবে আলাদা ডিপ ফ্রিজার থাকে আইসক্রিম রাখার জন্য। সেখান থেকে স্কুপে তুলে সার্ভ করা হয়। আমি মিস ঘোষকে ডার্ক ফ্যান্টাসি আইসক্রিম উইথ সস অ্যান্ড চকোলেট চিপ্স খেতে বলেছিলাম। ওটা ফ্রিজার থেকে বের করেই দিতে হবে।" সে ঠোঁট কামড়ে এক মিনিট ভাবল। তার ভুরুতে ফের চিন্তার ভাঁজ। একটু চুপ করে থেকে বলল, "অর্ণব, তুমি গোল্ডেন মুন ক্লাবের ফোন নম্বরটা নোট করেছ?"

- "ইয়েস স্যার। দাবার স্কোরশিটেই ছিল। আমি সেভ করে নিয়েছি।" - "গুড জব। ফোন মারো দেখি। একটা জিনিস একটু কনফার্ম করে নিই।"

—"ওকে।"

অর্ণব গোল্ডেন মুন ক্লাবের নম্বরে ফোন করে। সম্ভবত রিসেপশনের ফোন নম্বর। কিছুক্ষণ রিং হওয়ার পরেই ও প্রান্তে জাগ্রত হল এক নারীর কণ্ঠস্বর, —"গুড ইভনিং, গোল্ডেন মুন ক্লাব।"

অর্ণব একটি শব্দও না করে তৎক্ষণাৎ ফোনটা হস্তান্তর করে দেয় অধিরাজের কাছে। সে ফোনটা নিয়ে অদ্ভুত একটা টোনে বলল, "হ্যালো, হিন্দুস্থান রেফ্রিজারেশন প্রাইভেট লিমিটেড থেকে বলছি। আপনাদের ডিপ ফ্রিজার ফের খারাপ হয়েছে? এত ঘনঘন খারাপ হয় কেন আপনাদের ডিপ ফ্রিজার! এই তো কয়েকদিন আগেই ঠিক করে দেওয়া হল! সাতদিনও হয়নি!"

রিসেপশনের মেয়েটি জবাব দিল, "না স্যার। আপনার ভুল হচ্ছে। সাতদিন তো দূর, গত ন'মাসের মধ্যে আমাদের ডিপ ফ্রিজার একবারও খারাপ হয়নি।"

"ন' মাস আগে তো হয়েছিল?" অধিরাজ প্রায় ধমক দিয়ে বলে—"ঠিক কি না ম্যাডাম?"

ওপ্রান্ত হকচকিয়ে গিয়ে বলল, "হ্যাঁ স্যার। কিন্তু...।"

– "হোয়াট কিন্তু? এক বছরের কমপ্রিহেন্সিভ ওয়ারান্টি পিরিয়ড! এর মধ্যে দু বার খারাপ হল! ফ্রিজের মধ্যে ঢুকে কি চোর পুলিশ খেলেন আপনারা! নাকি ওটাকে আলমারি হিসাবে ব্যবহার করছেন!"

"বিহেভ ইওরসেলফ।" ওদিক থেকে মহিলাও কড়কে উঠলেন, "ফর ইওর কাইন্ড ইনফর্মেশন, দু বার নয়, তিনবার খারাপ হয়েছে! আপনারাই বা এমন কী সারাচ্ছেন যে একবছরের মধ্যে থার্ড টাইম ফ্রিজ খারাপ হল! অথচ আগের দুবার আপনারাই বলে গেলেন যে ফ্রিজের কিস্যু হয়নি! এই আপনাদের সার্ভিস? ওদিকে আমাদেরই ধমকাচ্ছেন। লজ্জা করে না?"

– "ঠিক আছে, ঠিক আছে। কাল ফার্স্ট আওয়ারেই লোক পাঠাচ্ছি।" অধিরাজ হেসে জিভ কাটল! এই রে! তিনবার খারাপ হয়েছে, দু বার নয়। সে আর কথা না বাড়িয়ে ফটাস করে ফোন কেটে দেয়। তার যা জানার ছিল, জানা হয়ে গিয়েছে।

"কী হল স্যার?"

মিস ঘোষের প্রশ্নের উত্তরে অধিরাজ মুখ কাঁচুমাচু করেছে, "রিসেপশনে মেয়েটি সিম্পলি ঝেড়ে দিল। তবে যা বলার বলে দিয়েছে। আইসক্রিম পার্লারের ডিপ ফ্রিজার এখনও পর্যন্ত দু'বার নয়, তিনবার বিগড়েছে। আর কোম্পানির লোক আগের দু'বার বলেছে ফ্রিজারের কিছু হয়নি।"

—"তাতে কী হল?" অর্ণব অবাক, "ক্লাবের আইসক্রিম পার্লারের সঙ্গে আমাদের কেসের সম্পর্ক কী?"

অধিরাজের মুখ থেকে ছেলেমানুষী ভাবটা মুছে গিয়ে একটু চিন্তার ছাপ ফুটে ওঠে, "কিছুই না। পুরো প্রব্যাবিলিটির ওপর খেলছি অর্ণব। যেমন খুনী আমাদের স্টেপ বুঝে এগোচ্ছে, তেমন আমিও তার মাইন্ড রিড করার চেষ্টা করতে করতেই চেজ করছি। এ খেলাটা পুরো দাবার ছকের মতো হচ্ছে।"

—"কিন্তু ক্লাবের ফ্রিজের খারাপ হওয়ার সঙ্গে খুনীর কী রিলেশন?" অর্ণব হতভম্ব।

- "ওকে। বুঝিয়েই বলছি।" অধিরাজ সিগারেটের প্যাকেট থেকে ইন্ডিয়া কিংসের স্টিক বের করে আনে, "আমরা এখনও পর্যন্ত যত প্রব্যাবিলিটি পেয়েছি তার একটা সাম-আপ করা যাক। আমরা বুঝতে পারছি যে আমাদের তিন মক্কেলের ভেতরের অন্যতম যোগসূত্র - গোল্ডেন মুন ক্লাব অ্যান্ড রিসর্টস। সম্ভবত এখানেই তাঁরা অজ্ঞাত কোনও নারীর সঙ্গে ফূর্তি করতে আসতেন। এই রিসর্টগুলো বানানোই হয়েছে এই কারণে। পুরো চান্স আছে পটল তোলার আগের মুহূর্তেও তাঁরা হয়তো এখানেই ছিলেন। বিশ্বজিত বলছিল যে সর্বনাশিনী আনসিকিওর্ড হটস্পট ইউজ করছে। এখানেও কিন্তু আশেপাশেই আনসিকিওরড হটস্পট আছে। আমার মোবাইল অন্তত দু'বার এরকম ওপেন কানেকশন ক্যাচ করেছে। আমার মনে হচ্ছে, যা ঘটছে, এখানেই ঘটছে। যদিও সেটা এখনও প্রতিষ্ঠিত সত্য নয়, এবং আরও কিছু প্রশ্ন রয়েছে যার উত্তর পাইনি। সত্য প্রতিষ্ঠা পেলে তখন প্রশ্নগুলো উঠতে পারে। কিন্তু চান্স তো আছেই। এই অবধি বোঝা গেল?"

অর্ণব আর মিস ঘোষ মাথা নাড়ল।

অর্থাৎ তারা বুঝেছে। -"এইবার আসি সঞ্জীব রায়চৌধুরী আর অর্জুন শিকদারের লাশের প্রসঙ্গে। শুরু থেকেই আমি ফরেনসিক রিপোর্টে একটা লাইন মিস করছি। টাকলুও কিন্তু লাইনটা বলেনি। অথচ বলা উচিত ছিল।" অর্ণব আর মিস ঘোষের মুন্ডু পরস্পরের দিকে ঘুরে গেল। কী এমন জিনিস যা ফরেনসিক রিপোর্টে লেখা নেই!

- "সঞ্জীব রায়চৌধুরীর বডি ডাম্প করা হয়েছিল ঝোপের মধ্যে।" অধিরাজ রিং বানাতে বানাতে বলে, "অর্জুন শিকদারকে আবর্জনার স্তূপে। একজনের মৃত্যু হয়েছে চারদিন আগে, অন্যজনের পাঁচদিন। অথচ বড়ি একটুও ডিকম্পোজড হল না! চারদিন যদি কোনও বডিকে ফেলে রাখা হয় তবে সামান্য পচন ধরবে, দুর্গন্ধ হবে। কিন্তু দু'জনের ক্ষেত্রে তা হয়নি। কেন? তবে খুনী এমন কোনও জায়গায় বডিটাকে রেখেছিল, যেখানে মৃতদেহ চট করে নষ্ট হয় না। সেটা কোনও মর্গ বা প্রাইভেট মরচুয়ারি হতে পারে না! মর্গে রাখতে হলে ডকুমেন্টস লাগে। মরচুয়ারিতে রাখলে বডি এম্বাম করা হয়। কিন্তু বড়িতে এম্বামিং

লিকুইড বা ফ্লুইড পায়নি ফরেনসিক। তবে এতদিন বডিটা এমন কোথায় ছিল যাতে ডিকম্পোজডই হল না! ফরেনসিকের স্যাম্পল নিতে কোনও সমস্যাই হয়নি!”

অর্ণবের চোখ বিস্ফারিত— ‘ফ্রিজ'।

- “যা তা ফ্রিজ নয়। এমন ফ্রিজ যেটা এয়ারটাইট! ময়েশ্চার নেই। বড়িতে কোনওরকম বরফকুঁচি ছিল না। অর্থাৎ ভেতরে জল ছিল না।

সচরাচর এই ধরণের ক্লাবে আইসক্রিম যে ফ্রিজগুলোয় রাখা হয় সেই ডিপ ফ্রিজগুলো আকারে বিরাট বড় হয়। আর সেখানে সিস্টেমটাই এমন যাতে আইসক্রিমগুলো গলে না যায়, অথবা বরফ না জমে। সচরাচর মাইনাস নাইন্টিন ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে আরও বেশি ঠান্ডা করতে পারে এই জাতীয় ডিপ ফ্রিজার। মৃতদেহ রাখার সবচেয়ে ভালো জায়গা। কী অবস্থা দেখো, গত দুদিন ধরে ক্লাবের রেস্ট্যোরান্টে আইসক্রিম পার্লার বন্ধ! শুধু তাই নয়, ন'মাস আগেও আইসক্রিম পার্লারের ডিপ ফ্রিজার কাজ করছিল না, আর ঠিক তখনই অর্জুন শিকদারের বডি পায় পুলিস। এখানেই শেষ নয়, একবছরে তিনবার বিগড়েছে গোল্ডেন মুন ক্লাবের ডিপ ফ্রিজার, আব একবছরে তিনটে লোকের ওপরই সর্বনাশিনীর কোপ পড়েছে। পুরোটাই কোইনসিডেন্স মনে হচ্ছে? আরও মজার কথা আগের দু বার কোম্পানির লোক বলেছে ফ্রিজে কোনও ডিফেক্ট নেই! আমার দৃঢ় বিশ্বাস এবারও তাই বলবে।” সে একটা ভারী নিঃশ্বাস ফেলল, “প্রথম গেমটা বোধহয় হারলাম আমরা। ডঃ বিজয় জয়সওয়ালকে জ্যান্ত পাওয়ার বোধহয় কোনও চান্স নেই!” অর্ণব টের পেল তার শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসছে। মাথা থেকে পা পর্যন্ত যেন হিম হয়ে গেল। গায়ের লোমগুলো খাড়া হয়ে গিয়েছে। সাংঘাতিক! কী সর্বনেশে কাণ্ড ! একটা মানুষকে মেরে ডিপ ফ্রিজারে রেখে দিচ্ছে! এ শয়তান না রাক্ষসী!

—“স্যার, তাহলে এখনই আইসক্রিম পার্লার থেকে বের করে আনতে পারি না বডিটা?” সে উত্তেজিত, “রেড করলেই তো হয়! ”

– “অন হোয়াট গ্রাউন্ড?” অধিরাজ বিষণ্ন হাসল, এটা এখনও থিওরির পর্যায়ে আছে। এখনও পর্যন্ত কোনও আনএথিক্যাল জিনিস বা ইললিগ্যাল কাজের সন্ধান পাইনি। রেড

কী করে করব? আর যদি রেডও করি, তবে লাশটা হয়তো পাবো। কিন্তু খুনীর কোনও লিঙ্ক পাওয়া যাবে না।”

“তবে?” মিস ঘোষ উত্তেজিত, কিছুই ধরতে পারব না?”

– “অবশ্যই পারব।” সে শান্তভাবে জবাব দেয়, “তবে হাতে নাতে ধরতে হবে। সপ্রমাণ। আমার মনে হয় না এটা কোনও একজন লোকের কাজ। একজন নারী একটি লোককে ভালোবাসার নাটক করে বিষ দিয়ে মারতে পারে। টেক-এক্সপার্ট হলে হ্যাকিংও করতে পারে। কিন্তু এরকম লম্বা চওড়া পুরুষমানুষগুলোকে ঘাড়ে করে ফ্রিজারে ঢোকানো, সেখান থেকে বের করা, তারপর অনেক দূরে গিয়ে ডাম্প করা, উঁহু, কোনও সুন্দরী তন্বীর কাজ নয়, যদি না সেই সুন্দরীর নাম মালেশ্বরী, মেরি কম, গীতা-ববিতা ফোগাত বা সাক্ষী মালিক না হয়!”

– “সঙ্গে কোনও পুরুষ আছে।” অর্ণব স্বগতোক্তি করে।

– “ডেফিনিটিলি।” সে মিস ঘোষের দিকে তাকায়, রেস্টোর‍্যান্টের ম্যানেজারের চেহারা কেমন?”

“রীতিমতো লম্বা-চওড়া স্যার।” মিস ঘোষ জানাল, “মুষকো বলা যায়।”

অধিরাজ মিষ্টি হেসে অর্থপূর্ণভাবে শ্রাগ করে। অর্ণবের আর তর সয় না—“লোকটাকে ধরে উলটো করে পেটালে হয় না?”

-“একটু অপেক্ষা করো অর্ণব।” সে স্মিত হাসল, “সবসময় হুমহাম করলে চলে না। পকড়েঙ্গে জরুর, পর থোড়ি সি নজাকত সে! ইনি তো রানির বোড়ে মাত্র। রানিকে ধরতে হবে না?”

“কীভাবে?”

“ইজি। আমরা যদিও এ যাত্রা ম্যাসাজ করে, দাবা খেলে ক্ষান্ত দিয়েছি, কিন্তু প্রতিপক্ষ এতক্ষণে জেনে গিয়েছে যে পুলিসের নজর পড়েছে এখানে। আজ কিছু করিনি। কিন্তু কাল করব না, তার গ্যারান্টি কী? পুলিসকে জনগণ অতটা বিশ্বাসও করে না।” সে সুখটান মেরে খুব ক্যাজুয়াল ভঙ্গিতে বলল, – “অতএব রিস্ক নেবে না। বডি আজই

ডাম্প করবে বলেই আমার ধারণা। এখন থেকে লাগাতার ফিল্ডিং দেবো। ক্যাচ কট কট হতে বাধ্য। আজ যদি নাও করে, কাল তো করবেই।” “কিন্তু যদি তা না হয়!”

অধিরাজ কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে চুপ করে থেকে বলল, তাহলে বুঝব আমার থেকে সর্বনাশিনীর বুদ্ধি অনেক বেশি। নার্ভ আর মনের লড়াইয়ে হার স্বীকার করে এই কেস থেকে হাত তুলে নেব।” অর্ণব আর মিস ঘোষ ফের দৃষ্টি বিনিময় করল। তাদের দু'জনের চোখে সংশয়। রাতে কি আদৌ কিছু ঘটবে? যদি না ঘটে? যদি খুনী অন্য কোনও দিক দিয়ে মাত দিয়ে বেরিয়ে যায়...!

- “আপাতত প্রথম কাজ...।” গাড়ির সিটের তলা থেকে ফরেনসিক কিট বের করতে করতে বলল অধিরাজ, “মিস ঘোষ, আপনি আমার স্কিনের কিছুটা স্যাম্পল নিয়ে নিন। এখান থেকে আপনাকে আমি ট্যাক্সিতে তুলে দিচ্ছি। আপনি স্ট্রেট ফরেনসিক ল্যাবে চলে যান। সেখানে আপনি ডঃ অসীম চ্যাটার্জীকে স্যাম্পলটা দিয়ে দেবেন...।” সে কথা শেষ করতে না করতেই তার মোবাইল ফোন বেজে উঠল। আড়চোখে মোবাইলের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়েছে অধিরাজ, “নাও। শয়তান কা নাম লিয়া, ঔর শয়তান হাজির! কী টাইমিং বুড়োর!”

অর্ণব মুখ ঘুরিয়ে হাসি চাপে। ডঃ চ্যাটার্জীর যে কত নাম ! দুর্বাসা, টাকলু, শয়তান, বুড়ো, ফুটবল, জাবুলানি, গ্লোব, আরও কত কী!”

“হ্যালো!” অধিরাজ ফোনটা ধরতে না ধরতেই ও প্রান্ত থেকে ভেসে এল বুড়োর চিৎকার, “এতক্ষণ ধরে ফোনে ট্রাই করছি, কোন জাহান্নামে গিয়েছিলে শুনি?”

-“গোল্লায় গিয়েছি ডক।” সে ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল, “চতুর্দিকে কেশবতী কন্যে, মেঘবরণ চুল দেখে পাগল হয়ে গেলাম!”

ডঃ চ্যাটার্জী রেগে লাল হয়ে প্রায় নাচতে নাচতে বললেন, “খবর্দার আমার টাক নিয়ে কোনও কথা নয় বলছি।”

অধিরাজ নিরীহ মুখ করেছে, “যাব্বাবা! টাকের কথা আবার কখন বললাম! আপনি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই একই রেকর্ড বাজাবেন দেখছি।”

– "সত্যি করে বলো, আমার নামটা স্ক্রিনে দেখে অর্ণবকে একবারও বলোনি যে টাকলু ফোন করেছে!"

"ইশশশ!" দেবদাস ফিল্মের ঐশ্বর্য রাইয়ের মতো লজ্জা লজ্জা ভঙ্গিতে বলল সে, "তাই কী বলতে পারি? ছি ছি! তোবা তোবা!"

"তুমি যে কী বলতে পারো, আর কী করতে পারো সে আমার ভালোই জানা আছে।" বুড়ো খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠেছে, "এখন জরুরি কথাটা শোনো। আহেলি একটা জিনিস বের করেছে...।"

"আমি কর্ণময়! বলুন।"

আহেলির আবিষ্কারের কথা ডঃ চ্যাটার্জী সবিস্তারে অধিরাজকে বললেন । সে খুব মন দিয়ে প্রত্যেকটা কথা শুনল। বেশ কয়েকবার হুঁ হাঁ করল। তারপর শান্তভাবেই বলল, "তার মানে চেরি রেড কালারের ভিনাইল স্যাটিন ফিনিশ ইমালশন ডোর পেইন্ট?"

—"হ্যাঁ। ডঃ চ্যাটার্জী বললেন, "ঐ চেরি রেড কালারের দরজার পেছনে কিছু না কিছু রহস্য তো আছেই। খোঁজ করো। পেয়ে যাবে।"

– "গ্রেট ! গ্রে...ট জব ডক!" সে গম্ভীর, "আহেলির একটা চকোলেট প্রাপ্য রইল। আর আপনার জন্য আদিদাস টেলস্টার এইট্টিন!" ডঃ চ্যাটার্জীর কণ্ঠস্বর সন্দিগ্ধ, "সেটা কী!"

"ওটা বিগত বিশ্বকাপের বিখ্যাত ফুটবল।" অধিরাজ ঠোঁট টিপে হাসছে।

আদিদাস নয়, ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ চটে পুরো কালিদাস হয়ে লম্ফ মারলেন,—"ইঁদুর, বাদুড়, পাষণ্ড, পা...জি কোথাকার! তোমায় এরপর কোনোদিন আমি নিজের হাতেই খুন করব! বদমাশ ছোঁড়া...!"

তিনি হাঁউমাউ করে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। তার আগেই তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলল সে, "ওকে ডক। লাফালাফি না করে প্রয়োজনীয় কথাটা শুনুন।"

– "তোমার একটা কথাও শুনছি না আমি! ব্ল্যাকমাম্বা, গডজিলা, কিংকং, কদাকার বুনিপ একটা!"

ডঃ চ্যাটার্জী কোনও কথাই শুনবেন না। অর্ণব আর হাসি চাপতে পারছিল না। এই দু'জনের চিরকালই হিন্দুস্তান-পাকিস্তান সম্পর্ক! সবসময়ই দাঙ্গা লেগেই আছে। অধিরাজ

কিছুতেই ডঃ চ্যাটার্জীর পেছনে লাগা ছাড়বে না। আর ডঃ চ্যাটার্জী ফুটবলের নাম শুনলেই ক্ষেপে যাবেন। যদিও ও রাগ বেশিক্ষণ থাকার নয়। অর্ণব জানে, অধিরাজ ঠিক পটিয়ে পাটিয়ে বুড়োকে লাইনে এনেই ফেলবে। সে প্রচুর হাওয়া, তেল, মাখন মাখিয়ে বুড়োকে ঠিক ভেজাবেই।

"আমার কথা শুনুন ডক।" অধিরাজ নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল, "আপনাকে মিস্ কাটামুণ্ডুর কসম্!"

অর্ণব হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। এই মিস কাটামুণ্ডুটা কে? ডঃ চ্যাটার্জীকে তার দিব্যিই বা দেওয়া হচ্ছে কেন? আর আশ্চর্যের ব্যাপার ডঃ চ্যাটার্জী ও সঙ্গে সঙ্গে শান্ত হয়ে গেলেন। একটু ঠান্ডা হয়ে বলেন, "আচ্ছা, কী বলবে বলো।"

"আপনাকে একটা স্কিন স্যাম্পল পাঠাচ্ছি।" অধিরাজ সিরিয়াস, "তার মধ্যে ল্যাভেন্ডার অয়েল আছে। একটু মিলিয়ে দেখুন তো সেই অয়েলটা অর্জুন শিকদারের স্কিনে পাওয়া অয়েলটার সঙ্গে ম্যাচ করছে কি না। আমার জানা দরকার দুটো ল্যাভেন্ডার অ্যারোমা অয়েলই এক কি না।"

"ফাইন, পাঠিয়ে দাও ।"

"রিপোর্টটা আজ রাতেই পেলে ভালো হয়।" সে মাথা চুলকে বলল,—"একটু তাড়া আছে।"

"হয়ে যাবে।" ডঃ চ্যাটার্জী ফোঁস ফোঁস করে বললেন, "আর ওঁর নাম মোটেও মিস কাটামুণ্ডু নয়... মিস...।"

— "জানি।" অধিরাজ মুচকি হাসে, "আপাতত এখানেই সমাচার সমাপ্ত। রাতে কথা হচ্ছে।"

ডঃ চ্যাটার্জী লাইন কেটে দিলেন। অধিরাজ দ্রুত ও অভ্যস্ত হাতে নিজেই নিজের হাত থেকে খানিকটা স্কিন স্যাম্পল নিয়ে যত্ন করে এভিডেন্স ব্যাগে সিল করে রাখল। তারপর মিস ঘোষকে এভিডেন্স ব্যাগটা দিয়ে বলল, —"আপনার এখন দুটো কাজ মিস ঘোষ। প্রথমতো, এই স্কিন স্যাম্পলটাকে। ডঃ চ্যাটার্জীর হাতে পৌঁছে দেওয়া। দ্বিতীয়ত, মেরিলিন প্ল্যাটিনাম হাউজিঙে তদন্তের নাম করে ঢোকা।"

. “তদন্ত! কিন্তু একা একা অতবড় বিল্ডিং সার্চ করব কী করে?” মিস্ ঘোষ বলল, “তার জন্য একটা গোটা টিম লাগবে…।”

“উঁহু! সার্চ নয়।” সে বুঝিয়ে দেয় “নিজের আই ডি কার্ড দেখিয়েই ঢুকবেন। কিন্তু কোনও সার্চ অপারেশন করতে হবে না। বরং গোটা বিল্ডিংটা ভালো করে দেখবেন। শুধু এইটুকু খুঁজে বের করতে হবে যে মেরিলিন প্ল্যাটিনামে কোন কোন ফ্ল্যাটের দরজা ‘রেড চেরি’ কালারের। আর পেইন্টটা সাধারণ নয়। স্যাটিন ফিনিশ ইমালশন পেইন্ট। একদম মখমলের মতো মসৃণ ঝকঝকে রঙ।”

“আমি স্যাটিন ফিনিশ পেইন্ট চিনি স্যার। কোনও অসুবিধে হবে না।”

- “ফাইন। আপনি শুধু নোটিস করবেন যে কোন কোন ফ্ল্যাটের দরজায় রেড চেরি কালারের স্যাটিন ফিনিশ পেইন্ট আছে। এবং সেটা আমাদের ফোনে জানিয়ে দিয়ে চুপচাপ ওখান থেকে কেটে পড়বেন। আজকের জন্য এইটুকুই। আর কিছু করার আপাতত দরকার নেই।”

—“ওকে।”

নিজের দায়িত্ব বুঝে নিয়ে চলে গেল মিস ঘোষ। অধিরাজ নিজেই তাকে ট্যাক্সিতে তুলে দিল। অর্ণবের মাথায় তখনও অনেক কথা ঘুরঘুর করছে। সে ফিরে আসতেই জিজ্ঞাসা করল, “স্যার, এই মিস কাটামুণ্ডুটা কে? কী বিটকেল সারনেম!”

—“অ্যাকচুয়ালি…।” ছেলেমানুষের মতো হাসল অধিরাজ…… ওঁর পদবী কাটামুণ্ডু নয়। অন্য কিছুই। আমিই ভুলে গিয়েছি। তবে ইনি হচ্ছেন আমাদের টাকলুর পহেলা পহেলা প্যায়ার!”

“অ্যাঁ!” অর্ণব আরেকটু হলেই ফেইন্ট হয়ে যাচ্ছিল, “কিন্তু সে তো দীপিকা পাড়ুকোন ছিলেন। বদলাল কখন?”

“দীপিকা পাড়ুকোন ক্রাশ।” সে হাসছে, “চোখে দেখেই শান্তি। কিন্তু ইনি বুড়ঢার হৃদয়েশ্বরী। ডঃ চ্যাটার্জীর হৃদয়ে এখন কাটামুণ্ডুর নাচ চলছে।”

- “তিনি কে? কী করেন? ডঃ চ্যাটার্জীর সঙ্গে দেখা হল কোথায়? - কবে হল? কী করে…!”

-“ধীরে বন্ধু ধীরে!...” অধিরাজ অর্ণবের অস্থিরতা দেখে মিটমিট করে হাসে, “তিনি সাম্প্রতিক কালের একজন থ্রিলার রাইটার। আনম্যারেড। তাঁর গল্পে যত ভুলভাল কাণ্ড ঘটে। থ্রি-ডি ইমেজ দেখে লোকে 'ভূত ভূত' করে চেঁচায়! এমনকী একজন লোকের মাথায় একটা চিপ বসিয়ে তাকে হিপনোটাইজডও করা হয়! ড্রাগন-ড্রাকুলা, ওয়্যার উলফ, কী নেই। ওসব থ্রিলার পড়তে হলে ব্রেইনটা খুলে রেখে পড়তে হবে। যাই হোক, ডঃ চ্যাটার্জী সেই ভয়ঙ্কর থ্রিলারের ধাক্কাতেই কুপোকাত! এমন নেশা হয়েছে যে এখন লেখিকার ফোন নম্বর খুঁজে বের করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। ভাগ্যিস বুড়ো ফেসবুক করে না। নয়তো জানতে পারত যে যাঁকে হন্যে হয়ে খুঁজছেন, তিনি ফেসবুকে সগৌরবে বিরাজমান।”

“সে কী!” অর্ণবের চক্ষু চড়কগাছ, “দেখতে কেমন? আপনি দেখেছেন?” -

“দেখেছি বৈকি! টাকলুর প্রেম বলে কথা। দেখতে তো হবেই।” সে বলল, “সত্যি বলছি অর্ণব, একদম কার্পেথিয়ার দুর্গ থেকে আমদানি করা ব্র্যান্ড নিউ ভ্যাম্পায়ারনি মার্কা দেখতে। ‘ঘচাং ফু, খাবো তোকে' অ্যাটিটিউড। ফোনে সেভ করে ডঃ চ্যাটার্জীকেও দেখিয়েছিলাম। দেখে বুড়ো আরও মজেছে। স্বাভাবিক! ব্রহ্মপিশাচ লেডি ভ্যাম্পায়ারই সেটা পছন্দ করবে। বিটকেল লোকের চয়েস বিটকেলই হয়।”

- “কিন্তু ভদ্রমহিলা?”

“আ ভেরি হার্ড নাট টু ক্র্যাক। একটু পাতা লাগিয়েছিলাম । শুনেছি, ছেলেদের বিশেষ পাত্তা দেন না। তাঁর মাথায় খুন, লাশ, ড্রাকুলাই অষ্টপ্রহর ঘোরে। প্রেম-ট্রেম নয়।”

অর্ণব হতাশ হয়ে যায়। যাঃ। লাভ স্টোরির শুরুতেই সব ভেস্তে গেল।

তার মনের কথা বুঝতে পেরেই অধিরাজ বলল, “হাল ছেড়ো না বন্ধু। মিস কাটামুণ্ডু হ্যান্ডসাম ছেলেদের পাত্তা দেন না। মানে তোমার আমার চান্স নেই। কিন্তু বিটকেল লোকদের পছন্দও তেমনই হয়। বলা যায় না, ডঃ চ্যাটার্জীর সেক্সি টাক দেখেই ম্যাডাম তাঁকে নিজের ‘ওনলি অ্যাডাম’ বানিয়ে ফেললেন ! খুন, বিষ নিয়ে যে সর্বক্ষণ প্লট বানাচ্ছে, মড়া কাটা ডাক্তার তাঁর প্রিয়তম হতেই পারেন।”

“কিন্তু ডঃ চ্যাটার্জী...

অধিরাজ হাত তুলে তাকে থামিয়ে দেয়, “ডঃ চ্যাটার্জীর লাভ প্রবলেম পরে সলভ করব। আপাতত সর্বনাশিনীর ওপর কনসেনট্রেট করো। তুমি গাড়িটা ক্লাব থেকে একটু দূরে পার্ক করবে। তারপর সোজা ক্লাবের পেছন দিকের পাঁচিল টপকে ঢুকে গাছপালার ভিড়ে লুকিয়ে খেয়াল রাখবে। আমি একটু বাড়ি যাচ্ছি। এ ক'দিন বাড়ি ফিরিনি বলে বাবা-মা চিন্তায় আছেন। তাছাড়া শরীরটাও ভালো লাগছে না। একটু খেয়েদেয়ে, ওষুধ খেয়ে চাঙ্গা হয়ে আসছি। তাছাড়া আমার বাইকটাও দরকার। যতক্ষণ না ফিরছি, এখান থেকে নড়বে না। কে আসছে, কে যাচ্ছে খেয়াল রেখো। তেমন সন্দেহজনক কিছু দেখলেই ফোন করবে।” একটু থেমে সে আপনমনেই বলে, “যদিও এখনই কিছু ঘটবে বলে মনে হয় না। হলে গভীর রাত বা ভোর রাতের দিকে হবে...!”

– “রাতের দিকে?”

– “আমার গাট ফিলিংস বলছে রাতের দিকেই।” সে চাপা স্বরে বলল, “কিন্তু কিছু তো হবেই। কোনও ক্লু আজ পাবোই।”

অর্ণব একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে আছে। যেন আরও কিছু বলতে চায় । কিন্তু সঙ্কোচ করছে। একবার, দু' বার মুখ খুলেও থেমে গেল। সেটা লক্ষ্য করেই সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায় অধিরাজ, “কিছু বলবে?”

– “স্যার.... মিসেস জয়সওয়াল... আই মিন...।”

– “ইউ মিন, তারপর স্পায়ের আধো অন্ধকার রুমে কী হইল?” সে হেসে ফেলেছে। “আমি ভাবছিলাম -এই প্রশ্নটা এখনও আসছে না কেন! তুমি বড্ড পজেসিভ অর্ণব।”

অর্ণব লজ্জায় রাঙা হয়ে যায়। একটু ইতস্ততঃ করে বলল, “উনি আপনাকে কিছু করেননি তো!”

- “উনি আমাকে কী করবেন!” সে হো হো করে হেসে উঠেছে, “আমি মাইনর তো নই যে মলেস্ট করবেন! তবে তোমায় কিছুই না বললে তোমার পেট গুড়গুড় করবে। আবার মিসেস জয়সওয়ালের প্রাইভেসিও নষ্ট করতে পারি না। শুধু এইটুকু বলতে পারি, মিসেস জয়সওয়াল কোনও মঙ্গলগ্রহের প্রাণী নন। একজন আপাদমস্তক স্বাভাবিক, স্ট্রেট

ফরোয়ার্ড নারী। আমিও কিছু মুনি ঋষি নই। এক হাতে তালি কখনও বাজে? ওঁর কিছু প্রয়োজন ছিল যা আমি ওঁকে দিয়েছি। আবার আমার কিছু দরকার ছিল যা তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি।"

- "তবু...! এইভাবে স্যার!... "

অধিরাজ মৃদু হেসে তার কাঁধে হাত রাখে, "বিলিভ মি অর্ণব। এমন কিছু ঘটেনি যার জন্য লজ্জাবোধ করতে পারি। অন দ্য কন্ট্রারারি, যা হয়েছে, বেশ হয়েছে। আই রিয়েলি এনজয়েড দ্য এক্সপেরিয়েন্স। ব্যস।" অর্ণব বুঝল, অধিরাজ এর বেশি আর কিছু বলবে না। সে জোরে শ্বাস টানল, "ওকে স্যার।" –

– "গেট রেডি।" সে রহস্যপূর্ণ গম্ভীর গলায় বলল, "আমার সিক্সথ সেন্স বলছে আজ রাতে মজারু ঘটবেই। প্রস্তুত থাকো।"

(সতেরো)

ওটাও স্বাভাবিক মৃত্যু ছিল না! তবু ডাক্তাররা ন্যাচারাল ডেথের সার্টিফিকেটই দিয়েছিলেন। কিন্তু সে জানে ওটা খুন ছিল! একদম ঠান্ডা মাথায় প্রি-প্ল্যানড মার্ডার! একটু একটু করে! তিলে তিলে...! তার চোখের সামনে নির্বিবাদে পুড়ে গেল একটা মানুষ! চিরদিনের জন্য কালো ছাই হয়ে গেল! কালো ছাই!...

কালো ছাই? মেয়েটির দু'চোখে আগুন জ্বলে ওঠে। ফর্সা অনিন্দ্যসুন্দর মুখ অদ্ভুত সংকল্পে দৃঢ়! তার সজল দু' চোখে আগুনের প্রতিবিম্ব। চিতার নয়, মোমবাতির। মোমবাতির স্নিগ্ধ শিখা তার জলভরা চোখের তারায় পড়ে যেন অনির্বাণ বহ্নিরূপে লকলকিয়ে উঠল। না, এখনও ছাই হয়নি। এখনও সে জ্বলছে। বুকের মধ্যে অনন্ত জ্বালা নিয়ে জ্বলছে। আজও চিড়বিড়িয়ে উঠছে যন্ত্রণায়। সে জ্বালা কাউকে বলার নয়। কাউকে বোঝানোর নয়। ততদিন সে জ্বলবে, যতক্ষণ না এ খেলা শেষ হয়।

সে সামনের আয়নার দিকে তাকায়। আচমকা মনে হল, সেই বিশ্বাসঘাতক পুরুষটা ওর ঠিক পেছনেই এসে দাঁড়িয়েছে। ওর পেছনে তারই ছায়া! সুন্দর কোমল মুখটা শক্ত হয়ে ওঠে। এখনও তাকে ছেড়ে যায়নি সে! আজও ঠিক তেমনই আছে। সেই ঘৃণিত লোকটা...!

সুন্দরী বিদ্যুৎগতিতে উঠে দাঁড়ায়। হাতের সামনে একটা ওড়না পড়ে ছিল। সেটা দিয়েই পাগলের মতো আয়নাটা মুছতে শুরু করে। মুছে দিতে হবে। লোকটাকে একদম মুছে দিতে হবে। ওর বিন্দুমাত্র অস্তিত্বও রাখা যাবে না। ওকে পুড়িয়ে ছারখার করতে হবে। নয়তো বারবার জিতে যাবে সাদা রাজা! কালো রানির হার নিশ্চিত! হেরে যাবে ওর সমস্ত শুভাকাঙ্খা। হেরে যাবে শুভবুদ্ধি। যেটুকু মমতা বুকে এখনও লুকিয়ে আছে, সেটুকুও হারিয়ে যাবে। হৃদয় নিংড়ে শুধু ঘৃণাই দিয়ে যাবে ও আজীবন! ভালোবাসবে না? কাউকে পরম মমতায় জড়িয়ে ধরতে পারবে না! একটা মানুষ কি শুধু ঘৃণার জোরেই বাঁচতে পারে!

মেয়েটি এত জোরে আয়নাটাকে মুছছে যে আয়নাটা প্রায় কেঁপে কেঁপে উঠছিল। তার বিক্ষিপ্ততা ক্রমাগতই বাড়ছে। উন্মাদনা বাড়ছে! কই? লোকটা মুছে যাচ্ছে না তো! তার

অস্তিত্ব এতটাই প্রবল যে এখনও সে কাচের মধ্যেই উপস্থিত! ঠিক তার পেছনেই...!

কাচ মুছতে মুছতেই থমকে গেল সে। কানের কাছে কতগুলো শব্দ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে! এত আওয়াজ যে কোনওটাই সঠিকভাবে শ্রুতিগোচর হচ্ছে না। খানিকটা কর্ণেন্দ্রিয়ের বাইরেই থেকে যাচ্ছে। একসঙ্গে অনেকগুলো গলার আওয়াজ। সে ইতস্ততঃ দৃষ্টিক্ষেপ করে। কোনও তীক্ষ্ণ শ্রবণশক্তি সম্পন্ন জীবের মতো চকিতে অস্থিরভাবে এদিক ওদিক দেখছে। কার যেন পায়ের শব্দ! কেউ আসছে? খড়খড় করে আরশোলা উড়ে গেল। একটা এলোমেলো পায়ের শব্দ না? একটা চাপা কান্নার আওয়াজ! কেউ বুঝি প্রবল যন্ত্রণায় কাঁদছে। এক এলোকেশীর বিধ্বস্ত চেহারা মুহূর্তের জন্য আয়নায় ছায়া ফেলে সাঁৎ করে সরে গেল। সে ঝাঁপিয়ে পড়ে দু' হাতে সেই যন্ত্রণাকাতর রমণীকে জড়িয়ে ধরার আগেই তার ছবি মুছে গিয়ে কাচে ভেসে উঠল এক ভীতু ভীতু কিশোরীর নিষ্পাপ মুখ!

মেয়েটার চোখ দিয়ে অব্যক্ত যন্ত্রণায় একবিন্দু জল গড়িয়ে পড়ে। সে অস্ফুট একটা শব্দ করে সেই কিশোরীর মুখ স্পর্শ করতে চায়। কী নিষ্পাপ চোখে মেয়েটা তার দিকেই তাকিয়ে আছে। স্ফুরিত ওষ্ঠাধরে অভিমান! যেন ওর ঠোঁট স্পর্শ করলেই অভিমান টস টস করে গলে পড়বে চোখ থেকে...!

কিন্তু মেয়েটাকে স্পর্শ করতে গিয়েও পারল না! সেই কিশোরীও মুছে গিয়েছে। এখন সেই লোকটার চেহারাটা আরও স্পষ্ট। লোকটা আঙুল উঁচিয়ে বলছে, "ইউ ডার্টি অ্যানিম্যাল! নিজের চেহারাটা দেখেছিস! চাকরাণীও তোর থেকে দেখতে ভালো। যখন বিছানায় এসে বসিস, মনে হয় একটা কালো কুতিয়া এসে বসেছে! বেরো এখান থেকে!... নয়ত কুতিয়াকে বেল্ট পেটা করে সোজাও করতে পারি... ব্লাডি বিচ!"

"চো-ও-প!"

আর সহ্য হল না! হাতের কাছে ফুলদানিটা ছিল। সেটাকেই আয়না লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারল! সজোরে ঝনঝনিয়ে ভেঙে পড়ল আয়নার কাচ! চতুর্দিকে কাচের টুকরো ছড়িয়ে পড়েছে। সে বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেখল সমস্ত কাচের টুকরোয় সেই লোকটারই প্রতিবিম্ব! লোকটা হাসছে! হো হো করে হাসছে। নির্লজ্জ! পাষণ্ড!...

– "আচ্ছা? তুই আমায় হারাবি! হ্যাঁ? দেখাচ্ছি!" -

মেয়েটা অসম্ভব রাগে উন্মত্ত হয়ে ঘর থেকে চলে গেল টয়লেটের দিকে। দমাস করে দরজা বন্ধ করার শব্দ। কলকল করে প্রবল ধারায় জল পড়ছে। তারপরই সব চুপ। শুধু একটানা ফোঁটায় ফোঁটায় জল পড়ার আওয়াজ, টুপ্ টুপ টুপ.........।”

একটা প্যাঁচা বিপন্ন চিৎকার করে উঠে ঝটপটিয়ে উড়ে গেল। জানলার চতুষ্কোণ পরিসরে গোল থালার মতো রূপোলি চাঁদ ধরা পড়েছে। কিন্তু চাঁদের নীলাভ জ্যোৎস্না হাল্কা মেঘের হস্তক্ষেপে অস্বচ্ছ। প্যাঁচাটা ঠিক যেন প্রেতছায়ার মতোই চাঁদের বুক ছুঁয়ে চলে গেল। এখন আকাশ বেশ কালো। মেঘ জমেছে। নারকেল পাতা হাওয়ায় শিরশির করে ওঠে। হাওয়ার গতিবিধিও যেন বেশ সতর্ক। সন্ত্রস্ত হয়ে দুর্বোধ্য ইশারায় বয়ে চলেছে। ঘড়ির কাঁটা কোনও এক অমোঘ পরিণামের দিকনির্দেশ করে প্রতিটা প্রহর গুণছে। কিছু যেন হবে। কিছু যেন ঘটতে চলেছে...!

বেশ কিছুক্ষণ পরে সেই অসহ্য নৈঃশব্দের ভেতরে ছোট্ট একটা শব্দ তরঙ্গ তুলল। টয়লেটের দরজা খুলে গিয়েছে। মেয়েটি ভূতে পাওয়া মানুষের মতো টলতে টলতে বেরিয়ে এল। তার মুখ অবনত। মেঘের মতো কুন্তলরাশি তার মুখ ছুঁয়ে আছে। আর খানিকটা অন্ধকার জমে আছে তার সুডোল মুখের চারদিকে। আস্তে আস্তে এসে সে বসে পড়ল আয়নার টুকরো টুকরো কাচের সামনে। তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আঁতিপাঁতি করে খোঁজে সেই শয়তানটাকে। কোথায় সে! এখনও আছে কি? এখনও তার মুখে সেই ব্যঙ্গের হাসি রয়েছে? কিন্তু এই মুহূর্তে লোকটার প্রতিবিম্ব পড়ছে না আয়নার কাচে। মেয়েটি খিলখিল করে হেসে উঠল। যেন ভারী মজা পেয়েছে এমন করে হাসছে। সে। হাসির ধমক সামলাতে না পেরে লুটোপুটি খাচ্ছে মেঝেতে! উচ্চকিত হাস্যে ফেটে পড়ে বলল, “গন? কাওয়ার্ড!”

বলতে বলতেই মুখ তুলল সুন্দরী! কিন্তু...! এ কী! এ কে!

একটু আগে যে শ্বেতবর্ণা সুন্দরী বসেছিল এ তার মুখ নয়! এ মুখ কালো কুচকুচে! কালো চকচকে চামড়া দেখলেই চিক্কণ কালো রঙের সাপের কথা মনে পড়ে। দু চোখে

খরদৃষ্টি! যেন একটা কালো সাপ! অথবা মানবীর দেহে বুঝি বসিয়ে দেওয়া হয়েছে এক কালো বিড়ালের ভয়াবহ মুখ! অবিকল প্রাচীন মিশরীয় দেবী বাস্ট বা বাস্টেট এর মতো!

(আঠারো)

গোল্ডেন মুন ক্লাবের আলো অনেকক্ষণ আগেই নিভে গিয়েছে। ঘড়িতে এখন রাত বারোটা। একটু আগেও ক্লাবের মধ্যে নানারকমের শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল। একের পর এক গাড়ি এসে ভিড় বাড়াচ্ছিল। গাড়ির হর্ণ, মেয়েদের খিলখিল হাসি, পুরুষদের উচ্চকণ্ঠে কথাবার্তার সঙ্গে মাতাল মানুষের প্রলাপও ভেসে আসছিল। কিন্তু রাত বাড়তে না বাড়তেই আস্তে আস্তে ছবিটা বদলাতে শুরু করল। টলোমলো পায়ে বিদায় নিচ্ছিলেন অভ্যাগতরা । দু একজন নিশাচর অবশ্য ইতিমধ্যেই রিসর্টে সঙ্গী বা সঙ্গিনী সহ 'নাইট ওয়াকে' চলে এসেছেন। খুব সন্তর্পণে তাঁদের এন্ট্রি হল। তারপর আবার সব চুপচাপ।

অর্ণব একদৃষ্টে সেদিকেই তাকিয়েছিল। সে এই মুহূর্তে লম্বা-চওড়া একটা ঝাঁকড়াচুলো গাছের পেছনে অন্ধকারের সঙ্গে মিশে লুকিয়ে আছে। গাছগুলোকে এখন দীর্ঘতর মনে হচ্ছে। অন্ধকারের সমার্থক শব্দ হয়ে চুপ করে ওঁৎ পেতে আছে গুল্মের ঝোপগুলো। প্রতিটা সেকেন্ড যে কী অধীরভাবে কাটছে তার ঠিক নেই। একমুহূর্তের জন্যও পাহারায় ছেদ দেয়নি। অক্লান্তভাবে বসের কথায় অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলেছে। যদিও বুকের মধ্যে একটা আলোড়ন হচ্ছিল। সত্যিই কি অধিরাজের আন্দাজ সঠিক প্রমাণিত হবে? এটা যে কী হচ্ছে তা এখনও তার বোধগম্য হয়নি। এটা কেস না দাবাখেলা? অধিরাজ কতদূর গিয়েছিল মানসী জয়সওয়ালের সঙ্গে? সে কোনও কাজ কারণ ছাড়া করে না। কিন্তু মানসী জয়সওয়ালের সঙ্গে ফ্লার্টিং এর মধ্যে কী কারণ থাকতে পারে! ঠিক কী ঘটছে এই রিসর্টে! —"কী ভাবছ বস?"

কাঁধের ওপরে আলতো চাপ আর পরিচিত কণ্ঠস্বরে সচকিত হয়ে পেছনে ফিরল —"স্যার!"

অধিরাজ কালো লেদার জ্যাকেটে! এ কেমন হুলিয়া! আর যাই হোক, আলতো করে মোবাইলটা জ্বেলেই চোখ ধাঁধিয়ে গেল অর্ণবের। পুলিশি ড্রেস কোড নয়!

- "আলোটা নেভাও অর্ণব, কেউ আমাদের দেখে ফেলতে পারে।" অধিরাজ একটু অনুতপ্ত স্বরে বলল, "সরি, আসতে দেরি হল। সমস্ত বন্দোবস্ত করতে একটু টাইম লাগল।

এদিকে কোনও আপডেট?"

"হ্যাঁ।" অর্ণব জবাব দিল, "ডঃ চ্যাটার্জী কয়েকমিনিট আগেই ফোন করেছিলেন। আপনার স্কিন স্যাম্পলের ল্যাভেন্ডারের সঙ্গে অর্জুন শিকদারের ল্যাভেন্ডার অয়েল পারফেক্টলি ম্যাচ করেছে। দুটো নিঃসন্দেহে একই প্রোডাক্ট।"

—"বেশ! বেশ!" অন্ধকারে মৃদু হাসির শব্দ ভেসে আসে, "মিস ঘোষ কিছু বলেছেন? লাল দরজাটা পাওয়া গেল?"

-"হ্যাঁ। উনি পেয়েছেন। মেরিলিন প্ল্যাটিনামের একটি ফ্ল্যাটের দরজাই চেরি রেড। আটতলায় বিজয় জয়সওয়ালের ঠিক অপোজিট ফ্ল্যাটটা। সেভেন ও বি। জনৈক অহনা ভট্টাচার্যের।"

—"থ্যাঙ্ক গড। তবু একজন ভট্টাচার্য এল। এতক্ষণ তো জয়সওয়াল আর বাজাজের মধ্যেই ডাবলস চলছিল। দু দুটো জয়সওয়াল পরিবার। কতজন বাজাজ তাই বা কে জানে!"

অর্ণব চাপা স্বরে বলে, "সত্যি! এখন তো মনে হচ্ছে কলকাতায় শুধু জয়সওয়াল আর বাজাজ ফ্যামিলিই থাকে। আর কোনও সারনেমই নেই।"

-"শুধু সারনেমই নয়— নামের মিলটা লক্ষ্য করোনি? রিয়া বাজাজের মায়ের নাম ছিল অহল্যা। আবার ডঃ জয়সওয়ালের মিসেসের নামও অহল্যা! অহল্যা বাজাজ আপাতদৃষ্টিতে কালো ও অসুন্দর ছিলেন। অহল্যা জয়সওয়ালও ঠিক তাই।" অধিরাজ বিড়বিড় করে, এ দুটো নাম এক হওয়া এবং দুটো মানুষের একরকমই বর্ণনা হওয়া মোটেই ভালো লক্ষণ নয় অর্ণব। অহল্যা বাজাজের একটা ছবি দরকার ছিল।" -

অর্ণব যেন শ্বাস নিতে ভুলে গিয়েছে, "তবে কি দুটো লোকই এক!"

—"দুটো লোকই এক কি না জানি না।" সে দীর্ঘশ্বাস ফেলল, "তবে | আমার ধারণা অহল্যা বাজাজের সঙ্গে অহল্যা জয়সওয়ালের কিছু তো সম্পর্ক আছে। কিছু একটা মিসিং লিঙ্ক। কিন্তু সেটা এখনও ধরা যাচ্ছে। না।"

–"ওদিকে ল্যাভেন্ডারের স্যাম্পলও তো মিলল। অর্ণব কৌতূহলী, "তবে কি মানসী জয়সওয়াল....?"

—"সন্দেহ করাটা অন্যায় নয়। কারণ নিশান অ্যারোমা ইন্ডাস্ট্রির অয়েল বাইরে কোথাও কিনতে পাওয়া যায় না। নিজেদের ল্যাবে তৈরি করে নিশানের স্পা আর স্যালোনগুলোতেই পাঠানো হয়। আবার এখানে স্বয়ং মালকিনই এসে বসে আছেন!"

—"তবে কি উনিই সর্বনাশিনী!" অর্ণব চোখ কপালে তুলে বলল, এই লেভেলের অ্যাকটিং করে চলেছেন! মা-ই-গ-ড!"

—"আজ সকালেও এ কথাটা বললে আমার সন্দেহ থাকত। মানসী জয়সওয়াল রীতিমত সুন্দরী ও আকর্ষণীয়া। বয়েসই বোঝা দায়। আপাতদৃষ্টিতে বোকা মনে হলেও, ওটা ওঁর সম্ভাব্য অস্কারজয়ী রিয়েল লাইফ অ্যাকটিংও হতে পারত।" নিস্পৃহ স্বরে উত্তর এল, "কিন্তু আফটার ম্যাসাজ আমি ওঁকে তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছি। মানসী জয়সওয়ালের সঙ্গেও কোনও লিঙ্ক হয়তো আছে। কিন্তু সর্বনাশিনী উনি নন।"

—"কেন?" অর্ণব সন্দিগ্ধ, "উনি যে এখনও চমৎকার অভিনয় করছেন না তার প্রমাণ কী?"

অধিরাজ অন্ধকারেই স্মিত হাসল, "প্রোফেসর রিভার সং এর একটা কোট শুনেছ? আই লাভ বাইটিং। ইট'স লাইক কিসিং, বাট্ দেয়ার্স আ উইনার! আমাদের সর্বনাশিনীর মনস্তত্ত্ব ঠিক তেমনই। ইনিও ডমিনেট করতেই ভালোবাসেন। সব খেলাতেই জিততে চান।"

—"রিভার সং মানে ডক্টর 'হু' সিরিজের রিভার সং?"

—"জানতাম তুমি ঠিক ধরে ফেলবে। তুমি তো আবার যতরাজ্যের কমিকস, সায়েন্সফিকশন পড়তে ভালোবাসো"। সে শান্তভঙ্গিতে ব বলল, "হ্যাঁ, সেই রিভার সং-ই বটে।"

অর্ণব চুপ করে যায়। প্রোফেসর রিভার সং এর মধ্যে কোথা থেকে এলেন?

তার মন যেন পড়ে ফেলল অধিরাজ, "প্রোফেসর রিভার সং এর ঐ ডায়লগটা আমাদের কেসের ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ। অর্জুন শিকদারের ফরেনসিক রিপোর্টটা মনে আছে? ওখানে স্পষ্ট একটা কথা ছিল। অর্জুন শিকদার মৃত্যুর আগে সেক্স করেছিলেন। সেটা বোঝা গেল কী করে?"

– "লাভ বাইট স্যার।" সে সপ্রতিভভাবে বলল, "লাভ বাইট দেখেই তো!"

"লাভ বাইট নয়, মোক্ষম লাভ বাইট!" অধিরাজ একটা অঙ্ক মেলাচ্ছে, —"সেটা শোনার পর আমি সঞ্জীব রায়চৌধুরীর লাশের ফটোও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছি। তাঁর লাশেও গলায়, ঘাড়ে, কাঁধে লাভ বাইট ছিল। সেবার পুলিস গুরুত্ব দেয়নি বলে ঐ ব্যাপারটা লক্ষ্য করেনি। আমাদের কন্যে কামড়াতে ভালোবাসেন অর্ণব। শি ইজ আ ভেরি স্ট্রং কিসার! স্ট্রং কিসার বললেও পুরোটা বলা হয় না, চূড়ান্ত প্যাশনেট, অ্যাগ্রেসিভ অ্যান্ড ডমিনেটিং। শুধু তাই নয়, তিনি বিছানাতেও বিজয়িনী হতে চান। মনোভাবটা তাঁর এতই প্রবল যে রীতিমত বিধ্বংসী বলা যায়। তিনি যে ইচ্ছে করে এটা করেন তা নয়। এটা অটোম্যাটিক্যালি হয়ে যায়। সেক্স ইজ আ ইন্সটিংক্ট। সেখানে বিচার-বুদ্ধি-ক্যামোফ্লেজ সব মাথায় ওঠে। ইনস্টিংক্টের কাছে সব মানুষই অসহায়। সো, এইখানে তিনি একটি জব্বর ভুল করে ফেলেছেন। এইসান প্যাশনেট স্ট্রং কিস করেছেন যে হিকিজ, আই মিন লাভ বাইটস চলে এসেছে। সচরাচর মেয়েরা সেক্সে এতখানি ডমিনেটিং হয় না। বাট শি ইজ...।" অর্ণবের ভুরু কুঁচকে গেল, "কিন্তু আপনার গলায় বা ঘাড়ে তো কোনও দাগ নেই! মিসেস জয়সওয়াল প্যাশনেট বা অ্যাগ্রেসিভ নন?"

—"যথেষ্টই। কিন্তু তাঁর স্টাইলটা অন্যরকম। দাঁতের ব্যবহার করেন না। বা স্ট্রংলি সাক্ করেন না। ওঁর স্ট্র্যাটেজি ও ট্র্যাজেডিটা আলাদা। ওঁকে খরচের খাতায় ফেলতেই পারো। উনি লাভ বাইট দেন না।"

—"এইজন্যই তার মানে...!" অর্ণব হাঁ করে তাকিয়ে থাকে তার দিকে। কোনোমতে ধরা গলায় বলল, "তাহলে তো এখন আপনাকে সব সাসপেক্টের সঙ্গে...।"

অধিরাজ সজোরে হেসে উঠতে গিয়েও চেপে গেছে, "কী? শুতে হবে?"

তার কান গরম হয়ে যায়। লজ্জা পেয়ে মুখ নীচু করল অর্ণব। ফের বেফাঁস কথা বলে ফেলেছে। অধিরাজ ঠোঁট টিপে হাসল, "এগেইন গুড ওয়ান।"

অর্ণব মনে মনে নিজেরই চোদ্দগুষ্টিকে গাল দেয়। লাভ বাইটের কথা তো তার মনেই আসেনি। অথচ মনে আসা উচিত ছিল। সে একসময়ে ডাক্তারি পড়ত। কিন্তু পরে লাইন

চেঞ্জ করে নেয়। ডাক্তারি প্রায় ভুলেই মেরে দিয়েছে। তবে লাভ বাইট বা হিকিজ সম্বন্ধে জানে। অধিরাজ যা বলছে সেটাই সঠিক। সচরাচর যারা হিকিজ দেয়, তারা নিজের অজান্তে, অবচেতনেই এ কাজটা করে। স্ট্রং কিস, সাক, বা বাইট করলে এরকম হেমাটোমা হওয়া সম্ভব। কিন্তু এটা যে কোনও ক্লুও হতে পারে তা তার মাথাতেই আসেনি।

—"স্যার, অনেক সময়ে কিন্তু একটা হিকিই ডেঞ্জারাস হতে পারে। খুব স্ট্রং বা অ্যাগ্রেসিভ হিকির ফলে কিন্তু মৃত্যুও হয়েছে।" আচমকা অর্ণবের মাথায় একটা সম্ভাবনা আসে— "লাভ বাইট বা হিকি ব্লাড ভেসেলের ওপরে এফেক্ট করে মূলত। অনেকসময় ব্লাড ক্লট হয়ে গিয়ে স্ট্রোক বা প্যারালাইসিসও হতে পারে। এমনকি মৃত্যুর রেকর্ডও আছে। আমরা এদিকে হয়তো ঝোপে ঝোপে বাঘ খুঁজে বেড়াচ্ছি, ওদিকে বিড়াল বিষাক্ত থাবা নিয়ে বসে আছে! এই হিকিই মার্ডার ওয়েপন নয়তো?

অর্ণব আরও কিছু বলতেই যাচ্ছিল। তার আগেই অধিরাজ ঘড়ির দিকে একঝলক তাকিয়ে ইশারা করল, "ব্রিলিয়ান্ট। কিন্তু এখন আর কথা নয়, অর্ণব। আপাতত রাতের অতিথিকে স্বাগত জানানোর প্রস্তুতি নিতে হবে। তুমি এখানে ফিল্ডিংটা দাও। আমি বাইরে দিচ্ছি।"

—"আপনি বাইরে থাকবেন?"

—"হ্যাঁ, একটু দূরে। ব্লু টুথ পরে থাকো। আমি আমার বাইকে বস আছি। আর যা যা দেখবে আমায় রিলে করতে থাকবে। নিজে থেকে কিছু করতে যেও না।"

—"ওকে স্যার।"

অধিরাজ মৃদু হেসে পাঁচিলের দিকে দৌড়ে চলে গেল। যেভাবে অনায়াসেই পাঁচিল টপকাল সে, তাতে হয়তো হনুমানও লজ্জা পাবে। অর্ণব দ্রুতহাতে ব্লু-টুথ পরে নিল। এখন থেকে ব্লু-টুথেই কথাবার্তা হবে। তার সতর্ক দৃষ্টি আবার ক্লাব হাউসের দিকে ফিরল।

ক্লাবের বাইরে তখন ল্যাম্পপোস্টের পিঙ্গল আলো পিচের কালো রাস্তায় পড়ে অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে। দু'দিকে শুধু ধূ ধূ করছে মাঠ। বেশ অনেকখানি দূরে কিছু হাইরাইজের মাথা অভ্রভেদী অহঙ্কারে ছুঁয়ে আছে আকাশ। অন্ধকারে ঘুমন্ত প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর বিরাট কলেবরের মতো দেখতে লাগছে। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, এই বুঝি দপ করে জ্বলে উঠবে

তাদের হিংস্র সবুজ চোখ! দু-একটা বেওয়ারিশ কুকুর কুন্ডলী পাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। অধিরাজের পায়ের শব্দে চোখটা একটু টেরচা করে খুলে দেখে নিল। চোখে জিজ্ঞাসা, 'কে বে তুই ডিস্টার্ব কচ্ছিস?'

সে এবং তার ছায়া পায়ে পা মিলিয়ে গেল অন্ধকার মাঠের দিকে। এখানেই দাঁড় করানো আছে বাইকটা। বাইকটারও রঙ গাঢ় হওয়ার দরুণ অন্ধকারে চমৎকার মিশে গিয়েছে। বাইকটার চেহারা দেখলেই ভয় করে। এ জাতীয় বাইক সচরাচর বাইক র‍্যালি, রেসিঙে ব্যবহৃত হয়। সাধারণ বাইকাররা এই সব বাইক ধরার সাহস পাবে না। কিন্তু অধিরাজের চিরকালই যত রাজ্যের ভয়াবহ কাণ্ডকীর্তি করতে ভালো লাগে। সে অসম্ভব ডেয়ার ডেভিল। মাউন্টেনিয়ারিং তার প্যাশন। আর বাইক! কলেজে পড়াকালীন তুখোড় বাইকার ছিল। বাইকের নানারকম স্টান্ট করতে ওস্তাদ। এখনও তার নিজস্ব একটা বাইকার গ্যাং আছে। সুযোগ পেলেই গ্যাং নিয়ে লং জার্নিতে বেরিয়ে পড়বে। গতবছরই বাইকে চেপে সিকিম ট্রিপ মেরেছিল। তার বাবা সুযোগ পেলেই বলেন, "বুড়ো বয়েসেও নিস্তার নেই! অশান্তির ট্যাবলেট বাড়িতেই বসে আছে। এই পাহাড়ে চড়ছে, এই বাইকে চেপে স্টান্ট মারছে! সর্বক্ষণ প্রাণ হাতে! কবে কী ঘটিয়ে বসবে সেই ভয়েই কাঁটা হয়ে আছি। কেন বাপু? তোর একটু শান্তভাবে বসে থাকতে ভালো লাগে না?"

ভেবেই সে ফিক করে আপনমনেই হেসে ফেলে। বাবা যদি জানতেন যে এখন সে এখানে অন্ধকারে খুনীকে ধরার জন্য একশো দুই জ্বর গায়ে নিয়ে ওঁৎ পেতে বসে আছে তবে যে কী করতেন কে জানে! হ্যাঁ, গায়ে এখন একশো দুইয়ের কাছাকাছিই জ্বর। প্যারাসিটামলের কাজ শেষ হতে না হতেই ফের জ্বর উঠতে শুরু করেছে। মাথার শিরা-উপশিরাগুলো যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে। গলা জ্বালা করছে। মাঝে-মধ্যেই চোখ ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে, তবু আর ওষুধ খায়নি। জ্বরের ওষুধ খেলেই ঘুম পায়। শরীর ছেড়ে দেয়। এই মুহূর্তে কোনওরকম চান্স নিতে চায় না। আজ তাকে সজাগ, সতর্ক থাকতে হবেই। যে কোনও মূল্যেই হোক!

একটা পরিচিত ভাইব্রেশনে সজাগ হয়ে উঠল অধিরাজ। ফোন এসেছে। সে হেডসেট অ্যাকটিভ করল, "হ্যালো।"

—"এনি আপডেট রাজা? অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছি। কী হল?" অফিসার পবিত্র আচার্য। সেও ক্লাব থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে। সঙ্গে আরও একটা গাড়িতে ব্যাক আপ। আজ পুরো প্রস্তুতি নিয়েছে সি.আই.ডি, হোমিসাইড। প্রতীক্ষা শুধু প্রতিপক্ষের একটা ভুল স্টেপের।

—"নাথিং মামা!" সে হাসল, "সবে তো কলির সন্ধ্যে। এখনই অধৈর্য হচ্ছ কেন?"

—"মশাকে গণহারে ব্লাড ডোনেট করতে হলে বুঝতে!" গজগজ করে পবিত্র, "আজ সত্যিই কি পাখি পড়বে? না ফালতু জাল পেতে বসে আছি?"

—"আমার ধারণা পাখি পড়বে।"

—"দেখো, সুকুমার রায়ের মতো 'ফসকে গেল' কেস না হয়।"

—"গুড় গুড় গুড় গুড়িয়ে হামা খাপ পেতেছেন গোষ্ঠমামা / এগিয়ে আছেন বাগিয়ে ধামা, এইবারে বাণ চিড়িয়া নামা— চট।" অধিরাজ দুষ্টু হেসে বলে, –"ছোটবেলায় পড়েছি। ডোন্ট ওরি! কড়া ফিল্ডিং এমনি এমনিই দেওয়া হয়নি।"

—"তুমি এত কনফিডেন্ট কী করে হচ্ছ?"

-"আসতে হবেই। গুগলি দিয়েছি তো।" সে আত্মবিশ্বাসী, "একেই আজ সি.আই.ডির পায়ের ধুলো পড়েছে। কোম্পানি থেকেও ফোন গিয়েছে। কাল সি.আই.ডি রেড করতে পারে। তার ওপর কোম্পানির লোক আজ ঝগড়া করেছে। বলেছে কাল আসবে। রেগেমেগে যদি লেট আসার রেকর্ড ব্রেক করে কাল সকালেই চলে আসে— তবে? দিনের বেলায় লাশ ডাম্প করা সম্ভব নয়। আজ রাতটুকুই সময় আছে। যা করতে হবে, আজই করতে হবে। যেখানে ডাবল অ্যাটাক ধেয়ে আসার সম্ভাবনা, সেখানে ফ্রিজারে লাশ ফেলে রাখার মতো এত বড় চান্স নেবেন কী করে তিনি? শিওর আন্দাজ করেছেন যে বুবি ট্র্যাপ কোথাও একটা আছে, কিন্তু তাঁরও উপায় নেই। সেকেন্ড কোনও রাস্তাই রাখিনি।"

—"তুমি যখন জানো যে লাশটা ডিপ ফ্রিজারেই আছে তখন বের করে আনলেই তো হত।" পবিত্র ফের বিরক্ত, "তা না করে পাশ দিয়ে হেঁটে চলে এলে!"

—"তোমার মানহানির মামলা খাবার ইচ্ছে হয়েছে?" অধিরাজ শান্তভাবেই বলল, "ধরো লাশটা বের করলাম। কিন্তু ধরব কাকে? ম্যানেজারকে? মানসী জয়সওয়ালকে? কী প্রমাণ

যে ওঁদের মধ্যেই কেউ রেখেছেন? আমায় যদি ডিফেন্স জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি কি স্বচক্ষে ওদের কাউকে লাশটা রাখতে বা বের করতে দেখেছেন?" কী জবাব দেব? ওঁরা তো দু'জনেই কোর্টে দাঁড়িয়ে বলবেন, 'আমরা কিছুটি জানি না হুজুর, সি.আই.ডি, হোমিসাইড আর কাউকে না পেয়ে আমাদেরই বলির পাঁঠা বানিয়েছে। ঐ লাশটাও ওঁরাই প্ল্যান্ট করেছেন' তখন তুমি কী বলবে? কারোর বিরুদ্ধে কোনও সাক্ষ্যপ্রমাণ আছে? সেইজন্যই এত রাতে তুমি, আমি, অর্ণব সবাই জেগে বসে আছি। তবে তোমার থেকে অর্ণব সঙ্গী হিসাবে অনেক বেটার। আই থিঙ্ক হি ইজ দ্য বেস্ট। কোনও প্রশ্ন না করে কাজ করে যায়। একটুও অধৈর্য হয় না। তুমি বকে বকেই আমার মাথা খারাপ করছ।"

—"কী করব!" পবিত্র বলল, "যত রাজ্যের পাগল ক্রিমিন্যাল তোমার কপালেই জোটে! তারপর তোমার সঙ্গে আমাদের সবার নাভিশ্বাস ওঠে।"

–"পাগল নয়। জিনিয়াস! তবে স্বয়ং তিনি আসবেন না।"

— "শ্যাঃ...!" পবিত্র অদ্ভুত একটা শব্দ উচ্চারণ করে, "মানেটা কী? এত কষ্ট করে শেষে চুনোপুঁটি ধরব?"

—"চুনোপুঁটি ধরতে হবে না। শুধু...!" বলতে বলতেই কিছু একটা দেখে সে থেমে গেল। একটা সাদা রঙের বোলেরো হুশ করে তার চোখের সামনে দিয়ে ক্লাবের দিকেই চলে গেল। গাড়িটার কাচগুলো কালো। জানলা বন্ধ। চাপা স্বরে পবিত্রকে বলল অধিরাজ, "এখন পেটে বোম মেরে চুপ করে থাকো। মনে হয় তেনারা এলেন।"

—"ওকে বস।"

পবিত্রর লাইনটা কেটে দিয়ে অর্ণবকে ফোনে ধরল সে। অর্ণব খুব সতর্ক ছিল। একবার রিং হতে না হতেই ওপ্রান্তে জাগ্রত হল তার কণ্ঠস্বর, "হ্যাঁ স্যার।"

—"একটা সাদা রঙের বোলেরো ঠিক ক্লাবের দিকেই যাচ্ছে। একটু গাড়িটার ওপরে নজর রাখো।"

—"ধরব?"

—"না, শুধু দেখো, ঠিক কী হচ্ছে। এখন কিছু করবে না।"

—"ডান।"

এবার আর ফোন না কেটেই পবিত্রকে চটজলদি কনফারেন্সে নিয়ে নিল সে। তার কণ্ঠে কম্যান্ডিং টোন, "এখন একটা কথাও নয়। অর্ণবও লাইনে আছে। যতক্ষণ না বলছি, নো অ্যাকশন। কেউ জায়গা ছেড়ে নড়বে না।"

—"ঠিক আছে।"

এরপর মিনিটখানেক শুধু রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষা। অর্ণব দেখল বোলেরোটা ঠিক এসে থামল ক্লাবের সামনে। ক্লাবের আলো নিভে গেলেও এন্ট্রান্সে একটা বেশ জোরালো আলো সামনের বাঁধানো রাস্তাকে আলোকিত করেছে। বোলেরো থেকে যে লোকটা নেমে এল তাকে দেখেই সে বিস্মিত! এ কী! এ তো মেরিলিন প্ল্যাটিনামের গেটকীপারটা! এই লোকটাই জুয়েলার বিজয় জয়সওয়ালের গাড়িটাকে বেরিয়ে যেতে দেখেছিল! অন্তত বয়ানে তেমনই বলেছিল।

অধিরাজকে সে কথা ফিসফিস করে বলতেই উত্তর এল, "আমি এমনকিছুই আশা করেছিলাম। এই ব্যাটার ওপরে আমার আগেই সন্দেহ হয়েছিল। চুপচাপ দেখে যাও, কী করছে।"

গেটকীপার গাড়ি থেকে নেমে এসে ডাইনে বাঁয়ে না তাকিয়ে সোজা গটগটিয়ে চলে গেল ক্লাবের ভেতরে। উত্তেজনায় অর্ণব তখন রীতিমত ঘেমে নেয়ে একসা। হৃৎপিণ্ডটাই না পাঁজর ফাটিয়ে বেরিয়ে আসে! তার ভয় হচ্ছিল যে হার্টটা যেরকম শব্দ করছে, তাতে লোকটা তার উপস্থিতি টের না পেয়ে যায়! তার ইচ্ছে করছিল এখনই গিয়ে ব্যাটার কলার চেপে ধরে। কিন্তু সে উপায় নেই। আরও কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল! চতুর্দিকে সম্পূর্ণ নৈঃশব্দ। সে নিস্তব্ধতা এতই গভীর যে গাছের পাতা খসার সামান্য আওয়াজটুকুও পাচ্ছিল অর্ণব। সে দমবন্ধ করে পরের ঘটনার জন্য অপেক্ষা করছে। অথচ গেটকীপারটা সেই যে ভেতরে গিয়েছে, আর বেরোবার নামই নেই। এতক্ষণ ধরে করছেটা কী! অর্ণব মনে মনে গরগর করে। একটা লাশ নিয়েই তো বেরোবি রে ব্যাটা! নাকি গোটা ফ্রিজটাই ঘাড়ে করে আনছিস?

সে আবার ফিসফিস করে, "স্যার, একবার ভেতরে গিয়ে দেখবো? বড্ড দেরি করছে।"

—"একদম না।" ওপাশ থেকে গম্ভীর গলায় উত্তর এল, "ডঃ বিজয় জয়সওয়ালের চেহারাটা দেখেছ? পুরো জলহস্তি। তার ওপর মরে গিয়ে আরও ভারি হয়ে গিয়েছেন। একটু সময় তো লাগবেই।"

পবিত্র ওপাশ থেকে ফোড়ন কাটে, "এর চেয়ে অর্ণবই গিয়ে একটু হাত লাগাক না। দেখছ না, বেচারি কেমন ব্যাকুল হয়ে পড়েছে।"

অধিরাজ ঠাট্টাটাকে পাত্তা না দিয়ে বলে, "পবিত্র, তোমরাও এবার আস্তে আস্তে এগিয়ে এসো। গোল্ডেন মুন থেকে অর্ণব বেরোলেই তুমি ঢুকবে। তোমার কাছে ওয়ারেন্ট আছে তো?"

"আছে। কিন্তু ধরবো কাকে?"

—"যিনি গেটকীপারের সঙ্গে হাত লাগাচ্ছেন। মোস্ট প্রব্যাবলি ক্লাবের রেস্টোর‍্যান্টের ম্যানেজার। আগে রাস্তা ক্লিয়ার হয়ে যাক। তারপর তোমাদের এন্ট্রি। লোকটাকে একটা কথাও বলতে দেবে না। কোনও কথা শুনবেও না। স্রেফ তোমার ব্যাক-আপ টিমের অফিসারদের হাতে তুলে দেবে। আর দু একজন লেডি অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে নিজের গাড়িতে অর্ণবকে ফলো করবে।"

—"ঠিক হ্যা।"

–"ক্লাবের সামনে এসেই হুটারটা বাজিয়ে দিও। আমি চাই, শুধু ম্যানেজার নয় গেটকীপারটাও টের পাক যে ক্লাবে পুলিসের রেড পড়েছে।"

অর্ণব এর মধ্যে কিছু বলবে কি না ভাবছিল। তার আগেই সামনের দৃশ্যটা দেখে তার মাথার চুল আর গায়ের রোম খাড়া হয়ে যায়। সত্যিই গেটকীপারটার সঙ্গে রেস্টোর‍্যান্টের ম্যানেজার বেরিয়ে এসেছে। দু'জনে ধরাধরি করে একটা বস্তা টেনে আনছে। ওদের দেখেই মনে হচ্ছে বস্তাটা চূড়ান্ত ভারী। বস্তাটাকে কোনওরকমে গাড়িতে তুলে দিয়ে ম্যানেজার গেটকীপারের সঙ্গে নীচু স্বরে কী যেন কথা বলল! তারপরই দু'জন দু'দিকে। গেটকীপারটি বোলেরোর ড্রাইভিং সিটে উঠে বসেছে! পরমুহূর্তেই চাপা গর্জন করে উঠল সাদা রঙের বোলেরো।

স্যার। ও গাড়িতে উঠে বসে স্টার্ট দিয়েছে।"

“ফ্যান্টাস্টিক! তুমি বাইরে চলে এসো ইমিডিয়েটলি।” অধিরাজ নির্দেশ দিল, “পবিত্র। স্টার্ট!” -

অর্ণব সবেগে পাঁচিলের দিকে দৌড়তে দৌড়তে শুনতে পেল নিস্তব্ধতার বুক চিরে চেঁচিয়ে উঠেছে পুলিসি সাইরেনের প্রবল আওয়াজ! পবিত্র আচার্য'র এন্ট্রি হয়ে গিয়েছে। অ্যাকশন শুরু!

লোকদুটো বোধহয় দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে এত তাড়াতাড়ি ঘটনাস্থলে পুলিস এসে হাজির হবে। হুটার শুনে দু'জনেই সেকেন্ডের ভগ্নাংশের জন্য কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল। পরের মুহূর্তেই রেস্টোর‍্যান্টের ম্যানেজার প্রাণপণে ক্লাবের ভেতরে দৌড়েছে। আর সাদা বোলেরো তীরবেগে বেড়িয়ে গেল বাইরের দিকে।

অর্ণব নিজের গাড়িতে উঠে বসতে বসতেই শুনতে পেল অধিরাজের নির্দেশ, “হুটার অন । ফলো দ্য হোয়াইট বোলেরো। যতক্ষণ না লাশ ডাম্প করছে ততক্ষণ আঠার মতো লেগে থাকবে।

ততক্ষণে ক্লাবের ভেতরে ঢুকে পড়েছে দু-দুটো পুলিসের গাড়ি। অফিসার পবিত্র আচার্য প্রায় চলন্ত গাড়ি থেকেই লাফিয়ে নামল। মাটিতে ল্যান্ড করেই শিকারী নেকড়ের মতো বিদ্যুৎবেগে দৌড়েছে ক্লাবের ভেতরের দিকে। তার পেছন পেছন আরও কয়েকজন অফিসার!

ক্লাবের ভেতরটা বেশ অন্ধকার। তা সত্ত্বে সামনের ধাবমান লোকটিকে দেখতে অসুবিধে হচ্ছে না তার। সম্ভবত পলায়নরত ব্যক্তিটি বিশেষ দৌড়ঝাপে অভ্যস্ত নয়। তার জোরে জোরে শ্বাস ফেলার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। তা সত্ত্বেও আপ্রাণ দৌড়চ্ছে। পবিত্র দাঁতে দাঁত পেষে। এখন সে মোটেই দৌড়োদৌড়ি করার মুডে নেই। এখানের কাজ শেষ করেই অর্ণবকে ফলো করতে হবে। বেশি ইঁদুর-বিড়াল খেলার সময় নেই। অন্ধকারেই তার পুলিসি নজর বুঝে নিল ঠিক কতটা দূরত্বে আছে শিকার। সে দৌড়তে দৌড়তেই দেহটাকে শূন্যে ছুঁড়ে দেয়। পরক্ষণেই একদম নিখুঁত হিসাবে গিয়ে হুড়মুড় করে পড়ল লোকটার একেবারে ঘাড়ের ওপর! এরকম উদ্ভট আক্রমণ আদৌ আশা করেনি লোকটি। দু'জনেই জড়াজড়ি করে পড়ে গিয়েছে! পবিত্র তাকে আর কোনোরকম সুযোগ না দিয়েই ক্ষিপ্রবেগে তার বুকের

ওপর চড়ে বসে ঠাটিয়ে এক থাপ্পড় মারল। “ম্যারাথন রেসে নেমেছিস নাকি শা-লা? এখানে সোনার মেডেল কে দেবে তোকে?”

ওপাশ থেকে অধিরাজের হাসি ভেসে এল, “ওকে সি.আই.ডির স্পেশ্যাল লোহার বালা দিয়ে দাও।”

- “হুঁঃ!” লোকটাকে এক ঘুষি মেরে অজ্ঞান করে দিয়ে বলল পবিত্র—“অ্যানাস্থেশিয়া দিয়ে দিয়েছি। পিস অব আ কেক!”

— “গ্রেট।”

(উনিশ)

অন্যদিকে আরেকপ্রস্থ চেজ চলছে।

খাঁ খাঁ শূন্য মাঠ অন্ধছায়া বুকে নিয়ে সাঁৎ সাঁৎ করে সরে যাচ্ছে। দু' পাশে শুধু সার সার ল্যাম্পপোস্ট এই অদ্ভুত জীবন-মরণ সংগ্রামের সাক্ষী। রাস্তায় এই মুহূর্তে একটি মানুষও নেই! একটা দুটো রাতচরা পাখি শুধু উড়ে যাচ্ছে ডানা ঝটপটিয়ে। তার মধ্যেই এক সর্বনেশে অশনি সঙ্কেতের মতো হুটারের কর্ণভেদী আওয়াজ। তীব্রগতিতে ফাকা মসৃণ রাস্তা বেয়ে দ্রুতবেগে ছুটে চলেছে দুটো গাড়ি। একটা সাদা রঙের বোলেরো। তার পেছনে ধেয়ে আসছে পুলিসের গাড়ি।

সামনের গাড়িটা গতিবেগ বাড়িয়েছে। ঠান্ডা হাওয়া হু হু করে নাক, চোখ, মুখে এসে ঝাপটা মারছে। অর্ণব দৃঢ় হাতে স্টিয়ারিং ধরে অ্যাকসিলেটরে চাপ বাড়িয়ে দেয়। গাড়ির গতিবেগ প্রায় একশো কুড়ি ছুঁই ছুঁই। দুটো গাড়ির মধ্যে পঞ্চাশ গজের সামান্য বেশি দূরত্ব। বোলেরোটার কাছে যাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করছে অর্ণব। কিন্তু বোলেরোর মালিক সহজে ধরা দেবার পাত্র নয়। সেও সম্ভবত দাঁতে দাঁত চেপে গাড়ি চালাচ্ছে। এদিকে যত গতিবেগ বাড়ছে, ওদিকেও তাল মিলিয়ে ততটাই বাড়ছে। — "গুড জব"। তার হেডসেট কড়কড় করে ওঠে, "একবার এগোও, একবার পিছনে যাও।"

অর্ণব প্রায় আকাশ থেকে পড়ে। এ তো পুরো উলটো গল্প। সে বিস্মিত, "ওকে আমরা ধরবো না স্যার?"

অধিরাজ হাসল, "ওকে ধরলে কিছুই হাতে আসবে না। পোষা কুত্তা! বরং ওকে এমন ভয় দেখাও যাতে ও সেই ভুলটাই করে যেটা আমি চাইছি।"

"স্যার!"

"আমি এই লিডটা জাম্প করে পরের লিডে যেতে চাই। ওকে এমন ভয় দেখাও যাতে টেনশনের চোটে বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পায়। লাশটা যাতে ডাম্প করে সেই সুযোগটা ওকে অবশ্যই দেবে। সচরাচর কুকুরেরা ভয় পেলে সবচেয়ে আগে মালিকের কাছেই দৌড়য়।"

"গট ইট।" অর্ণব অ্যাকসিলেটরের ওপর চাপ কমাল, "কিন্তু আপনি কোথায়?"

“বাঁ দিকে তাকাও। তোমার ঠিক পাশেই আছি।”

সে বাঁদিকে তাকাতেই দেখতে পেল শুনশান মাঠের ওপর দিয়ে একটা আলো তীব্র বেগে ছুটে চলেছে তার গাড়ির সমান্তরালে। “আপনি... মাঠের ওপর দিয়ে বাইক চালাচ্ছেন!”

“নয়তো কি হাইরাইজের ওপর দিয়ে চালাবো?” অধিরাজ সিরিয়াস, “মুন্ডুটা সামনে ঘোরাও। তুমি যেখানে থামবে, সেখান থেকেই আমার দৌড় শুরু! আগেই কেঁচিও না। যতটা পারো তেড়ে যাও। বুঝতে যেন না পারে গোটা কেসটাই গট-আপ। আমরা এখন পুরো দাবা খেলছি। তুমি ক্যুইন হয়ে তেড়ে যাচ্ছ। পবিত্র ও গজ হয়ে ধেয়ে এল বলে। ও চেকমেট বাঁচানোর জন্য তোমার দিকে কনসেনট্রেট করতে গিয়ে ভাবতেই পারবে না যে তৃতীয়দিক দিয়ে বোড়ে এগিয়ে আসছে। এটাই স্ট্র্যাটেজি।”

“ওকে।”

অর্ণব ড্রাইভিঙে মন দেয়। তার সঙ্গে ঠিক সমান্তরালে একটু দূরেই তাল মিলিয়ে তীব্রবেগে ছুটে চলেছে বাইক। অধিরাজের মাথায় কালো রঙের হেলমেট। লেদার জ্যাকেটের চেইন গলা অবধি টানা। তবুও শীত শীত করছে। এবড়ো খেবড়ো মাঠের ওপর দিয়ে বাইক চালানো মোটেই সহজ কাজ নয়। থেকে থেকেই লাফিয়ে লাফিয়ে উঠেছে। কিন্তু সে হাল ছাড়ার লোক নয়। যতক্ষণ পাশ থেকে অনুসরণ করা যায় ততক্ষণই করবে। মাঠ শেষ হয়ে গেলে তখন অর্ণবের গাড়ির পেছনে যেতে হবে।

অর্ণব এবার আবার অ্যাক্সিলেটরের ওপর চাপ মারে। একটু না এগোলে খেলাটা জমবে না। ভয় যখন দেখানোর অর্ডার আছে তখন ভয়ের কোটা শেষ করেই ছাড়বে। তার গড়িটা আস্তে আস্তে বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়েছে। দুটো ছুটন্ত গাড়ির মধ্যে ব্যবধান আগের থেকে অনেকটাই কম। সে একহাতে স্টিয়ারিং চেপে ধরে আরেক হাতে তুলে নেয় রিভলবার। আপনমনেই হেসে বলল, “টেক দিস ডিয়ার।”

পরপর দুটো ফায়ারিঙের আওয়াজ। শুনশান রাস্তা মুহূর্তে সচকিত হয়ে উঠল। যে কুকুরগুলো শুয়েছিল, তারা তড়াক করে লাফিয়ে উঠে শোরগোল ফেলে দিল। কেউ

লেজ গুটিয়ে কুইকুই করছে। কেউ বা গর্জন করে উঠে অর্ণবের গাড়ির পেছনে দৌড়ল। কিন্তু যে স্পিডে গাড়ি চলছে, তার সঙ্গে ছুটে পারবে না। অগত্যা তাদের ব্যর্থ আস্ফালন। ওপ্রান্তে অধিরাজের হাসির শব্দ শোনা গেল! "জিনিয়াস গুরু।"

বোলেরোটা একমুহূর্তের জন্য যেন শ্লথ হয়ে গেল। সম্ভবত ড্রাইভার ঘাবড়ে গিয়েছে। একটু বুঝি থতমতও খেল। পরক্ষণেই অবশ্য ফের গতি ধরে নিল। সেই ফাঁকেই বেশ খানিকটা কভার করে নিয়েছে সে।

- "ও নিউটাউনের দিকে যাচ্ছে।" অর্ণব বলল, "মনে হয় ন্যাশনাল হাইওয়ে টুয়েলভ্ ধরবে।"

"এন এইচ টুয়েলভ্ ধরার সম্ভাবনাই বেশি।" অনেকক্ষণ পরে পবিত্রর গলা শোনা গেল, "সম্ভবত নিউটাউন টু বিধাননগরের মাঝখানেই বডিটা ডাম্প করবে। ওখানে অ্যাকোয়াটিকার আশেপাশে প্রচুর ফাঁকা জায়গা।"

- "রাইট ইউ আর।" অধিরাজ উত্তর দিল, "অর্ণব, লিড করো। আমরা পেছনে আছি।"

- "ইয়েস স্যার।" অর্ণব বুঝে গেল এবার কী করতে হবে। দাবা খেলতে না পারলেও কার রেসিং এবং চোর-পুলিশ খেলায় সে ওস্তাদ। নিজের কেরিয়ারে কম চেজ করেনি। এখন তো রীতিমতো মজাই লাগে। সে মুচকি হেসে সর্বশক্তি দিয়ে অ্যাক্সিলেটরে চাপ দিল। এবার হুড়মুড়িয়ে ওর ঘাড়ে গিয়ে পড়বে। তারপর যা থাকে কপালে!

আস্তে আস্তে দুটো গাড়ির মধ্যে ব্যবধান কমছে। সাদা বোলেরোর পেছনের পুলিস-কার এঁটে আছে নাছোড়বান্দার মতো। তীব্র হুটারের শব্দে আকাশ কাঁপছে। আলো-আঁধারি রাস্তার ওপর দিয়ে হুশ হুশ করে ছুটে চলেছে দুটো গাড়ি। তাদের ডিপারের আলো দানবের চোখের মতো জ্বলজ্বল করে। অর্ণবের গাড়ির ঠিক পাশাপাশিই বুলেটের গতিতে ছুটছে রেসিং বাইক। সব মিলিয়ে রীতিমতো উত্তেজনাময় পরিস্থিতি।

প্রচণ্ড জোরে একটা শব্দ! ধাতব আওয়াজে আবার সচকিত হয়ে উঠল রাত্রি। অর্ণব চেজ করতে করতেই অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল। সুযোগ পেয়ে বোলেরোর পেছনটা জোরদার ঠুকে দিয়েছে! বোলেরোটা একটু কেঁপে উঠেই সামাল দিল। স্পিড আরও বাড়িয়েছে। সম্ভবত এই মুহূর্তে দুটো গাড়িই স্পিড লিমিটের চূড়ান্ত পর্যায়ে!

সামনের বোলেরোর ড্রাইভার বোধহয় বিপন্ন বোধ করে। পুলিসের গাড়ি ইতিমধ্যেই একবার ঠুকে দিয়েছে। সে সাইড মিররে দেখতে পেল, ফের যমদূতের মতো তেড়ে আসছে গাড়িটা! সে দাঁতে দাঁত চেপে খিস্তি দেয় – ‘শুয়োরের বাচ্চা।’ -

আরও কিছু বোঝার আগেই আরেকটা চরম ধাক্কা! হারামিরা ইচ্ছে করেই ধাক্কা মারছে! এত স্পিডে এসে গোঁত্তা মারলে অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা। আরেকটু হলেই বেসামাল হয়ে যাচ্ছিল গাড়িটা। শুধু বোলেরোর মতো বিশালবপু গাড়ি বলে এখনও টিকে আছে। গেটকীপারটি প্রাণপণে স্টিয়ারিং আঁকড়ে ধরে। ম্যাডামকে যে ফোন করে বিপদের কথা জানাবে সে উপায়ও নেই। এতক্ষণে বোধহয় ম্যানেজারও পুলিসের হেফাজতে। যেভাবে তাড়া করেছে খানকির ছেলেরা যে ফোন করার ফুরসতটুকুও পাচ্ছে না। তার ওপর ফায়ারও করছে। সে অসহায়ভাবে একবার পেছনের সিটের লম্বা বস্তাটার দিকে তাকায়। এটাকে এবার কোথায় ফেলবে! আফসোসে ঠোঁট কামড়ায় লোকটা, ম্যাডামকে একটা ফোন করতে পারলে ভালো হত। কিন্তু...। আর কিছু ভাবার সময় পেল না সে। ‘ঠং’ করে আবার সেই ভয়ঙ্কর ধাতব শব্দ। এবার আর গাড়ি নয়, সে নিজেই কেঁপে উঠল। ওরা গুলি ছুঁড়ছে! গুলিটা টায়ারে না লাগলেও গাড়ির গায়ে লেগেছে। এনকাউন্টার করে দেবে না তো! এরকম বিপদে পড়তে হবে জানলে কে এই কাজ করত! ম্যাডাম বলেছিলেন, “কিচ্ছু হবে না। পুলিস তোর টিকিটিও ছুঁতে পারবে না। প্রত্যেকবার কড়কড়ে দু লাখ! ভেবে দ্যাখ।

ম্যাডামের কথার মধ্যে অদ্ভুত একটা নেশা ছিল। মহিলার সম্মোহিনী শক্তির আবর্তে পড়ে গিয়েছিল। অমন রূপবতী নারী যদি এভাবে কোনও অনুরোধ করে, তবে তার মতো পুরুষের সাধ্য নেই তাঁকে প্রত্যাখ্যান করার। তার ওপর আবার টাকার অঙ্কটা! এত টাকা সে একসঙ্গে কখনও দেখেনি। কিন্তু তখন কে জানত......!

– “এই নাও, এন এইচ টুয়েলভ্ ধরল।” পবিত্র’র কণ্ঠস্বর ব্লু-টুথের মাধ্যমে দুই অফিসারের কানে বেজে উঠল, “এবার ও কোনদিকে যাবে তা নিয়ে বেটিং করবে কেউ?”

“অনেক অপশন আছে।” অধিরাজ বাইক নিয়ে এবার রাস্তায় উঠে এসেছে। একটা স্পিড ব্রেকারের ধাক্কায় বাইক লাফিয়ে উঠেছিল। ঝাঁকুনিটা সামলে নিয়ে বলল, “মা

ফ্লাইওভার ধরবে, কিংবা রাসবিহারী অ্যাভেনিউ। আবার কালিকাপুর রোডও ধরতে পারে। দুটো চান্সই প্রবল।”

“মানে আইদার বালিগঞ্জ ফাঁড়ি অর নিউ আলিপুর!” অর্ণব আস্তে আস্তে বলল ।

“আমার সিক্সথ সেন্স তাই বলছে। লেস্ সি।” সে উত্তর দেয়, “অর্ণব, তোমার পেছনেই পবিত্র আসছে। প্রায় ধরেই ফেলেছে আমাদের। ওকে সাইড দাও। গেটকীপারকে দেখিয়ে দিই।” -

এবার হিচকক থ্রিলার অর্ণব পাশের আয়নায় দেখল অফিসার পবিত্র আচার্যের গাড়িটা প্রবল বিক্রমে হু হু করে এগিয়ে আসছে এদিকেই। সে গাড়ির গতিবেগ কমিয়ে একটু পিছিয়ে পড়ে। পবিত্রর গাড়িটা হুশ্ করে বেরিয়ে গেল। অর্ণবকে দেখে পবিত্র হেসে মাথা ঝাঁকাল। হেডসেটে শোনা গেল তার কণ্ঠস্বর ‘লেটস প্লে ব্রো।”

পবিত্র আচার্য'র এই কথার অর্থ সে খুব ভালোভাবেই জানে। অর্থাৎ সেই পুরনো খেলাটাই খেলতে হবে। এ খেলা ওরা আগেও বেশ কয়েকবার খেলেছে। অর্ণবের মুখে একটা দুষ্টু হাসি ভেসে ওঠে। “গাইজ ওকে যতদূর তাড়িয়ে নেওয়া সম্ভব নিয়ে যাও।” ফের অধীরাজের গলা শোনা যায়, “আমি চাইনা ও কিছু ভাবার সময় বা সুযোগ পাক।”

পবিত্র তখন বোলেরোর পাশে পৌঁছে গিয়েছে। প্রাণপণে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে গাড়িটাকে একদম বোলেরো প্রায় উপরে নিয়ে ফেলল। প্রচন্ড জোর শব্দ। জবরদস্ত ধাক্কা। গাড়ি এবং চালক দুজনেই কেঁপে উঠেছে। সামলে উঠতে না উঠতেই পাশ থেকে আবার আক্রমণ। পবিত্র ঠান্ডা গলায় উচ্চারণ করল “অর্ণব।”

অর্ণব তৈরিই ছিল। চালক কিছু বোঝার আগেই সে পেছন দিক দিয়ে ধড়াম করে মারলো। তবে ওরা এমনভাবে ঠুকছে যাতে অ্যাক্সিডেন্ট না হয়।এ কৌশল অধিরাজের কাছ থেকেই শেখা। কত স্পিডে কতটা জোরে ঠুকলে গাড়িটা উল্টে যাবে না, এই গোটা ক্যালকুলেশন তারই। অপরাধীর রক্তহিম করার জন্য যথেষ্ট। বেশ কিছুক্ষণ ধরে এই ঠোকাঠুকি চলল। বোলেরোর ড্রাইভার অসহায় বোধ করে। একটা গাড়ি পাশ থেকে এসে গোঁত্তা মারছে, তো আর একটা পেছন থেকে। সে স্পষ্ট বুঝতে পারল, এরা আজ তাকে মারার মুডেই আছে। গাড়িটাকে উল্টে দিতেই চায়। বুঝতে পেরেছে গ্রেফতার করে লাভ

হবে না তাই . . . .। ভাবতেই তার ভুরু কুটিল ভঙ্গি ধারণ করে। কুকুরগুলো মাংস না পেলে তাড়া করা ছাড়বে না। ওদের যে করেই হোক ডাইভার্ট করে দিতে হবে। লাশটা ডাম্প করতে পারলে বোধহয় ভালো হতো, কিন্তু করবে কিভাবে। সুযোগই দিচ্ছে না। দুর দিক থেকে রে রে করে তেড়ে আসছে। ড্রাইভ করবে না লাশটাকে ফেলবে।

পবিত্র বোধহয় তার মনোভাব বুঝতে পেরে কিছুটা ঢিলে দিল। আস্তে আস্তে বললো "ওকে, বয়েজ ডিনার ব্রেক।"

অর্ণব মনে মনে হেসে ইচ্ছে করেই একটু পিছিয়ে পড়তে থাকে। তার পেছনেই বাইকে অধিরাজ। অর্ণব তার কণ্ঠস্বর শুনতে পেল, "ঢিল দাও।"

- "ওকে বস্।" পবিত্র'র গাড়ির স্পীডোমিটারের কাঁটা ধীরে ধীরে নীচে নামতে থাকে। অর্ণবও পিছিয়ে পড়ছে। এখন পবিত্র আর অর্ণবের গাড়ি পাশাপাশি। ঠিক তাদের থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে ছুটে চলেছে বাইক। রাস্তায় এইমুহূর্তে এই রুদ্ধশ্বাস রেস দেখার জন্য কোনও দর্শক নেই। শুধু সার সার ল্যাম্পপোস্ট এই অদ্ভুত প্রতিযোগিতা দেখে যাচ্ছে। পিঙ্গল আভার রেশ চিরে দিয়ে বিদ্যুৎবেগে ছুটে চলেছে সাদা বোলেরো। তার থেকে কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে ধাওয়া করছে দু দুটো পুলিস-কার। ঠিক তাদের পেছনেই নিজেকে লুকিয়ে তুমুল স্পীডে বাইক।

ঠান্ডা হাওয়া এবার অর্ণবের কানের পাশ দিয়ে হু হু করে বেড়িয়ে যাচ্ছে। মাথার চুল এলোমেলো। চোখে হাওয়ার ঝাপটা লাগলেও খুব অসুবিধে হচ্ছে না। সে এসবে অভ্যস্ত। আস্তে আস্তে অ্যাকসিলেটরের ওপর চাপ কমাতে থাকে। পবিত্র তার আগে চলে এসেছে। হেডসেটে তার গলা, "বোলেরোর স্পীড বাড়ছে। কী করব?"

''আরও একটু পিছিয়ে এসো।" অধিরাজ বলল, "ওকে এবার একটু স্পেস দাও। ডঃ বিজয় জয়সওয়ালের আত্মার শান্তির জন্য তিরিশ সেকেন্ড মৌনতা পালন করা যাক। ডাম্প করার জন্য এনাফ।"

-"বেশ।"

বোলেরোর ড্রাইভার এবার ওদের একটু পিছিয়ে পড়তে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। বাপ্ রে! কী চেপেটাই না ধরেছিল! তার স্পীডোমিটারের কাঁটা একশো কুড়ি ছুঁয়ে

ফেলেছে। নিকুচি করেছে ট্র্যাফিকের। আজকে বাঁচলে, কালকে ট্র্যাফিক পুলিসের কথা ভাববে। কিন্তু এখনই লাশটাকে না ফেললে যে চলছে না! কিন্তু তার জন্য সময় চাই। গাড়ি থামিয়ে, পেছনের দরজা খুলে বস্তাটাকে টেনে নামাতে হবে। খুব দ্রুত কাজটা করলেও মিনিমাম কুড়ি সেকেন্ড লাগবেই। অত সময় কি হাতে আছে?

সে সামনের আয়নার দিকে তাকিয়েই অবাক হয়ে গেল! এ কী, গাড়িগুলো গেল কোথায়! একটু আগেই তো পেছন পেছন আসছিল। এখন প্রায় দেখাই যায় না। অনেক দূরে বিন্দুর মতো হেডলাইট দেখা যাচ্ছে। ওরা এতটা পিছিয়ে পড়ল কী করে! এরকম আশাতীত সৌভাগ্যে খুশী হওয়া উচিত না সন্দেহ করা উচিত— কোনোটাই সে ভেবে উঠতে পারল না। টেনশনে ঘেমে নেয়ে জল হয়ে গিয়েছে। মাথাটাও ঠিকমত কাজ করছে না। শুধু একটাই চিন্তা মনে এল। হয়তো বডি দেখলে ওরা ওখানেই থেমে যাবে। লাশটা ফেলতে হবে। লোকটা সশব্দে গাড়িতে ব্রেক মারল। গাড়ি থামতে না থামতেই দরজা খুলে দৌড়ে গেল পেছনের দরজার দিকে। দ্রুতহাতে বস্তাটাকে নামানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছে। উঃ! কী ভারী মাইরি! ওদিকে ওরা যে ক্রমাগতই এগিয়ে আসছে...

সে দাঁতে দাঁত চেপে সর্বশক্তি দিয়ে টেনে হিঁচড়ে বস্তাটাকে নামিয়ে আনল। উত্তেজনায়, দুশ্চিন্তায়, পরিশ্রমে ক্রমাগতই ঘামছে। তার কপাল, মুখ বেয়ে টস্ টস্ করে ঘাম পড়ছে। কোনোমতে লাশটাকে নামিয়ে এনেই লোকটা ফের দৌড়ল সামনের দিকে। দরজা খুলেই বিদ্যুৎগতিতে উঠে বসল ড্রাইভিং সিটে। ওদিকে পুলিসের গাড়ির আলো স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে।

– "বডি ডাম্পড্।" পবিত্র বলল, "সাদা বস্তাটাকে দেখতে পাচ্ছি।" -"বেশ।" অধিরাজ ডাকল, "অর্ণব!"

"ইয়েস স্যার।"

"তোমার দৌড় ওখানেই শেষ। তুমি লাশটাকে পাহারা দেবে। ফরেনসিক টিমকে খবর দেবে। ওরা যেন ইমিডিয়েটলি এসে বডি নিয়ে যায়। গট ইট?"

"স্যার!"

পবিত্র বলল, "আর আমি কী করব?'

"মিনিট পাঁচেক ব্রেক নিয়ে তুমি আমার পেছনে আসবে। একদম চুপচাপ। আমি তোমায় বলে দেব কোথায় আসতে হবে।"

"তুমি শিওর যে ও সঠিক জায়গাতেই যাবে?" পবিত্রর সন্দেহ যায়নি।

- "চান্স নিয়ে দেখা যাক। নয়তো ও ব্যাটা তো রাডারের মধ্যেই ত আছে। রাস্তার একপাশে বস্তাটা পড়েছিল। অর্ণব ঠিক তার সামনেই গাড়ি থামাল। তাড়াহুড়োয় লাশটা ঠিকভাবে ফেলতে পারেনি। সে গাড়ি থেকে নেমে ধীরে সুস্থে এগিয়ে গেল বস্তার দিকে। ইতিমধ্যেই ডিপারের আলোর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে বস্তা থেকে একটা মানুষের হাত বেরিয়ে এসে এলিয়ে পড়েছে রাস্তার ওপরে। অর্ণব হাতে গ্লাভস পরতে পরতেই ঠিক তার পেছনে আরেকটা গাড়ির ব্রেক কষার আওয়াজ শুনতে পায়। পাবত্র আচার্য এসে হাজির। সে এবং সঙ্গের লেডি অফিসাররা হাতে গ্লাভস পরে গাড়ি থেকে ঝুপঝুপ করে নামছে। পবিত্র তার দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচিয়ে বলল, হিপোপটেমাসকে বের করা যাক।"

"চল, সবাই মিলে টেনেটুনে বস্তার ভেতর থেকে লাশটাকে বের করে। কোনও সন্দেহ নেই, ডঃ বিজয় জয়সওয়ালই বটে! অর্ণব দীর্ঘশ্বাস ফেলে। এত চেষ্টার পরেও লোকটাকে বাঁচানো গেল না! সর্বনাশিনী ফের মাত দিয়ে বেরিয়ে গেল। 1

"গট্ হিম রাজা।"

"গ্রেট। ফরেনসিককে খবর দাও। দুর্বাসা যদি বেরিয়ে গিয়ে না থাকে তবে তাঁকেও আসতে বলো। এই লোকটার পোস্টমর্টেম রিপোর্ট তাড়াতাড়ি চাই।" অর্ণব দেখল বাইক আরোহী একেবারে আলোর গতিবেগে তাদের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। যেভাবে হেলে গিয়ে তাদের গাড়িটাকে কাটাল তা বোধহয় কোনও স্টান্টম্যানের পক্ষেই সম্ভব! পবিৎৰ হৈ হৈ করে উঠল, "উফফ্ রাজা! সেক্সি... সেক্সি! ড্যাম সেক্সি মুভ ড্যুড্!"

বাইক আরোহী তাদের দিকে ঘাড় ঘুড়িয়ে হাত তুলে থাম্বস্ দেখাল! তাকে এখন সাদা বোলেরোর পেছনে যেতে হবে। বোড়ে যদি রানির কাছে নিয়ে যায় তবেই কেল্লা ফতে। বোড়ে ভয় পেয়ে যদি রানিকেও একটু নার্ভাস করে দেয়, তাহলে তো কথাই নেই। অনেক বুদ্ধিমান লোকও নার্ভাস হয়ে গেলে ভুল করে বসে। বাকিটা...!

(কুড়ি)

মেরিলিন প্ল্যাটিনাম সোসাইটির সামনে এসেই থামল সাদা বোলেরো। গেটকীপার একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। পুলিস কারের আর নাম গন্ধ নেই। হয়তো ওরা লাশটাকে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। তার দিকে আর খেয়াল করেনি। বাপ রে! কী তাড়াটাই না করেছিল। এখনও তার বুক কাঁপছে। একসময় তো মনেই হচ্ছিল যে তাকে ঠুকেই ছাড়বে! শেষপর্যন্ত যে ছেড়ে দিয়েছে এই তার চোদ্দপুরুষের ভাগ্য!

এখন রাত প্রায় দেড়টা বাজতে চলল। 'মা' ফ্লাইওভার ধরলে আরও তাড়াতাড়ি আসা যেত। কিন্তু ইচ্ছে করেই একটু ঘুরপথে এসেছে। কে বলতে পারে, হয়তো পুলিস ইতিমধ্যেই অ্যালার্ট জারি করে দিয়েছে! সোজা রাস্তাতে গেলেই ধরে ফেলবে। তাই অন্য পথেই আসতে হয়েছে। সে গাড়িটাকে কোনোমতে দাঁড় করিয়ে ছুটে গেল মেরিলিন প্ল্যাটিনামের দিকে। ম্যাডামের সঙ্গে দেখা করতেই হবে তাকে। এবারের টাকাটা পেয়ে গেলে গা ঢাকা দেবে। যতদিন না সব ঠান্ডা হচ্ছে ততদিন গর্ত থেকে আর বেরোচ্ছে না! যদি মহিলা টাকা দিতে তেড়িবেড়ি করে, তবে ব্ল্যাকমেলিং ছাড়া আর কোনও রাস্তা নেই। সে যদি ডোবে তবে ম্যাডামকে নিয়েই ডুববে।

লোকটা তাড়াহুড়োর চোটে খেয়ালই করেনি যে উলটোদিকেই একটা বাইক দাঁড়িয়ে আছে। এবং দীর্ঘদেহী হেলমেট পরা বাইক আরোহী ঠিক বাইকের গায়েই ঠেস দিয়ে কারোর অপেক্ষা করছে। তার সেদিকে তাকানোর সময়ই নেই। সে তড়িঘড়ি গেটের দিকে ছুটে গেল। আজ সম্ভবত অন্য একজন গেটকীপার নাইটশিফট করছে। তাকে কিছু একটা বলেই লোকটা কমপ্লেক্সের মধ্যে ঢুকে গেল।

অধিরাজ একটুও তাড়াহুড়ো করল না। লোকটাকে কিছুতেই বুঝতে দেওয়া যাবে না যে পুলিস পেছনেই আছে। অতএব সে ধীরে সুস্থে হেলমেট খুলল। তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে যায় সেদিকেই। "আপনি...?"

এই গেটকীপারটিকে এর আগে দেখেনি অধিরাজ। সে চোখ কুঁচকে ছেলেটির মুখ একঝলক দেখে নিল। তারপর আইডি কার্ডটা বের করে। নীরবে দেখাল।

- "সি.আই.ডি!" বেচারির চোখ কপালে! অধিরাজ ঠোঁটে আঙুল রেখে ইশারায় তাকে চুপ থাকতে বলে দৌড়ে চলে গেল ভেতরের দিকে। মেরিলিন প্ল্যাটিনামের অন্যান্য সিকিউরিটি গার্ডরা সকৌতূহলে তার দিকে তাকালেও বাধা দিল না। তারা ওকে সি.আই.ডি অফিসার হিসাবে চেনে। বিজয় জয়সওয়ালের ব্যাপারে এতবার ওদের ধমকেছে আর জেরা করেছে যে সহজে ভোলার কথাও নয়।

মেরিলিন প্ল্যাটিনামের বিল্ডিঙে দুটো লিফট থাকলেও একটা আবার আউট অব অর্ডার। অন্যটা অবশ্য চলছে। অধিরাজ যতক্ষণে হুড়মুড়িয়ে সেখানে পৌঁছল, ততক্ষণে লিফটটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সে দেখল লিফটটা ওপরের দিকে উঠছে...! ফার্স্ট ফ্লোর... সেকেন্ড ফ্লোর...!

সে বিন্দুমাত্রও দেরি না করে সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে ওপরের দিকে উঠতে শুরু করল। লিফটটা থামবে কোথায়? কোন ফ্লোরে যাচ্ছে? পাগলের মতো প্রতিটি ফ্লোরে লিফটের নির্দেশের দিকে তাকাচ্ছে। লিফট এখনও উঠছে।

অধিরাজের কোনওদিনই সিঁড়ি ভাঙতে কষ্ট হয় না। কিন্তু আজ চারটে ফ্লোরের সিঁড়ি ভেঙেই মনে হল, দম বন্ধ হয়ে আসছে। জ্বরে গোটা দেহ যেন পুড়ে যাচ্ছে। জ্যাকেটটা খুলে ফেলতে পারলে বোধহয় ভালো হত। দরদরিয়ে ঘামছে। অথচ সময় নেই। সে লিফটের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ছুটছে। একটার পর একটা ফ্লোর চলে যাচ্ছে! অথচ লিফটের থামার নামই নেই! এখনও উঠে চলেছে। সাত... আট... নয়! কি অধিরাজের চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে। আর কত ওপরে উঠবে! ও কি কারোর ফ্ল্যাটে যাচ্ছে? নাকি...! ছাতে নয়তো? সে কোনোমতে সজোরে শ্বাস নিয়ে ফের দুড়দাড় করে সিঁড়ি ভাঙতে শুরু করল। চোখের সামনে সার সার সিঁড়ি। একের পর এক লাফিয়ে টপকে যাচ্ছে। ওদিকে লিফট উঠছে...! দশ... এগারো... বারো...!

শেষপর্যন্ত টুয়েলভথ্ ফ্লোরে গিয়ে থামল লিফট! স্বাভাবিক। কারণ তার ওপরে ছাত ছাড়া আর কিছু নেই। অধিরাজ তখনও তিনটে তলা নীচে। এতক্ষণ গাড়ি চেজ করেছে। এবার লিফট চেজ করছে। নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসছে...

"পবিত্র, কতদূর?" সে হাঁফাতে হাঁফাতেই প্রশ্ন করে।

"ব্যাড লাক বস্।" পবিত্র জানাল, "একটা টায়ার পাংচার হয়ে গিয়েছে। এক দু-মিনিট লেট হতে পারে। মেরিলিন প্ল্যাটিনাম তো?" "হ্যাঁ। ছাতে যাচ্ছে সম্ভবত...! কাম শার্প.........!"

"এক্ষুনি যাচ্ছি...।"

অধিরাজ ওপরের দিকে প্রাণপণে দৌড়তে থাকে। গতি তীব্র থেকে তীব্রতর! আঃ! এত কষ্ট হচ্ছে কেন! বারবার মনে হচ্ছে পারবে না। পবিত্রদের গাড়িটাও এখনই পাংচার হতে হল...!

সে সবেগে টুয়েলভথ্ ফ্লোর ক্রস করল। এর ওপরে শুধু ছাত। দৌড়তে দৌড়তেই দেখতে পেল ছাতের দরজা খোলা। মেরিলিন প্ল্যাটিনামের ছাতেও সুন্দর রং-বেরঙের আলো কারুকাজ। সামনের অংশটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এখান থেকে লোকটাকে দেখা যাচ্ছে না। ও নিশ্চয়ই ওপরে একা নেই। একটা মানুষের ছুটে আসার শব্দও যেন পাওয়া যাচ্ছে। ছুটতে ছুটতেই কোমরের বেল্টে হাত চলে গিয়েছে তার...!

কিন্তু কোমর থেকে যন্ত্রটাকে বের করে আনার আগেই অতর্কিতেই সামনে এসে দাঁড়াল কেউ! কিছু বোঝার আগেই 'থপ্' করে একটা আওয়াজ! অধিরাজ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো কেঁপে উঠল। সে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে সামনের দিকে দেখার চেষ্টা করল একবার। মর্মান্তিক সে দৃষ্টি! দুনিয়ার ব্যথা, অবিশ্বাস আর বিস্ময় মিলে মিশে একাকার! সামনে ওটা কে! বুকের মধ্যে একটা তীব্র যন্ত্রণা! শরীর থেকে গরম কিছু একটা গলগল করে বেরিয়ে যাচ্ছে। চোখ ঝপসা হয়ে আসছে। নিঃশ্বাস নিতে পারছে না। বুকের ওপর চরম ভার! কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ করেই বাবার গলা শুনতে পেল সে, "কবে কী ঘটিয়ে বসবে সেই ভয়েই...!" আবার তার মধ্যেই যেন ডঃ চ্যাটার্জী চেঁচিয়ে উঠলেন, —"খুন করে ফেলব... একদম খু-উ-ন করে। ফেলব...!"

শেষমুহূর্তের জন্য একঝলক চেতনা বিদ্যুৎচমকের মতো চমকে উঠল। সামনের বন্দুকধারীকে দেখে একবারের জন্য ঠোঁট কেঁপে উঠল তার। আততায়ীকে চিনতে পেরেছে! শ্বাস নেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করতে করতে উচ্চারণ করার চেষ্টা করল তার নাম- "রি...রিরিয়া..."

অস্ফুটে অধিরাজের ঠিক সামনেই তখন দাঁড়িয়ে আছে এক কৃষ্ণাঙ্গী! অবিকল যেন জামাকাপড়ের শোরুমে সাজানো কালো রঙের ম্যানিকুইন! তার হাতে উদ্যত রিভলবার। সাইলেন্সার লাগানো। আঙুল ট্রিগারে। ভয় পেয়ে মেয়েটি কেঁদে উঠল, "সরি! সরি! আমি তোমাকে মারতে চাইনি... মারতে চাইনি... আই অ্যাম সরি।"

রিয়া সামান্থা বাজাজ! অধিরাজের মস্তিষ্ক শুধু এইটুকুই জানাতে পেরেছিল তাকে। তারপরই সব অন্ধকার! তার ছ'ফুট চার ইঞ্চির দীর্ঘ দেহটা সংজ্ঞাহীন হয়ে টলে পড়েই যাচ্ছিল। তার আগেই পেছন থেকে দুটো কোমল হাত ধরে ফেলল তাকে। একটি নারীকণ্ঠ প্রচণ্ড রাগে বলল 'রি-য়া!'

- "আমি কিছু করিনি!" রিয়া সজোরে কেঁদে ওঠে- "ওপরে ঐ লোকটা মরে পড়ে আছে। আমি ওকেও মারতে চাইনি।" আমি শুধু ভেবেছিলাম মিঃ বাজাজ আসছে।... আমি মিঃ বাজাজকেই তো মারতে চেয়েছি.. কী করে বুঝব এ অন্য লোক!"

ইউ শট্ হিম্ লাইক দিস্!" অপর নারীকণ্ঠ চরম আক্রোশে হিসহিসিয়ে বলল, – "ইউ ইডিয়ট! স্টুপিড গার্ল! হেল্প মি।"

"ইজ হি ডেড?"

অন্য নারীটি ধর্মকে উঠল, "আই সেইড, হেল্প মি!"

"ওকে।" ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে রিয়া বাজাজ হাত লাগায়। ছ' ফুট চার ইঞ্চি লম্বা একটি বলিষ্ঠ পুরুষকে ধরে রাখা একা মেয়ের কাজ নয়। দু'জনে মিলে ধরাধরি করে কোনোমতে তাকে চিৎ করে শুইয়ে দিল মেঝের ওপরে। দ্বিতীয় মেয়েটি তার প্যান্টের পকেট থেকে মোবাইলটা বের করে লাইন কেটে দেয়। কান থেকে সযত্নে ব্লু-টুথ ওয়্যারলেস ইয়ার ফোন খুলে নিতে নিতে রিয়াকে বলল, — "নাউ লিভ! এখনই এখান থেকে চলে যা।" রিয়া ভয়ার্ত ভাবে দুড়দাড় করে সিঁড়ি ভেঙে নেমে যায়। দ্বিতীয় মেয়েটি অধিরাজের বুকের ওপরে মাথা রাখে। প্রাণপণে হার্টবিট শোনার চেষ্টা করছে। তাকে উন্মত্তের মতো লাগছিল। কী প্রচণ্ড রক্তপাত হচ্ছে! হৃৎস্পন্দনের আওয়াজ নেই! 1

সে পাগলের মতো নিথর দেহটাকে হাতড়ে হাতড়ে খুঁজতে থাকে সামান্যতম জীবনের চিহ্ন। নেই? নিঃশ্বাস পড়ছে না! একদম শেষ! অসম্ভব! হতে পারে না। এত সহজে ও

যেতে পারে না। এখনও অনেক খেলা বাকি। আজ পর্যন্ত এই মানুষটার মতো ভালো কেউ বোঝেনি তাকে! তার মন আর কারোর কাছে এত সহজবোধ্য নয়! এভাবে তাকে বিপদে ফেলতে আর কেউ পারবে না। এইভাবে তাকে ভুল চাল খেলতে বাধ্য করতে পারেনি কেউ। ওকে কী প্রচণ্ড মরিয়াই না করে তুলেছিল এই লোকটা! তার একটা ভুলের জন্য ও গেটকীপার অবধি পৌঁছেই গিয়েছিল। ইডিয়টটাকে না মারলে হয়তো তাকেও ধরে ফেলত। কিন্তু রিয়া...!

মেয়েটা অধিরাজের হাত ধরে পালস্ বোঝার চেষ্টা করছে। তাতেও যখন কিছু বোঝা গেল না তখন জ্যাকেট ধরে ঝাঁকুনি দিল বেশ কয়েকবার! মনে মনে বলল— "কাম্ অন্! ওয়েক আপ! আমরা দু'জন চেসবোর্ডের দু'দিকে আছি। দু'জন শত্রু। কিন্তু তাও তুমি আমার সবচেয়ে কাছাকাছি। অনেক পুরুষ আমার পেছনে ছুটেছে, কিন্তু তোমার মতো এমন একনিষ্ঠভাবে কেউ আমায় ধাওয়া করেনি। তোমার মস্তিষ্কে, তোমার বুকে, চেতনায়-অবচেতনে, স্বপ্নে-জাগরণে শুধু আমিই আছি! প্রত্যেক নারীর মধ্যে পাগল প্রেমিকের মতো আমাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছ তুমি! আমাকে এখন প্রত্যাখ্যান করতে পারো না। এভাবে খেলা শেষ করতে পারো না। ওয়েক আপ!

নিথর দেহে তাও কোনওরকম জীবনের লক্ষণ নেই। এইবার তার সমস্ত অনুভূতি, সমস্ত প্রচেষ্টা হিংস্র রূপ ধারণ করল। সে অধিরাজের গালে ঠাস্ ঠাস্ করে কয়েকটা চড় বসিয়ে দিয়ে নিরুপায়ের মতো কেঁদে ফেলল। হাতে মুখ ঢেকে অসহায় কান্না মাখা কণ্ঠে বলল, "নিষ্ঠুর...!"

"ওঃ!"

একটা কাতর শব্দে সচকিত হয়ে ওঠে মেয়েটা । বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেখল নিস্পন্দ দীর্ঘ শরীরটা যেন একটু কেঁপে উঠল! ভুল! নাকি ঠিকই দেখছে! বেঁচে আছে? নাকি সবটাই ভ্রম...!

"এই!...এই! এ-ই!"

সে চোখের জল তাড়াতাড়ি মুছে ফেলল। ব্যাকুল, উদগ্রভাবে দু'হাতে তারপরই তার গালে আলতো চাপড় মারছে। দু সেকেন্ড সব চুপচাপ! এতক্ষণের নিথর দেহ আবার

কেঁপে উঠল। ঠোঁটজোড়া একটু খুলে গেল! যেন আপ্রাণ নিঃশ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করছে...!

— "কা-ম অ-ন্!"

মেয়েটা বুঝে গেল কী করতে হবে। এখনও মানুষটার দেহ লড়াই ছাড়েনি। সে এখনও চেষ্টা করছে। মেয়েটা দ্রুতহাতে জ্যাকেটটার চেইন খুলে ফেলল। জ্যাকেট ততক্ষণে ভিজে গিয়েছে। রক্তে ভিজে গিয়েছে। টি-শার্টটাও। সে আপ্রাণ চেষ্টা করছে টি-শার্টটা ছিঁড়ে ফেলার। কিন্তু ছিড়ছে না। ওদিকে অধিরাজ ফের নিথর হয়ে যাচ্ছে!....

"ড্যাম ইট!"

সে টি-শার্টটাকে টান মেরে তুলে দিল ওপরে। এখন অধিরাজের - বক্ষদেশ এবং ক্ষতস্থান প্রকট! মেয়েটি আর কোনও ভাবনাচিন্তা না করেই তার ওপর চেপে বসে হাতের তালু দিয়ে বুকে চাপ মারছে। মুখে মুখ ঠেকিয়ে আর্টিফিশিয়াল ব্রিদিং দেওয়ার চেষ্টাও করছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হওয়ার নয়। মানুষটা ক্রমশই নিস্তেজ হয়ে পড়ছে। প্রচণ্ড রক্তক্ষরণ...! "হোল্ড অন্! প্লিজ্ বেবি! ব্রিদ্... ব্রিদ্...।"

ফিসফিস্ করে করুণ অনুনয় করল সে। চোখের জলে মেয়েটার ঠোঁট ভিজে গিয়েছিল। সেই ভিজে ঠোঁটই এখন একটু প্রাণের উত্তাপ সঞ্চার করার চেষ্টা করছে এক মৃতপ্রায় মানুষের দেহে। একটু উষ্ণ নিঃশ্বাস দেওয়ার চেষ্টা করছে। এই প্রক্রিয়াটিকে ছোট করে বলা হয় সি.পি.আর। কার্ডিওপালমোনারি রিসাসিটেশন! কৃত্রিম উপায়ে হৃৎপিণ্ডকে সচল করার প্রক্রিয়া।

কিন্তু সি পি আরেও কিচ্ছু হল না। মেয়েটি তার ঠোঁটে ঠোঁট রেখে আর্টিফিশিয়াল ব্রিদিং দিতে দিতেই এবার পাগলের মতো গুমগুম করে এলোপাথাড়ি কিল মারতে থাকে বুকের ওপর— "কাম্ অন্ ইউ ব্রুট! ও-য়ে-ক আ-প! আই সেইড ও-য়ে-ক আ- প!"

এতক্ষণ যে দেহে কোনওরকম প্রাণের অস্তিত্ব ছিল না, দুমদাম কিল খেয়ে সেই শরীরটাই হঠাৎ একটা জোরাল ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো সামান্য লাফিয়েও উঠল। একটা প্রবল হেঁচকির মতো শ্বাস টানল অধিরাজের অচেতন দেহ! যেন প্রচণ্ড শক্তিশালী একটা ইঞ্জিন অনেকক্ষণ থেমে থাকার পর আচমকা চলতে শুরু করল! মেয়েটা তার নাকের সামনে আঙুল রাখল। নিঃশ্বাস পড়ছে! গুড বয়!" সে হেসে পরম মমতায় তার

কপালে হাত রাখে। উশকো-খুশকো চুলগুলো ঠিক করে দিতে দিতে বলল, “ওয়েলকাম ব্যাক টাইগার।”

টাইগারই বটে। বাঘিনীর উপযুক্ত বাঘ!

(একুশ)

সি.আই.ডি অফিসে থমথমে একটা বুক ভার করা নিঃস্তব্ধতা বিরাজ করছিল। সকলেই কাজ করে চলেছে। কিন্তু সবটাই যেন যান্ত্রিক। সবসময়ই একটা ভীষণ আশঙ্কা গ্রাস করতে আসছে। কারোর মোবাইল বা ল্যান্ডলাইন বেজে উঠলেই গোটা অফিস সন্ত্রস্ত হয়ে উঠছে। কী জানি কী খবর আসে! এমনকী স্বয়ং এ.ডি.জি শিশির সেনও অস্থির! কারণ তাঁর সেরা অফিসারটি হসপিটালের ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটে শুয়ে আছে। কাল যেতে পারেননি। আজ বিকেলে হয়তো যাবেন। ইতিমধ্যে যে কতবার অর্ণবকে ফোন করেছেন তার হিসাব নেই। একটাই প্রশ্ন তাঁর— "কোনও খবর আছে?"

এখনও পর্যন্ত কোনও খবর নেই। একটাই আশার কথা যে বুলেটটা হার্টে লাগেনি। তাহলে আর কিছু করার থাকত না ডাক্তারদের। ডাক্তাররা বুলেটটাকে বের করতে পেরেছেন। আপাতত সেটা ফরেনসিকের জিম্মায় চলে গিয়েছে। ব্যালিস্টিক রিপোর্টের অপেক্ষায় আছে।

কাল রাতে যখন কথা বলতে বলতেই থেমে গিয়েছিল অধিরাজ তখনই প্রমাদ গুণেছিল অর্ণব! ফায়ারিঙের শব্দ অবশ্য শোনা সম্ভব ছিল না। শুধু শুনেছিল মেয়ে গলার ক্রুদ্ধ চিৎকার। আর পরিষ্কার শুনতে পেয়েছিল 'রিয়া' নামটা। আর তারপরেই লাইন ডিসকানেক্টেড! পবিত্র আশঙ্কায় চেঁচিয়ে উঠেছিল, "রাজা...! কী হল!"

"স্যার...!"

অর্ণব লাইন কেটে দিয়ে পাগলের মতো অধিরাজের ফোনে বারবার ফোন করছিল। ফোন বেজেই যাচ্ছে কিন্তু কেউ তুলছে না। প্রত্যেকবারই বাজতে বাজতে নিরুত্তর হয়ে যাচ্ছে। কোনওবারই ওপাশ থেকে পরিচিত গম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল না।

"শি—ট!"

অর্ণব লাশটাকে ফরেনসিক টিমের অ্যাম্বুলেন্সে তুলে দিয়েই ছুটল মেরিলিন প্ল্যাটিনামের দিকে। লাশ নিতে ডঃ চ্যাটার্জী নিজেই এসেছিলেন। অর্ণবকে অমন টেনসড্ দেখে ওঁরও সন্দেহ হয়। তিনি ভুরু কুঁচকে জানতে চেয়েছিলেন, "এনি প্রবলেম অর্ণব?"

অর্ণব চিন্তিত মুখে বলে, "জানি না। স্যার গেটকীপারকে চেজ করতে করতে মেরিলিন প্ল্যাটিনামে গিয়েছেন। কিন্তু এখন ওঁকে আর ফোনে পাওয়া যাচ্ছে না!"

– "রাজা ফোন তুলছে না!" ডঃ চ্যাটার্জীও যেন একটু ঘাবড়ে গেলেন; "সে কী! দাঁড়াও তো!"

তিনিও বেশ কয়েকবার ফোন করলেন। কিন্তু ঘটনা একই। বাজতে বাজতেই কেটে যাচ্ছে ফোন। কোনও রিপ্লাই নেই। ডঃ চ্যাটার্জী আর কোনও কথা না বাড়িয়ে অর্ণবের গাড়িতেই গ্যাঁট হয়ে বসে পড়লেন। অর্ণব বুঝল তিনিও ওর সঙ্গেই যাবেন। সে গাড়িতে স্টার্ট দিয়েই শুনল তিনি ফোনে আহেলির সঙ্গে কথা বলছেন – "লাশটা যাচ্ছে। প্রিলিমিনারি টেস্টগুলো করো। আমি একটু পরেই আসছি।"

মেরিলিন প্ল্যাটিনামে ঢুকতে না ঢুকতেই গেটের সামনে একটা অ্যাম্বুলেন্স দেখে বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে উঠল অর্ণবের। এর মধ্যে পবিত্র আচার্য'র ফোনে অসংখ্যবার ফোন করেছে। কিন্তু প্রত্যেকবারই লাইন বিজি। এবার স্বয়ং তাকেই দেখতে পেল অর্ণব। পবিত্র আর ওয়ার্ডবয়রা যে রক্তমাখা বেহুঁশ মানুষটাকে নিয়ে অ্যাম্বুলেন্সের দিকে দৌড়চ্ছিল, তাকেও চিনতে কোনও অসুবিধে হল না! অর্ণবও প্রায় সর্বহারার মতো দৌড়য় সেদিকেই —"স্যার!"

"মাই গড!" তার পেছন পেছন ডঃ চ্যাটার্জীও। পবিত্র আর ওয়ার্ডবয়রা ততক্ষণে অ্যাম্বুলেন্সে তুলে দিয়েছে অধিরাজকে। একজন ওয়ার্ডবয় অভ্যস্ত ও নিপুণ হাতে অক্সিজেন মাস্ক পরিয়ে দিল তার মুখে। ডঃ চ্যাটার্জী অ্যাম্বুলেন্সে উঠে অধিরাজের ওপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়লেন,— "কী হয়েছে? বেঁচে আছে তো?"

"এখনও আছে।" পবিত্র নীচু স্বরে বলল, "তবে বুকে গুলি লেগেছে।"

"সে কী!" তিনি কেঁপে উঠলেন, "কোথায় লেগেছে? হার্টে নয় তো

"কে মারল?" অর্ণবের প্রশ্নও ধেয়ে আসে। সে উন্মত্ত রাগে ফুঁসছে— "কে শুট করেছে?"

- "রিয়া সামান্থা বাজাজ"। পবিত্র যত দ্রুত সম্ভব বলল, "উনি রাজার বড়ির পাশেই বসেছিলেন। এবং মার্ডার ওয়েপনটা তখনও ওঁর হাতেই ছিল! ওঁকে অ্যারেস্ট করা

হয়েছে। লেডি অফিসাররা নিয়ে আসছেন।”

“অফিসার আচার্য!” ডঃ চ্যাটার্জী প্রায় গর্জন করে ওঠেন, “মাইন্ড ইওর ল্যাঙ্গোয়েজ! রাজার বডি মানে? ও এখনও বেঁচে আছে। 'বডি' হয়নি! মার্ডার ওয়েপন আবার কী!”

পবিত্র অনুতপ্তভাবে মাথা নীচু করেই বলল, “সরি! তবে বডিও আছে। গেটকীপার গগনের বডি ছাতে পড়েছিল। স্পট ডেড। রিয়ার হাতে যেটা ছিল সেটা প্ৰব্যাবলি মার্ডার ওয়েপনই। লাশ আর মার্ডার ওয়েপন ল্যাবে পাঠিয়ে দিচ্ছি।”

ডঃ চ্যাটার্জী আর কথা না বাড়িয়ে অধিরাজের মাথাটা নিজের কোলে তুলে নিয়ে তার অসাড় হাতটা শক্ত করে ধরে বসলেন। অর্ণব পবিত্রর দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায়। পবিত্র তার অনুচ্চারিত প্রশ্নটা বুঝে নিয়ে বলল, “তোমরা যাও। আমি টিম ডেকে রিয়া যে ফ্ল্যাটে থাকে সেটা সার্চ করছি। যে ফ্ল্যাটের কথা মিস্ ঘোষ জানিয়েছিলেন, মানে চেরি রেড দরজাওয়ালা সেভেন ও বি ফ্ল্যাটটা রিয়ার মাসি অহনা ভট্টাচার্যেরই। ওখানেই রিয়া থাকে। এটাকেও কো-ইনসিডেন্স বলা যাচ্ছে না।” “স্যারের বাবা-মাকে...।”

—“অলরেডি জানিয়ে দিয়েছি। ওঁরা ডিরেক্ট হসপিটালেই যাবেন।”

পবিত্র একটু চুপ করে থেকে বলল, “তোমরা যাও। আমি এদিকটা দেখেই আসছি। ইনভেস্টিগেশন তো চালাতেই হবে।”

অর্ণব একদৃষ্টে তাকিয়েছিল অধিরাজের দিকে। তার মাথায় যেন আর কিছু ঢুকছে না। অধিরাজের রক্তহীন বিবর্ণ মুখের আধখানা ঢেকে গিয়েছে। অক্সিজেন মাস্কে! বুকের ওঠা নামা এত ক্ষীণ যে বোঝাই যায় না। এই মানুষটাই একটু আগে কথা বলছিল, হাসছিল, বাইক নিয়ে চেজ করছিল। প্রচণ্ড আফসোসে তার নিজেকেই ঠাস্ ঠাস্ করে চড় মারতে ইচ্ছে করে। অধিরাজের গায়ে জ্বর ছিল! হয়তো সেটাই বাড়াবাড়ির পর্যায়ে যাওয়ার ফলে রিফ্লেক্স অ্যাকশন ঠিকমতো কাজ করেনি। নয়তো এইরকম একজন চতুর শার্প-শ্যুটারকে রিয়া বাজাজ এক গুলিতেই কাত করে ফেলল! অবিশ্বাস্য! যে হিস্ট্রিশিটারদের সঙ্গে নিয়মিত এনকাউন্টার করে অভ্যস্ত, একটা গুলি তাকেই মেরে দিয়ে গেল! রিয়া বাজাজ আর যাই হোক— প্রোফেশনাল শ্যুটার নয়! অধিরাজ ব্যানার্জীর হাতে বন্দুক থাকলে বাঘা

বাঘা প্রতিপক্ষও ফায়ার করার সুযোগ পায় না! অথচ শেষে কিনা রিয়া বাজাজের হাতেই...!

সে পরম অপরাধবোধে চোখ বোঁজে। জ্বরটাই সর্বনাশ করেছে। আর তার যে জ্বর ছিল তা একমাত্র অর্ণব ছাড়া আর কেউ জানত না। এ লোকটা তো রিস্ক নিতেই ভালোবাসে। কিন্তু অর্ণব আরেকটু সতর্ক হতেই পারত। কেন একা ছাড়ল অধিরাজকে! সারাজীবন পাশাপাশি থেকে এসেছে। অথচ যখন তার অর্ণবের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল, তখনই সে পাশে ছিল না!

হসপিটালে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে প্রতিটা মুহূর্ত, প্রতিটা মিনিট আতঙ্কে কাটছিল ওদের। আর অধিরাজকে যখন অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে গেলেন ডাক্তাররা তার পর থেকেই অর্ণব প্রাণপণে ঈশ্বরকে ডাকছিল। ডঃ চ্যাটার্জী ও.টি'র বাইরে চুপ করে পায়চারি করছিলেন। একটা কথাও বলেননি। এত শান্ত হয়ে থাকতে তাঁকে আগে কখনও দেখেনি অর্ণব। আর অধিরাজের মা-বাবার মুখের দিকে তাকানোর সাহসই হয়নি।

অপারেশন চলাকালীন ডাক্তার ও সিস্টারদের মধ্যে একটা ভাষণ ব্যস্ততা চলছিল। ডঃ চ্যাটার্জী একজন ডাক্তারের সঙ্গে নীচু স্বরে কথা বলছিলেন। তাঁর মুখ ক্রমশই গম্ভীর হয়ে উঠছে দেখে অর্ণব এগিয়ে গেল। তার দিকে তাকিয়ে আপনমনেই বিড়বিড় করে বললেন ডঃ চ্যাটার্জী, "চিন্তার কিছু নেই। হেভি ব্লাড লস্ হয়েছে। ব্লাড দিতে হবে। তবে নিউমোথোরাক্সটা না হলেই বোধহয় ভালো হত।" "মানে?" —"মানে গুলিটা লাংসকে পাংচার করেছে।" তিনি অন্যমনস্ক- "তবে পাংচার্ড লাংসের পেশেন্টও বেঁচে যায়। রিস্ক ফ্যাক্টর আছে। তবে রাজার বয়েস অল্প, হেলথও খুব ভালো। লড়বে। হিলও হবে...।"

কথাগুলো যে কাকে সান্ত্বনা দিতে বললেন ডঃ চ্যাটার্জী, ভগবানই জানেন। অর্ণব একটুও স্বস্তি পেল না। বরং সারারাত উদ্বেগেই কাটল। চতুর্দিক নিস্তব্ধ। শুধু অধিরাজের মায়ের ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার আওয়াজ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই।

অবশেষে বহু প্রতীক্ষার পর ও.টির দরজা খুলল। সার্জেন স্পষ্ট জানালেন, "গুলিটা বের করতে পেরেছি। তবে এখনই কিছু বলতে পারছি না। সেন্সোরিয়াম নেই। যতক্ষণ না সেটা আসছে, ততক্ষণ কিছু বলা মুশকিল। সি.সি.ইউ'তে দিতে হবে। আপাতত

ভেন্টিলেটরে রাখা জরুরি।" বলতে বলতেই হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেন, "বাই দ্য ওয়ে, গুলি লাগার সঙ্গে সঙ্গেই কেউ ওঁকে সি.পি.আর দিয়েছে কি?"

- "সি.পি.আর!" ডঃ চ্যাটার্জী অর্ণবের দিকে তাকালেন, "পবিত্র দিয়েছে?"

– "নো। মে বি ফিমেল ওয়ান!" সার্জেন বললেন, "অফিসার ব্যানার্জী নিশ্চয়ই স্ট্রবেরি লিপ-বাম মাখেন না? বা অন্য কোনও পুরুষ অফিসার?"

"হোয়াট!" ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ অবাক –"স্ট্রবেরি লিপবাম!"

"ইয়েস"। সার্জেন মাথা ঝাঁকালেন, "যদিও এসব এভিডেন্স আমাদের দেখার কথা নয়। কিন্তু এটা সি.আই.ডি. অফিসারের কেস বলেই দেখেছি। ইনফ্যাক্ট আমাদের সিস্টার নোটিস করেছেন। ওঁর ঠোঁটে স্ট্রবেরি লিপবাম ছিল। বুকের ওপরেও সামান্য সোয়েলিং নজরে এসেছে। খুব জোরে একদম হার্টের ওপরে দুমদাম মারলে যেমন হয় আর কী। নিউমোথোরাক্সের ক্ষেত্রে অনেকসময় সাডেন শকে কার্ডিয়াক প্রবলেম হয়— হার্ট পাম্পিং থামিয়ে দেয়। সেক্ষেত্রে সি.পি.আর না দিলে পেশেন্ট ওখানেই মরে যেতে পারে। অফিসার ব্যানার্জীকে কেউ সি.পি.আর দিয়েছিল বলেই আমার ধারণা।"

কথাগুলো বলেই তিনি গটগট করে হেঁটে চলে গেলেন। অর্ণব আর ডঃ চ্যাটার্জী স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে। দু'জনের মুখে কোনও ভাষা নেই! অর্ণবের মাথায় প্রায় কিছুই ঢোকেনি। ডঃ চ্যাটার্জী অধিরাজের ভাষায় বললেন, "স্ট্রেঞ্জ।"

সেই থেকেই অধিরাজ সি.সি.ইউ'তে। মাথা থেকে পা পর্যন্ত অগুনতি নল নিয়ে শুয়ে আছে। চোখদুটো যেন চরম ক্লান্তিতে বোজা। মুখ বিবর্ণ। ব্লাড এখনও দেওয়া হচ্ছে। থেকে থেকেই ব্লাড প্রেশার নেমে যাচ্ছে। ভীষণভাবে ফ্লাকচুয়েট করছে। অক্সিজেন মাস্কে মুখ প্রায় দেখাই যায় না। টান টান ঋজু দেহটা সাদা চাদরে আবৃত। শুধু লম্বা সুন্দর গ্রীবা, তামাটে রঙের সুগঠিত কাঁধটুকু আর বুকের ওপর জড়ো করা হাত দুটো দেখা যায়। হাতের আঙুলগুলো স্থির! এখন তার ধারে কাছে কাউকেই ঘেঁষতে দিচ্ছেন না ডাক্তাররা। দরজার বাইরে ঠায় দাঁড়িয়ে কাচে মুখ ঠেকিয়ে অক্লান্ত দৃষ্টিতে ছেলের দিকে তাকিয়ে আছেন মা-বাবা! অর্ণব, ডঃ চ্যাটার্জী, আজকে সকালে পবিত্র এবং অন্যান্য অফিসাররাও তাঁদের বুঝিয়ে

উঠতে পারেনি। কিছুতেই সরানো যাচ্ছে না বন্ধ দরজার সামনে থেকে। অধিরাজের বাবা বারবার বলছেন, "চিরদিনই শান্তিতে থাকতে বলেছি। এত শান্ত হতে বলিনি বাবা!"

দৃশ্যটা মনে পড়তেই চোখে জল চলে এল অর্ণবের। সত্যিই তো! অমন দাপুটে লোকটা কী অসহায়ের মতো পড়ে আছে! কখনও অধিরাজকে স্থির হয়ে বসতে দেখেনি সে। সবসময়ই কিছু না কিছু করে যাচ্ছে। ব্যস্ততাই বোধহয় সবচেয়ে পছন্দ তার। আর ডিপার্টমেন্টও এই লোকটার চওড়া কাঁধের ওপর একের পর এক কেসফাইল চাপাতে ভালোবাসে। তা নিয়ে কখনও ক্লান্তি নেই, কোনও অভিযোগ, অনুযোগ নেই – শুধু ফ্রেশ একটা ছেলেমানুষী হাসি। সে 'হবে না' শব্দটা সহ্যই করতে পারে না। 'ইমপসিবল্' শব্দটা ওর অভিধানেই নেই।"

"অর্ণব।"

অফিসার পবিত্র আচার্য তার কাঁধে হাত রাখতেই সচকিত হয়ে উঠল অর্ণব। মনে পড়ল এই মুহূর্তে হস্পিটালে নয়, সে সি.আই.ডি ব্যুরোতেই বসে আছে। আর এখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে চলেছে। তার চোখের পাতা ভিজে এসেছিল। কোনোরকমে সামলে নিয়ে বলল, "হ্যাঁ?"

– "রেস্টোর‍্যান্টের ম্যানেজার শালা কিছুতেই মুখ খুলছে না।" পবিত্রর চোখ জ্বলে ওঠে, "কাল রাত থেকে তুলোধোনা করছি। কিন্তু একই গান গাইছে, 'কিছু জানি না'। তুমি একবার দেখবে? রাজা থাকলে কিছু করত হয়তো...।"

—"দেখছি।" সে পবিত্র'র দিকে তাকিয়ে খুব শান্তভাবে বলল, "রিয়া বাজাজ নতুন কিছু বলল?"

"নাথিং।" পবিত্র হতাশভাবে মাথা নাড়ে, – "সে তো শুরুতেই বলে দিয়েছে যে সব খুন ও নিজেই করেছে। বলছে ঠিকই, কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না। দেখি ফার্দার ইনভেস্টিগেশনে কী বেরোয়।" অধিরাজের লড়াইটা এখন লড়ছে গোটা সি.আই.ডি ব্যুরো। তার ঘটনাটা হোমিসাইডের রক্ত গরম করে দিয়েছে। ফলে এই কয়েকঘণ্টায় সব তোলপাড় করে ঝড়ের বেগে চলছে ইনভেস্টিগেশন। অর্ণবের নেতৃত্বে অফিসাররা যাকেই পাচ্ছে তার দিকেই তেড়ে যাচ্ছে। তারা গোটা গোল্ডেন মুন ক্লাবকেই রেড করে সিল করে দিয়েছে। হাতের কাছে যা যা

ফাইল পেয়েছে, তুলে এনেছে। সিজ্‌ড হয়েছে ডিপ-ফ্রিজার। সেটাও ফরেনসিক ল্যাবে পাঠানো হয়েছে। মানসী জয়সওয়াল আর অ্যাডেলিন বাজাজকে জেরার জন্য ডেকে পাঠানো হয়েছে। অ্যাডেলিন প্রায় মুখ খিস্তি করতে বাকি রেখেছেন। দাঁত খিঁচিয়ে বলেছেন, "আপনাদের কাছে আমাদের বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ নেই। আসল অপরাধীকে ধরতে পারছেন না বলে আমাদের হ্যারাস করছেন। যাবো না। ফুটন।"

অর্ণবের মাথায় রক্ত চড়ে গেল। তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। অক্সিজেন মাস্ক পরা অধিরাজের অসহায় চেহারাটা। চিরদিনের শান্ত অর্ণব হঠাৎ হিংস্রভাবে হিস্হিসিয়ে ওঠে, "আপাতত আমি ফুটছি ঠিকই। কিন্তু ম্যাডাম্‌, আপনি যদি আজই ব্যুরোয় না আসেন, আর একটা প্রমাণও যদি আপনাদের বিরুদ্ধে পাই তবে প্রমিস— আপনাকে জেলের ফুটন্ত কড়াইয়ে ফেলে ফোটাবো! ওখানে একটা চেসবোর্ডও পাবেন না।"

পবিত্র অর্ণবের এমন বিধ্বংসী মূর্তি কখনও দেখেনি। সে স্তম্ভিত! অ্যাডেলিনও হতবাক। যে লোকটিকে প্রায় বলে বলে দাবায় হারিয়েছেন সেই শান্ত ছেলেটা এমনভাবে রি-অ্যাক্ট করবে তা স্বপ্নেও ভাবেননি। কোনোমতে ঢোঁক গিলে বললেন, "ওকে"।

রিয়া বাজাজের ফ্ল্যাট তন্নতন্ন করে খুঁজে একগাদা সাইবার ক্রাইম সম্পর্কিত বই পাওয়া গিয়েছে। রয়েছে ভৌতিক এবং রহস্যের গল্পের গুচ্ছ গুচ্ছ সংকলন। সব বইতেই রিয়া বাজাজের নামের স্টিকার লাগানো। পাওয়া গেল নানাধরণের চেসবোর্ডও। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়— পাওয়া যায়নি কোনও ডেস্কটপ, ল্যাপটপ বা ট্যাব। আরও অদ্ভুত ব্যাপার, তাদের হলঘরে একটা সোফায় পাওয়া গেল একটা আস্ত ম্যানিকুইন! ম্যানিকুইনটার বুকে একটা ছুরি বসানো! শুধু তাই নয়, ম্যানিকুইনটা প্রায় ছুরির আঘাতে ঝাঁঝরা!

রিয়াকে এ বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করলেই সে কাঁপতে কাঁপতে একটা কথাই বলছে, "আমি সবাইকে মেরেছি, কিন্তু কাউকে মারতে চাইনি। ওদের কেন মেরেছি, জানি না। আমি শুধু মিঃ বাজাজকে মারতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ও মরেনি! ও এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে... আমায় ভয় দেখাচ্ছে!"

রিয়ার সঙ্গে তার মাসি অহনা ভট্টাচার্য এবং গভর্নেস অ্যালিসও উপস্থিত ছিল। অহনাকে রিয়া 'মাউ' বলে ডাকে। 'অহল্যা'র বোনের নাম যে 'অহনা' হবে তাতে আর

আশ্চর্য কী! তিনিই দীর্ঘশ্বাস ফেলে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললেন, "ম্যানিকুইনটা পেয়েছেন আপনারা? ঐ ম্যানিকুইনটাকেই রিয়া মিঃ বাজাজ ভাবে। ওর প্যারানয়েড স্কিজোফ্রেনিয়া আছে। সুযোগ পেলেই ঐ ম্যানিকুইনটাকে ছুরি মারে। বারবার লাশ ফেলার মতো ওটাকে বস্তাবন্দী করে টেনে হিঁচড়ে বাইরে নিয়ে গিয়ে ফেলে আসে। সিকিউরিটি গার্ডদের বলাই আছে। ওরা ওটাকে খুঁজে পেতে ফের ফেরত দিয়ে যায়। রিয়া ঐ ম্যানিকুইনটাকে কখনও ভয় পায়, কখনও হিংস্র হয়ে ওঠে। আমি সামলাতে পারি না। একমাত্র ওর গভর্নেস অ্যালিসই ওকে বাগে আনতে পারে।"

রিয়ার গভর্নেস অ্যালিসও তাঁর কথাকেই সমর্থন করল। সে জানায়— "মিঃ উমঙ্গ অ্যান্ড্রু বাজাজ দুই মেয়ের সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করতেন স্যার। স্পেশ্যালি রিয়ার সঙ্গে। সে কালো বলে যা তা বলতেন। উঠতে বসতে মারধোরও করতেন। রিয়ার ওপর অনেক অত্যাচার করেছেন। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর টর্চার ছিল তার সঙ্গে দাবা খেলা। খেলতে হবেই। অথচ রিয়া বেবি খুব শার্প ছিল। কখনও যদি সে জিতে যেত তবে বেল্ট দিয়ে জানোয়ারের মতো মারতেন। গরম ইস্ত্রির ছ্যাঁকা থেকে শুরু করে লাঠি পেটা— সবরকম টর্চারই ছিল লিস্টে। রিয়া বেবি এমনি এমনি এমন হয়নি।" – "আর প্রিয়া?" অর্ণব জানতে চায়— "তার ওপরও টর্চার করতেন। মিঃ বাজাজ?"

অহনা একটু চুপ করে থেকে বললেন, "টর্চার করাটাই মিঃ অ্যান্ড্রু বাজাজের স্বভাব। দিদির ওপর কম অত্যাচার করেছেন? তবে দুই মেয়ের মধ্যে যদি কেউ সামান্য ছাড় পেয়ে থাকে তবে সে প্রিয়া। কারণ প্রিয়া ওঁর মতোই ফর্সা ছিল।"

– "সে এখন কোথায় কিছু জানেন?" – "সঠিক জানি না। মিঃ বাজাজ বলেছিলেন সে নাকি কোন এক অপদার্থ ছেলের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছে।" অহনা, ঠোঁট কামড়ে ধরে বললেন, "তবে আমার বিশ্বাস হয় না। প্রিয়া এত বোকাও নয় যে কোনও ওয়ার্থলেস ভ্যাগাবন্ডের সঙ্গে প্রেম করবে। সে বোনকে খুব ভালোবাসত। তাকে ঐরকম পাষণ্ডের কাছে ফেলে রেখে চলে যাওয়ার পাত্রী নয়। আমার সন্দেহ হয় যে..."

"কী?" এবার দুই অফিসারই একসঙ্গে জিজ্ঞাসা করল।

“আমার ধারণা প্রিয়া বেঁচেই নেই। তাকে মিঃ বাজাজ খুন করে কোথাও গুম করে দিয়েছেন।”

“হোয়াট!” অর্ণব উত্তেজনায় প্রায় লাফিয়েই ওঠে, – “কী!”

“কারণ সে বেঁচে থাকলে এতদিনে মিঃ বাজাজকেই খুন করত। তাই আগেই তাকে সরিয়ে দিয়েছেন। প্রিয়া নিজের চোখে ওর মায়ের যন্ত্রণা দেখেছে। বাজাজ দিদিকে ‘কুত্তি’ বলে ডাকতেন। ঘরে বৌ-বাচ্চা থাকতেই একেকদিন একেকটা কলগার্লকে এনে বেডরুমে তুলত লোকটা। শেষপর্যন্ত তো আরেকটা মেয়েকেই পার্মানেন্টলি ঘরে তুলে আনলেন। এমন ক্রুয়েল লোক আমি আর দেখিনি!” অহনার কণ্ঠে প্রচণ্ড তিক্ততা ও বিদ্বেষ, “আমার দিদি কালো ছিল এটাই তার অপরাধ। আর সেই অপরাধের শাস্তি সে পেয়েছে। অহল্যাদিদির মৃত্যুটা সবার চোখে স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা জানি, ওটাও মার্ডারই ছিল। অসম্ভব মানসিক যন্ত্রণা পেয়ে তিলে তিলে মরেছে সে!”

“অহল্যা বাজাজ কীভাবে মারা গিয়েছিলেন?”

অহনার চোখ সজল হয়ে ওঠে, “রিয়ার জন্ম দিতে গিয়েই মারা গিয়েছিল দিদি। প্রেগন্যান্সির আগে থেকেই সে রক্তশূন্যতায় ভুগছিল। স্বাভাবিক। ওকে ঠিকমত খেতেও দিতেন না বাজাজ । প্রেগন্যান্ট অবস্থাতেই বেশ কয়েকবার বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিলেন। এমনকি শেষদিন পেটে একাধিকবার লাথিও মেরেছিলেন। তাতেই ব্লান্ডারটা হল। মা আর বাচ্চা দু’জনেরই প্রাণ সংশয় হয়ে গিয়েছিল। ডাক্তাররা কোনও একজনকে বাঁচাতে পারতেন। অ্যান্ড্রু বাজাজের কাছে অনুমতি চাওয়া হলে উনি স্ট্রেট বলে দিলেন, ‘আই জাস্ট ডোন্ট কেয়ার।' দিদি বাঁচল না। কিন্তু ডাক্তাররা রিয়াকে বাঁচাতে পেরেছিলেন”। তার চোখ বেয়ে টপ্‌টপ্‌ করে জল পড়ল, “এখন মনে হয়, ও মরলেই বোধহয় ভালো হত। এটা কি বাঁচা।”

“প্রিয়া কোনওরকম প্রতিবাদ করেনি?”

ভদ্রমহিলা আঁচলে চোখ মুছে বললেন, “করেছিল। অহল্যাদিদিকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসত সে। দিদি যে এত টর্চার সত্ত্বেও বাজাজকে ছেড়ে যায়নি, তার একটাই কারণ। বড় মেয়ে প্রিয়া। নয়তো সে যখন খুশি চলে যেতে পারত। তার নিজস্ব প্রচুর টাকা

ছিল। সেই টাকাই দু হাতে ওড়াচ্ছিল। অ্যান্ড্রু বাজাজ হুমকি দিত যে বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে বা ডিভোর্স চাইলে প্রিয়াকে মেরে ফেলবে। এবং শুধু হুমকি নয়, বাজাজের মতো লোকের পক্ষে সেটা সম্ভবও ছিল। সেই ভয়েই দিদি ওর সঙ্গে থাকতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু প্রিয়া সব স্বচক্ষে দেখেছে। মায়ের মৃত্যুর পর সে শ্মশান থেকে ফিরেই সোজা পুলিস স্টেশনে গিয়ে বাপের নামে নালিশ করেছিল। প্রিয়া মাইনর ছিল। তখন ওর মাত্র দশ বছর বয়েস। ওর কথা কেউ বিশ্বাস করেনি। প্রিয়াই একমাত্র লোক যে বারবারই চিৎকার করে বলেছিল, 'ইটস্ আ মার্ডার!' এবং যেদিন ও নিখোঁজ হয়ে যায়, ঠিক সেদিনই প্রিয়া অ্যান্ড্রুর গলা টিপে ধরেছিল। অ্যান্ড্রু ওকে ছেড়ে দেবেন?"

"সে কী!" অর্ণব অবাক, "আপনি জানলেন কী করে? আপনি ওদের সঙ্গে থাকতেন?"

- "না"। তিনি বললেন, "অ্যালিস বলেছে। অ্যালিস একদম ছোটবেলা থেকে রিয়াকে মায়ের মতো মানুষ করেছে। অহল্যাদিদি যখন মারা যায় তখন প্রিয়া খুবই ছোট। রিয়াকে কে দেখত? অ্যান্ড্রু যে ফাদারের কাছে মানুষ, অ্যালিসও সেই ফাদারের কাছেই থাকত। ও অনাথ। সেই ফাদারই অ্যালিসকে রিয়ার দেখাশুনো করার ভার দিয়েছিলেন। অ্যান্ড্রু ফাদারের কথা অমান্য করতে পারতেন না। তাছাড়া সন্তান তার কাছে একটা ঝামেলা! তাই অ্যালিসকে মেনে নিয়েছিলেন।" অর্ণব আড়চোখে একবার অ্যালিসকে দেখে নেয়। এই কেসের একমাত্র হতকুচ্ছিত চেহারার নারী! কুচকুচে কালো! ভয়ঙ্কর মোটা! সম্ভবত অধিরাজ, অর্ণব এবং পবিত্রকে একসঙ্গে পাশাপাশি দাঁড় করালে তবেই অ্যালিসের বহরটা বোঝা সম্ভব! কালো ফোলা ফোলা মুখ অদ্ভুত নিস্পৃহ! চোখদুটো এত ছোট যে প্রায় দেখাই যায় না! ঠোঁট ফুলো ফুলো-মোটা। কাঁচাপাকা চুলগুলো বিস্রস্ত হয়ে মুখের ওপরে পড়েছে। অথচ সে যে পরম স্নেহময়ী তা তার সেই কুতকুতে চোখের দৃষ্টিতেই বোঝা যায়। অন্যদিকে অহনা ভট্টাচার্য কালো হলেও চরম সুন্দরী। এককথায় ব্ল্যাক বিউটি! সোফিয়া লোরেনও বোধহয় তাঁর সৌন্দর্যের পাশে ফেল করবেন। তাঁকে অহল্যার বোন বলে মেনে নেওয়া কষ্টকর! কত বছরের ছোট কে জানে! কারণ অহল্যার বড় মেয়ে প্রিয়া যদি আদৌ বেঁচে থাকে তবে তার বয়েস এখন বত্রিশ হওয়া উচিত। অথচ অহনাকে পঁয়ত্রিশের বেশি বলে মনেই হয় না! তাঁর চেহারা অবশ্য নিগ্রোবটু ধরনের নয়। রীতিমতো পানপাতার মতো মুখ।

টানা টানা চোখে মিশরীয় সৌন্দর্য! চুল কিঞ্চিত ঢেউখেলানো। শাড়ি পড়লেও অনিন্দ্যসুন্দর সুললিত চেহারাটির দিকে তাকালে চোখ ফেরানো মুশকিল। মুখের আদলটা ভীষণ যৌন আবেদনময়। কব্জিতে একটি কিং কোবরা ফণা তুলে আছে— মানে ট্যাটু আর কী অর্ণবের মনে হল, হেলেন অব ট্রয়, মুমতাজমহলদের পর এবার ক্লিওপেট্রাও এলেন!

“রিয়ার মেন্টাল প্রবলেমের মূলেও মিঃ বাজাজ।” অ্যালিস মৃদুস্বরে জানায়, “বেবির প্যারানয়েড স্কিজোফ্রেনিয়ার রোগটা মিঃ অ্যান্ড্রু বাজাজের কারণেই। হি ইজ দ্য ডেভিল!”

রিয়া প্যারানয়েড স্কিজোফ্রেনিয়ার রোগী! অর্ণব আর পবিত্র পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়। তার মানে মেয়েটাকে সরাসরি জেরা করা সম্ভব নয়। কাউন্সিলর এনে জেরা করতে হবে। পবিত্র শুধু বলল, “আপনার কাছে প্রিয়া আর অহল্যা বাজাজের ছবি আছে?”

-“আছে।” অহনা বললেন, “অ্যালবাম থেকে দিতে হবে। অ্যালবামটা আপনারা আনেননি বোধহয়।”

“না।”

“ঠিক আছে। নিয়ে আসছি।”

-“আচ্ছা, রিয়ার ক্রিশ্চান নেম সামান্থা। প্রিয়ার পুরো নাম কী ছিল?”

“প্রিয়া এস্থার বাজাজ।” অহনা চলে গেলেন। অ্যালিস রয়ে গেল। সে রিয়ার মাথাটা নিজের বুকে টেনে নিয়ে চুপ করে রইল। পবিত্র একবার সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দু’জনকে দেখে নিল। তারপর বাইরে বেরিয়ে অর্ণবকে বলল, “আমার ব্যাপারটা খুব সহজ মনে হচ্ছে না। গোলমাল আছে। এই রিয়া বাজাজ কি সত্যিই পাগল? না অ্যাকটিং করছে?”

“কেন?”

“একটা জিনিস ওঁদের ফ্ল্যাটে পেয়েছি। তুমি দৌড়োদৌড়ি করছিলে বলে বলিনি । আমার টেবিলে আছে। এক কথায় হাইলি সাপিশাস। চলো তোমায় দেখাচ্ছি।”

পবিত্র নিজের টেবিল থেকে একটা সবুজ রঙের ফাইল তুলে নিয়ে হাতে ধরিয়ে দিল, “দেখো।”

অর্ণব ফাইলটা খুলেই হাঁ। ভেতরে থরে থরে অধিরাজের ছবি সাজানো। বেশির ভাগই নিউজ পেপার থেকে সংগ্রহ করা। কিছু ক্যামেরায় তোলা। খবরের কাটিং, যে সব কেস এখনও পর্যন্ত তারা সল্ভ করেছে সে সবের ডিটেলস্। অধিরাজের ইন্টারভিউ। তার সম্পর্কে যত খবর আজ পর্যন্ত বেরিয়েছে সবই সযত্নে সাজানো।

- "রাজার ওপর প্রায় থিসিসই বলতে পারো। এ পাবলিক অনেকদিন ধরেই ফলো করছে। আর ইন্টারভিউটা কোন্ ক্রাইম রিপোর্টার নিয়েছে দেখেছ?"

- "সুপর্ণা জয়সওয়াল!'

অর্ণবের মনে হয়েছিল এবার তার মাথা ফেটে যাবে। গেটকীপারটা যখন বেছে বেছে এই মেরিলিন প্ল্যাটিনামেই এল, তখন ভেবেছিল; তদন্তের ক্ষেত্র একটা সীমিত জায়গায় অন্তত এল। কিন্তু না! আবার সন্দেহের তীর ঘুরে গেল জয়সওয়ালদের দিকে। কিন্তু জয়সওয়ালদের মধ্যে কেউ মেরিলিন প্ল্যাটিনামে বিনা বাধায় ঢুকে গেল কী করে? সিকিউরিটি গার্ডরা আটকাল না! তাও আবার রিয়া বাজাজদের ফ্ল্যাটে! কোনও কানেকশনই তো নেই! শেষ আশা ছিল ক্লাবের রেস্টোর‍্যান্টের ম্যানেজারটার বয়ান। কিন্তু সে ব্যাটাও মুখ খুলছে না! অর্ণব চোখ বুজল। এরকম পরিস্থিতির সামনে পড়লে অধিরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় কী করতেন? কিছু তো করতেন। এত মার খাওয়ার পরও যখন মুখ খুলছে না তখন মোটা চামড়ার লোক। কী করা যায়...? স্যার কী করতেন.....?

সে কয়েকমুহূর্ত ভেবে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়, "চলুন তো।"

পবিত্র মাথা ঝাঁকিয়ে নির্বিবাদে তার সঙ্গে সঙ্গেই চলল। ম্যানেজারটা এতক্ষণ সি.আই.ডি স্পেশাল লাঠির বাড়ি খেয়ে প্রায় বেঁকেই গিয়েছে। তার দেহে বোধহয় এমন একটা জায়গাও বাকি নেই যেখানে মারা হয়নি। তবু দাঁতে দাঁত চেপে বসে আছে।

অর্ণব তার দিকে একটু বিরক্তিমাখা দৃষ্টিতে তাকিয়ে পবিত্র'র দিকে তাকায়, "এটাকে সাইজ করতে হবে?"

পবিত্র মনে মনে হাসল। অর্ণব অধিরাজের স্টাইলটাই ধরেছে। শুধু গলার আওয়াজ আর ভঙ্গিটা আলাদা। ক্লেভার বয়! অধিরাজের ছায়ায় থাকে বলে সবসময় তাকে

ঠিকমতো বোঝা যায় না। নয়তো অর্ণবও কিছু কিছু ক্ষেত্রে রীতিমত ভালো খেলে। যেমন এখন খেলছে।

অর্ণব শার্টের হাতা গোটাতে গোটাতে ব্যস্ত ভঙ্গিতে লাঠি হাতে দাঁড়ানো কনস্টেবলদের দিকে দেখল, "কী দেখছ? আমার ড্রয়ারে একটা আনলাইসেন্সড গান আছে। নিয়ে এসো। সার্ভিস রিভলবারে হবে না। আর রেকর্ডে লেখো কোনওরকম প্রমাণ না পাওয়ার জন্য ওকে আজ সকাল দশটায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। অ্যাই, তোর নাম কী বে?" ম্যানেজারটা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েছিল। কী হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছে না সে। কোনোমতে বলল, "স্যার...!"

"তোর নাম 'স্যার'?"

অর্ণব ভ্রূকুটি করেছে। পবিত্র পেছন থেকে বলল, "বিমান সাঁপুই!"

- "ফাইন।" সে কনস্টেবলদের দিকে তাকিয়েছে, "রেকর্ডে লিখে ফেলো। আর আনলাইসেন্সড গানটা নিয়ে এসো। নট সার্ভিস রিভলবার। গট ইট?"

"ওকে স্যার।"

কনস্টেবলরা দ্রুত বেরিয়ে যায়। বিমান সাঁপুই ঠোঁট চেটে বলল, "আমি কিছু জানি না স্যার!"

"কিছু জিজ্ঞাসা করেছি তোকে?" অর্ণব বিরক্তিতিক্ত স্বরেই ঝাঁঝিয়ে ওঠে, "চুপ থাক্"।

কিছুক্ষণ পরেই কনস্টেবলরা আগ্নেয়াস্ত্রটা নিয়ে এসে হাজির। অর্ণব ভালো করে অস্ত্রটাকে ঘুরিয়ে দেখে নিয়ে বলল, "লোডেড তো?"

- "একদম।"

– "ফাইন।" সে ম্যানেজারের দিকে তাকায়, "এবার দয়া করে উঠে দাঁড়া। আমার হাতে অনেক কাজ আছে। তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে।"

বিমান সাঁপুইয়ের গলার হাড়টা ওঠানামা করল। কী সর্বনাশ! তাড়াতাড়ি কী শেষ করবে? এনকাউন্টার করবে নাকি? তেমনই তো মনে হচ্ছে। সামনের অফিসারের চোখের দিকে তাকাল সে। সেখানে শুধু প্রতিহিংসা আগুনের মতো জ্বলছে! সত্যিই ঠুকে দেবে...!

– "আবে! সোজা কথা বুঝতে অসুবিধে হয়?" সে ধম্‌কে ওঠে, "উঠে দাঁড়া। ও-ঠ!"

শেষ কথাটা এত জোরে বলল অর্ণব যে লোকটা কেঁপে উঠল। মার খেয়ে সারা শরীরে ব্যথা। তবু কোনো মতে উঠে দাঁড়াল। সভয়ে বলল, "কী করছেন স্যার?"

"সমাজসেবা!"

অর্ণব কনস্টেবলদের দিকে তাকিয়ে বেরিয়ে যেতে ইঙ্গিত করে। তারাও তাড়াতাড়ি বুট খটখটিয়ে বেরিয়ে গেল। এখন সে আর পবিত্র ছাড়া আর কেউ নেই। ম্যানেজার ভয়ে ভয়ে বলল, "সমাজসেবা?"

"সোশ্যাল সার্ভিস।" অর্ণব তার মাথার দিকে বন্দুক তাক করেছে,

"এই ডিস্ট্যান্সটা ঠিক আছে?"

- "আরেকটু পিছিয়ে এসো অর্ণব।" পবিত্র বলল, "ঘিলু ছিটকে যাবে। তোমার আমার শার্টের বারোটা বাজবে।"

লোকটার দুশো ছ'টা হাড়ে তখন খট্‌খটানি শুরু হয়ে গিয়েছে। ঠিকই ধরেছে সে। এনকাউন্টারের মুডেই আছে এরা! -"স্যার...!"

- "শশশ।" পবিত্র দাবড়ে ওঠে— "চুপ কর। কনসেনট্রেট করতে অসুবিধে হচ্ছে। গুলিটা একটু এদিক ওদিক হলে তোরই কষ্ট হবে।" —"স্যার! শুনুন...!"

—"শোনার সময় নেই।" অর্ণব বলল, "তুই কিছুই জানিস না। তাই তোকে আমাদের আর দরকার নেই। অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রাখতে নেই, ফেলে দিতে হয়। স্বচ্ছ ভারত অভিযানের নাম শুনেছিস? আনঅফিশিয়ালি হিস্ট্রিশিটারদের সরানোও স্বচ্ছ ভারত অভিযানের একটা পার্ট।"

পবিত্র পেছন থেকে বলল, "ওকে। অর্ণব, শ্যু-ট।"

"স্যার!" লোকটা ঝুপ করে বসে পড়ে চিৎকার করে ওঠে— "প্লিজ মারবেন না! বলছি... বলছি।"

– "বলার দরকারই নেই!" অর্ণব ট্রিগারে আঙুল রেখে খুব ঠান্ডা কণ্ঠস্বরে বলল। "টাইম আউট! তোকেও আমরা একটা ফ্রিজারে পাঠাবো। সরকারি ফ্রিজার। চল্ বাই!"

"স্যার! আমি সত্যিই কিছু জানি না। সব ঐ গগনের কথায় করেছি।"

সে হাউমাউ করে অর্ণবের পা জড়িয়ে ধরেছে, "প্লিজ শুনুন! গগন আমায় টাকা দিয়েছিল। তিনটে লাশের জন্য দেড় লাখ...!" অর্ণব তখনও বন্দুক সরায়নি। তাকে গান পয়েন্টে রেখে চুপ করে তাকিয়ে আছে। তার দৃষ্টি ক্রুর, নিষ্ঠুর!

"বলতে থাক"। পবিত্র পেছন থেকে বলল, "নয়তো...।"

"না। বলছি।" লোকটা গড়গড়িয়ে বলতে থাকে, "গগন বলেছিল কোন এক ম্যাডামের কথায় সে নাকি কাজ করে। ম্যাডাম খুব সুন্দরী। তিনি টাকা দেবেন। বেশি কিছু করতে হবে না। শুধু একটা লাশ কিছুদিনের জন্য ফ্রিজারে রেখে দিতে হবে। আমি ছাপোষা মানুষ। টাকার লোভে কাজটা করেছি স্যার।"

-"ছাপোষা মানুষেরা ফ্রিজারে লাশ রাখে?" অর্ণব গর্জন করে ওঠে, "ফাজলামি মারার জায়গা পাসনি! শা—লা চুতিয়া! তোকে তো...।" সে ফের অর্ণবের পায়ের ওপর পড়েছে, "আমি এর বেশি কিছু জানি না। গগন রিসর্ট থেকে চুপিচুপি লাশ বের করে আনত। এমনকি লাশগুলো কোন্ কটেজে থাকত তাও জানি না। গগন আগেই রাতের অন্ধকারে লাশগুলোকে বের করে ভেতরের বাগানে লুকিয়ে রাখত। ও ফোন করলেই আমি সুযোগ বুঝে চলে যেতাম। তারপর ফ্রিজারে রেখে দিতাম কিছুদিনের জন্য। গগন ফের এসে লাশ নিয়ে যেত। ততদিন আইসক্রিম পার্লার বন্ধ রাখতাম।"

"টাকা কে দিত তোকে?"

"গগনই দিত"। পবিত্র'র প্রশ্নের উত্তরে জানাল বিমান সাঁপুই, "নগদে টাকা দিয়ে যেত।"

"ম্যাডামকে দেখিসনি? গগন তাঁর সম্পর্কে কিছু বলেনি?"

"একদিনও দেখিনি। তবে গগন বলেছিল 'কড়ক মাল'। আর বলেছিল ম্যাডাম গায়ে হাবিজাবি ছবি আঁকাতে ভালোবাসেন।" সে অর্ণবের পায়ের ওপরই কাঁপতে কাঁপতেই শুয়ে পড়েছে, "আমি আর কিছু জানি না। আমি প্রত্যেকবারই কাজ হয়ে যাওয়ার পর ফ্রিজ সারাই কোম্পানির লোককে ফোন করতাম। এবার যে কে ওদের আগেই খবর দিয়ে দিল তাও জানি না! তার ওপর আপনারাও এসেছিলেন। আমি শুধু এইটুকুই গগনকে জানিয়েছিলাম। ও শালা হারামখোর আমাকেই ফাঁসিয়ে দিয়েছে!"

অর্ণব তার দিকে একটা অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টিপাত করে রিভলবারটা সরিয়ে নিল। তারপর গটগট্ করে বেরিয়ে গেল। পেছন পেছন পবিত্রও।

– "সু-পা-র্ব!" পবিত্র বাইরে বেরিয়েই বলল, "কিছুক্ষণের জন্য আমার তো মনেই হচ্ছিল যে অর্ণব সরকার নয়— অধিরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় কথা বলছে! শুধু হাইট আর ভয়েসটা অন্যরকম।" অর্ণব একটু বিষণ্ন হাসল, "এসব স্যারকে দেখেই শিখেছি। কে জানে কেমন আছেন এখন!"

"আজ বিকেলে কে গেল?"

"এ.ডি.জি শিশির সেন আর আহেলি।"

"ও"। পবিত্র বলল, "আমি কাল সকালে যাবো তবে। আজ বরং গোল্ডেন মুনে ফরেনসিক টিমকে সঙ্গে নিয়ে চলে যাই। প্রত্যেকটা রিসর্ট খুঁজে দেখব। দেখি, যদি কিছু পাওয়া যায়।"

- "ওকে।"

অর্ণব নিজের টেবিলের দিকেই হেঁটে চলে যাচ্ছিল। মনটা ভারী হয়ে আছে। আজ একবার হসপিটালে যেতে পারলে বোধহয় ভালো হত। কে জানে, ওদিকে কী অবস্থা। আহেলি আর এ.ডি.জি সেন গেছেন অবশ্য...। হঠাৎই বুকপকেটে তার মোবাইলটা ভাইব্রেট করে উঠল। অর্ণব তাড়াতাড়ি ফোনটা বের করে দেখল স্ক্রিনে ভেসে উঠেছে আহেলির নাম। আশঙ্কায় তার হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে ওঠে।

(বাইশ)

অন্যদিকে ডঃ অসীম চ্যাটার্জী ফরেনসিক ল্যাবে অস্থিরভাবে পায়চারি করছিলেন। গেটকীপারের লাশ থেকে বলার কিছুই নেই। একদম পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে কেউ গুলি মেরেছে। এক গুলিতেই শেষ। তার গায়ে কোনও ফিঙ্গারপ্রিন্টও নেই। বেসিক্যালি, তার দেহ থেকে কিছুই তেমন পাওয়া যায়নি। বাকি রইল বুলেট ও রিভলবারের বিষয়। রিভলবারে একমাত্র রিয়া বাজাজের আঙুলের ছাপে পাওয়া গিয়েছে। ঐ রিভলবার থেকেই দুটো গুলি বেরিয়েছে কিনা সেটা ব্যালিস্টিক এক্সপার্টরা বলবে। দুই, বিজয় জয়সওয়ালের গাড়িতে এভিডেন্সের জোরদার খোঁজ চলছে।

এখনও পর্যন্ত তেমন কিছুই পাওয়া যায়নি। তবু ফরেনসিক টিমের সদস্যরা হাল ছাড়েনি। তাঁর সহকারীরা প্রাণপণ তল্লাশি চালিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু ডঃ বিজয় জয়সওয়ালের দেহটা যেন আপাদমস্তক রহস্য! লোকটা আন্দাজ প্রায় আশি ঘন্টা আগে মারা গিয়েছে। অথচ পাওয়া যাচ্ছে না কিছুই। আশ্চর্য! তাঁর ধারণা ছিল পুলিসের ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা কিছু বের করতে না পারলেও তিনি অন্তত কিছু পাবেন। ব্লাড থেকে পাকস্থলী, মাথার চুল থেকে নখ অবধি সবই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছেন। অথচ কিছুই পাওয়া যায়নি। এখন তো তাঁরও সন্দেহ হচ্ছে যে এগুলো সত্যিই খুন কি না! নয়তো এখনও মার্ডার ওয়েপন-র কোনও খোঁজ মেলে না! নিজেকে নিজেই ধিক্কার দিচ্ছেন। চিরদিনই নিজের বুদ্ধি নিয়ে জাঁক করে গেলেন! অথচ এই মুহূর্তে যখন তাঁর একটা কথা কেসের অভিমুখ বদলে দিতে পারে, তখনই তিনি ব্যর্থ!

আপনমনেই ভ্রুকুটি করলেন অসীম চ্যাটার্জী, "ব্যর্থ হব না আমি! কেউ পারেনি। কিন্তু আমি ডঃ অসীম চ্যাটার্জী। কলকাতার সবচেয়ে অভিজ্ঞ ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ! কেন ফেল মারব?" কিন্তু ব্যাপারটা আদতে হচ্ছে কী! ডঃ বিজয় জয়সওয়ালের দেহে লাভ বাইটের দাগ স্পষ্ট। মৃত্যুর আগে তিনিও অর্জুন শিকদারের মতই সেক্স করেছিলেন। তারপরই মরে গেল লোকটা! আগের দু বার ভিকটিম ছ থেকে সাতদিন বেঁচে ছিল। এবার অতদিন বাঁচেইনি! খুনীর এত তাড়া কেন? তাছাড়া কী করেই বা মরল! গায়ে লাভ-বাইট ছাড়া

আর কোনও দাগ নেই ! পাকস্থলী খাদ্যহীন। বিষ যদি হয়— সেটা শরীরে গেল কী করে? উত্তর নেই। মৃত্যুর কারণ যথারীতি সেই অ্যাকিউট হেপাটিক ও রেনাল ফেইলিওর! আশ্চর্য! আজকাল কি লিভার ড্যামেজ আর রেনাল ফেইলিওর নামক জিনিসগুলো থালায় কিনতে পাওয়া যাচ্ছে? নাকি দুনিয়ার সব মাতাল ও দুশ্চরিত্ররা ঠিক করেছে লিভার - বরবাদ করেই মরবে। হাউ? হাউ? অধিরাজের জামাকাপড় ও মোবাইলও পরীক্ষা করে দেখেছেন তিনি। মোবাইলটা খুব সযত্নে মুছে দেওয়া হয়েছে। কোনও ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেই। তবে তার জ্যাকেটে ফিঙ্গারপ্রিন্ট খোঁজা শক্ত। এত লোকে ছুঁয়েছে যে ফিঙ্গারপ্রিন্ট তোলাই মুশকিল। গান পাউডারের ট্রেস অবশ্য আছে। সেটা রিয়া বাজাজের আঙুল থেকে আসাও সম্ভব। কিন্তু যে জিনিসটা দেখে চমকে গেছেন তা হল তার টি-শার্টেও স্ট্রবেরি লিপবামের ট্রেস রয়েছে! সেই স্ট্রবেরি লিপবাম যা অধিরাজের ঠোঁটেও লেগেছিল। তিনি পবিত্র আচার্য'র কাছ থেকে জেনেছেন ওরা কেউ তাকে সি.পি.আর দেয়নি। তবে দিল কে? যে দিয়েছিল সম্ভবত সে-ই টি-শার্টটা দাঁত দিয়ে ছিঁড়বার চেষ্টা করেছিল। সে রিয়া বাজাজ হতে পারে না! মানসী জয়সওয়াল হতেই পারেন না! তিনি অধিরাজকে কামড়ে দিতে পারেন, চুমুও খেতে পারেন, কিন্তু "কিস্ অব লাইফ" দেওয়া তাঁর কম্মো নয়। এ জিনিস সেই পারে যে সি.পি.আর দিতে জানে। মেডিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড যার আছে।

ফের বিড়বিড় করে উঠলেন তিনি, "রাজা, কী করছ তুমি! মালি তো একটাই! প্রশ্ন হল ফুল কি দুটো? একটা মানসী জয়সওয়াল হলে দ্বিতীয়টা কে ভাই!" ডঃ চ্যাটার্জী হয়তো আরও কিছুক্ষণ নিজের মনে বকে যেতেন তার আগেই মোবাইল বেজে উঠেছে। তিনি আড়চোখে তাকিয়ে দেখলেন আহেলি ফোন করছে।

"হ্যালো!"

ফোনটা ধরতে না ধরতেই ওপ্রান্ত থেকে ভেসে এল আহেলির ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর, "স্যার, এখনই হসপিটালের সিসিইউ তে চলে আসুন। অফিসার ব্যানার্জী যেন কেমন করছেন!"

"কেমন করছে মানে?" তাঁর হৃৎপিণ্ড যেন ট্র্যাপিজ প্লেয়ারের মতো ভল্ট খেল, "কী হয়েছে? সেন্স এসেছে?" -

"না। চোখ বোজা। ওঁর ডেলিরিয়াম হচ্ছে।" আহেলি প্রায় কেঁদেই ফেলে— "উনি অক্সিজেন মাস্ক, চ্যানেলগুলো আরেকটু হলেই টানাটানি করে খুলে ফেলছিলেন। কেমন যেন পাগল পাগল হাবভাব। একজন ওয়ার্ডবয়কে এমন ধাক্কা মেরেছেন যে আরেকটু হলেই পড়ে গিয়ে মাথাটা ফাটত। ওয়ার্ডবয়রা সামলাতে না পেরে হাত বেঁধে দিয়েছে। তার ওপর কীসব ভুল বকছেন। বডি টেম্পারেচার ওয়ান ও ফোর ফারেনহাইটেরও বেশি। স্যাচুরেশন লেভেল কম। ব্লাড প্রেশার ক্রমাগতই ফ্লাকচুয়েট করছে। এ.ডি.জি সেন, ওঁর পেরেন্টস কী করবেন বুঝতে পারছেন না।"

"তাতে কী হয়েছে!" তিনি যেন আহেলিকে বোঝানোর বদলে নিজেকেই বোঝাচ্ছেন, "হাই ফিভার হলে ডেলিরিয়াম হতেই পারে। ভুল বকতেই পারে। আর ও যে লাফালাফি করবে সেটাই তো স্বাভাবিক। যেরকম শান্ত ছেলে তাতে অতগুলো নল চুপচাপ সহ্য করলেই বরং আশ্চর্য হতাম! ডাক্তাররা হাত বেঁধে দিয়ে ঠিকই করেছেন। যদিও সে দড়ি কতক্ষণ টিকবে বলা মুশকিল।"

—"কিন্তু অফিসার ব্যানার্জী কিছু একটা বলার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। একবার অক্সিজেন মাস্ক টান মেরে খুলে ফেলেছিলেন। তখনই বারবার আপনার নাম নিয়েছিলেন। অর্ণব সরকারকেও ডাকছেন! আপনাদের দুজনকেই খুব হেল্পলেস ভাবে ডাকছেন উনি, স্যার। কী বলছেন, অক্সিজেন মাস্কের জন্য বোঝা যাচ্ছে না। আপনি তাড়াতাড়ি আসুন।"

ডঃ চ্যাটার্জী একমুহূর্ত দেরি না করে বললেন, "ওকে। আসছি।"

ফরেনসিক বিশেষজ্ঞের কাজ মাথায় উঠল। তিনি ল্যাবের দায়িত্ব অন্য একজনকে দিয়ে সবেগে বেরিয়ে গেলেন। নিজের গাড়ির দিকে দৌড়তে দৌড়তেই অর্ণবকে ফোন করলেন। অর্ণবও ততক্ষণে সংবাদ পেয়েছে। সে ও হসপিটালের দিকেই যাচ্ছে।

—"গিয়ে আবার কোনওরকম হুলস্থুল কাণ্ড বাঁধিয়ে বোস না।", ডঃ চ্যাটার্জী তাকে সাবধান করেন— "রাজা প্রলাপ বকছে ঠিকই, কিন্তু প্রলাপের মধ্যেও কাজের কথা কিছু থাকতে পারে। কান খাড়া করে, শোনার চেষ্টা করবে ঠিক কী বলছে। আর ওকে ডাকাডাকি করবে না — শুধু শুনবে।"

"ঠিক আছে।"

তাড়াহুড়ো করে, যানজট ঠেলে যতক্ষণে হসপিটালে পৌঁছলেন ডঃ চ্যাটার্জী ততক্ষণে সেখানে রীতিমত দক্ষযজ্ঞ শুরু হয়ে গিয়েছে। অধিরাজের বাবা-মা, আহেলি, অর্ণব, এ.ডি.জি শিশির সেন বাইরেই চিন্তিত গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ডঃ চ্যাটার্জী এ.ডি.জি সেনকে দেখে সসম্ভ্রমে বললেন, "আপনি বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন স্যার? ভেতরে ঢুকতে দিচ্ছে না?"

– "না!" তিনি খুব শান্তভাবেই বলেন, "দিয়েছিল। কিন্তু এভাবে কখনও রাজাকে দেখিনি। ভালো লাগছে না। আপনি প্লিজ ডাক্তারদের দেখুন। ওঁরা ওকে সামলাতে পারছে না। ক্রমশ রেস্টলেস হয়ে যাচ্ছে।"

স্বাভাবিক! পেশেন্ট যদি এত অস্থির হয় তবে ডাক্তারদের পক্ষেও তাকে সামলানো কষ্ট। অধিরাজের মারপিট করার ক্ষমতা এইমুহূর্তে নেই। কিন্তু যেটুকু আছে, তা সবাইকে ঘোল খাইয়ে ছাড়ার পক্ষে যথেষ্ট। ডঃ চ্যাটার্জী দেখলেন, সে রীতিমত ছট্‌ফট্‌ করছে। ভীষণ অস্থির, অশান্ত। যতবার তার হাত বাঁধা হচ্ছে, ততবারই দড়ি ছিঁড়ে ফেলছে। অক্সিজেন মাস্ক, চ্যানেল সমেত যাবতীয় নল পছন্দ হচ্ছে না বলে টান মেরে খোলার উপক্রম করছে। ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক রীতিমত বিপন্ন। ডঃ চ্যাটার্জীকে দেখেই বলে উঠলেন— "কী করি বলুন তো। অফিসার যা শুরু করেছেন তাতে কী করব বুঝতে পারছি না। একজন ওয়ার্ডবয়কে ঠেলে ফেলে দিয়েছেন। হাত বেঁধেছিলাম। কিন্তু উনি ছিঁড়ে ফেলেছেন। এত ছট্‌ফট্‌ করছেন যে একবার বেড থেকে পড়েই গিয়েছিলেন। এখন তো আমিও এগোতে ভয় পাচ্ছি। ঐ হাতের ঘুষি খেলে আর দেখতে হবে না! ওদিকে আই জি, সি আই ডি! গায়ে হাত দিতেও ভয় করছে। কিন্তু এরকম হলে ওঁকে বাঁচানো অসম্ভব।"

"কী দড়ি দিয়ে বেঁধেছিলেন?"

"প্রথমে সাধারণ দড়ি দিয়েছিলাম। তাতেও কিছু হচ্ছে না দেখে শক্ত দড়ি দিয়ে বেঁধেছিলাম।" ডক্টর রীতিমত নার্ভাস, "কিন্তু সেটাও একটু আগেই ছিঁড়ে গেল।"

ডঃ চ্যাটার্জী একমুহূর্ত ভাবলেন, "মোটা নাইলনের দড়ি আছে?"

"নাইলনের দড়ি!"

— "হ্যাঁ। থাকলে নিয়ে আসুন। অবাধ্য পেশেন্ট হলে আসুরিক ব্যবস্থাই করতে হবে। আর শুধু হাত বাঁধবেন না। ও একজন অত্যন্ত দক্ষ সি.আই.ডি অফিসার। সজ্ঞানে থাকলে এরকম করত না। কিন্তু এখন যেটা করছে, সেটা রিফ্লেক্স অ্যাকশন! হাত বাঁধলে সেটা কী করে খুলতে হয়, খুব ভালো ভাবেই জানে। এক্সপার্ট লোক। আপনি যতই কায়দা করে বাঁধুন ঠিক খুলে ফেলবে। এভাবে আটকানো যাবে না।"

ডাক্তারবাবু রুমালে মুখ মুছে বললেন, "তবে?"

"মাথা থেকে পা অবধি এমন ভাবে টাইট করে বাঁধুন যাতে নড়াচড়াই না করতে পারে। আপনি দড়ির ব্যবস্থা করুন। আমি দেখছি।"

"যদি মেরে ধরে দেন!"

ডঃ চ্যাটার্জী হেসে ফেললেন। একটা অজ্ঞান, অসহায় লোককে কী ভয়ই না পাচ্ছে এরা! ওঁদেরও দোষ নেই। আজকাল লোকে কথায় কথায় ডাক্তারদের গায়ে হাত তোলে। কিছুদিন আগেই এক পুলিস অফিসার এক ডাক্তারকে থাপ্পড় মারায় প্রচুর ঝামেলা হয়েছিল। এই চিকিৎসকও সেই ভয়টাই পাচ্ছেন।"

"আপনি শুধু দড়িটা আনুন। বাকিটা আমরাই দেখে নিচ্ছি। ডঃ চ্যাটার্জী এবার বাইরে বেরিয়ে অধিরাজের মা-বাবাকে ডেকে নিলেন।

অধিরাজের মায়ের চোখ দুটো লাল। ফুলো ফুলো। তাকে ভেতরে ডেকে নিয়ে বুঝিয়ে বললেন, "দেখুন, ছেলে যতই ডেলিরিয়ামে থাকুক, মায়ের স্পর্শ সে ঠিকই চিনবে। আমাদের কথা ও শুনতেও পাবে না, বুঝতেও পারবে না। কিন্তু মায়ের কণ্ঠস্বর মানুষ এমন স্টেজ থেকে শুনে আসে যখন সে সম্পূর্ণ অচেতন। ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে থেকেই যে স্বর শুনে এসেছে, তাকে চিনতে ভুল হবে না। এমনও কেস আছে, যেখানে কোমায় থাকা সন্তানও মায়ের ডাক শুনে সাড়া দেওয়ার চেষ্টা করেছে। অশান্ত ছেলেকে একমাত্র তার মা শান্ত করতে পারেন। আপনি একটু দেখুন ম্যাডাম।" অধিরাজের মা কোনও কথা না বলে এগিয়ে গেলেন ছেলের দিকে। তার বেডের পাশের টুলটায় বসে জ্বরতপ্ত কপালে হাত রেখে আস্তে আস্তে ডাকলেন— "রাজা!"

অধিরাজের দেহটা কেঁপে উঠল। অশান্ত মানুষটা এবার যেন খণ্ড মুহূর্তের জন্য একটু স্থির হল। তার হাত দুটো এবার অন্ধ মানুষের মতো হাতড়ে হাতড়ে কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছে। মা তার হাত ধরে ফেললেন, "এই তো আমি! কী কষ্ট হচ্ছে?"

অধিরাজ বিড়বিড় করে কিছু বলল। মুখে অক্সিজেন মাস্ক থাকার ফলে কথাগুলো স্পষ্ট নয়। কিন্তু ডঃ চ্যাটার্জীর অভ্যস্ত কানে ধরা পড়ল কথাটা, —"আসছি মা! আর দু মিনিট!"

– "রেসপন্স করছে। ভুল রেসপন্স। কিন্তু চিনতে পেরেছে।" ডঃ চ্যাটার্জী বললেন, "আপনি ওর দু হাত ধরে কথা বলতে থাকুন। আমরা সেই ফাঁকেই কাজ সেরে ফেলি।"

যেমন কথা তেমনই কাজ । মা ছেলের মাথায়, বুকে হাত বুলিয়ে, আদরে, কথায় ভুলিয়ে রাখলেন। সেই সুযোগেই দুজন ওয়ার্ডবয় সহ ডঃ চ্যাটার্জী ও অর্ণব তাকে বিছানার সঙ্গে টাইট করে বাঁধল। এমনকী স্বয়ং এ.ডি.জি শিশির সেনও হাত লাগালেন। এখন লাফালাফি তো দূর, সে সামান্য নড়াচড়াও করতে পারবে না। কাজ শেষ করে বেডের চারপাশের রেলিংগুলো তুলে দিয়ে বললেন ডঃ চ্যাটার্জী, "এবার দেখি যাদু, তোমার গায়ে কত জোর! ক্ষ্যামতা থাকলে এই দড়িটা ছিঁড়ে বেড থেকে পড়ে দেখাও।"

— "অর্ণব...! অর্ণব।"

- ডঃ চ্যাটার্জী অর্ণবের দিকে তাকালেন। অর্ণব এগিয়ে গেল, "স্যার।"

"আরও... একটা! আরও... একটা!"

শুধু এই দুটো শব্দই শোনা গেল । বাকি কথাগুলো ফের অক্সিজেন মাস্কে আটকে গিয়েছে। ডঃ চ্যাটার্জী নিরুপায়ের মতো তাকালেন ডাক্তারবাবুর দিকে, —"কিছুক্ষণের জন্য অক্সিজেন মাস্কটা সরানো যাবে? জাস্ট ফর আ সেক।"

ডাক্তারবাবু একবার তাঁদের সবার দিকে তাকালেন। তারপর শ্রাগ করলেন— "ওকে। তবে বেশিক্ষণের জন্য নয় কিন্তু।"

অক্সিজেন মাস্ক খুলে গেল। অধিরাজ ফের বিড়বিড় করে ওঠে। কণ্ঠস্বর স্খলিত, ক্ষীণ —"আরও একটা! আরও একজন... বাজাজ... বাজাজ এখনও আছে। আবার... আর.আই.পি পোস্ট... বেশি সময় নেই... সময় নেই! প্রিয়া... জয়সওয়াল! অহল্যা... অহল্যা...!"

অর্ণব বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে থাকে। কী বলছে? আবার আর.আই.পি পোস্ট পড়বে! এ তো সাধারণ প্রলাপ মনে হচ্ছে না!

- "অর্ণব... অর্ণব স-র-কা-র!" এবার সে যেন একটু জোরেই বলল, —"কোথায়?"

অর্ণব উত্তর দিতেই যাচ্ছিল। ডঃ চ্যাটার্জী ইশারা করে তাকে চুপ থাকতে বললেন। অর্ণব উত্তর দিলেও সে চিনতে পারবে না। বুঝতেও পারবে না। তার যা বলার সে এমনিই বলবে।

- "শীত... শীত করছে শীত... ঠান্ডা... বরফ!"

এবার অর্থহীন কথাবার্তা! অক্সিজেন মাস্ক সরে যাওয়ায় তার নিঃশ্বাস নিতে বেশ অসুবিধে হচ্ছে। একটু দম নিয়েই কোনোমতে হাঁফাতে হাঁফাতে ফের বলে উঠল সে, "ড...ক! হোয়াই! হোয়াই! হোয়াই নাইন্টি সিক্স? হোয়াই ওয়ান টুয়েন্টি? হোয়াই নট টুয়েলভ্ অর টুয়েন্টি ফোর? ফ্রিজ কেন?... হোয়াই?"

ডঃ চ্যাটার্জী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন অধিরাজের দিকে। ঠিক কী বলছে?

- "এবার হয়নি... নাইন্টি সিক্স হয়নি... ব্লাডার... হোয়াই ডক্?" সে ফের জোরে চেঁচিয়ে উঠল, "উত্তরটা কী? আন্সার মি ডক্!"

ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ বিস্মিত, বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছেন। কোন্ প্রশ্নের উত্তর অবচেতনে খুঁজে বেড়াচ্ছে অধিরাজ? তিনি যেন এখন একটু একটু বুঝতে পারছেন। বোধহয় ধরতে পারছেন, কী বলতে চাইছে সে!

"মা... আমায় মারছ কেন?... আমার বুকে... বুকে...!" বলতে বলতেই ফের ছটফট করে উঠেছে। যেভাবে শ্বাস নিচ্ছে তাতে স্পষ্ট, আর টানতে পারছে না। ডাক্তার দ্রুতহাতে তার মুখে অক্সিজেন মাস্ক পরাতে পরাতে বললেন, "সরি। আর অ্যালাউ করতে পারছি না। উনি নিঃশ্বাস নিতে পারছেন না। আপনারা প্লিজ এবার বাইরে যান।"

অর্ণব লক্ষ্য করল ডঃ চ্যাটার্জীর ভুরু দুটো ফের শুঁয়োপোকা মূর্তি ধারণ করেছে। অধিরাজের মা ছেলের মাথায় হাত বোলাচ্ছিলেন। তিনি একটু অপ্রতিভ দৃষ্টিতে তাকালেন। বোধহয় এখনই ছেলেকে ছেড়ে ওঠার ইচ্ছে নেই।

– "এক মিনিট ডক্টর।" ডঃ চ্যাটার্জী এগিয়ে গেলেন অধিরাজের দিকে— "একটা জিনিস একটু দেখি।"

"শিওর।"

অধিরাজ এখন অনেকটাই শান্ত। তবে এখনও খুব ক্ষীণস্বরে কী যেন বিড়বিড় করছে। ডঃ অসীম চ্যাটার্জী চাদরটা সরিয়ে তার অনাবৃত ঘাড়, গলা, কাঁধ, বুক খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছিলেন। হঠাৎই কী দেখে যেন তাঁর চোখ দপ করে উঠল। দাঁতে দাঁত পিষে বললেন, "ব্লাডি বিচ!"

অর্ণব কৌতূহল সামলাতে না পেরে ডঃ চ্যাটার্জীর প্রায় ঘাড়ের ওপর দিয়েই ঝুঁকে পড়ল। যা দেখল তাতে তার চক্ষু চড়কগাছ! অধিরাজের গলা এবং ডান কাঁধের সঙ্গমস্থলে জ্বলজ্বল করছে খুব সামান্য একটা রক্তাভ চিহ্ন! লাভ বাইট!

"সর্বনাশ!" সে বলতেই যাচ্ছিল,"হিক....!"

হিকি! ডঃ চ্যাটার্জী ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে ইশারায় তাকে থামালেন। সেটাই স্বাভাবিক। কোনও মায়ের সামনে এসব কথা না বলাই ভালো। কিন্তু অর্ণবের মনে হল, এবার তার মাথা ঘুরছে। ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সঙ্গে খুব নীচু গলায় কিছু বলে গম্ভীর মুখে বেরিয়ে গেলেন। এ.ডি.জি সেন অধিরাজের বাবার সঙ্গে কথা বলছিলেন। ওদের বেরিয়ে আসতে দেখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন।

- "আমার মনে হয় রাজার ব্লাড থেকে শুরু করে টিস্যু, পা থেকে মাথা পর্যন্ত ইনভেস্টিগেট করা দরকার। এমনকী যদি কিছু খেয়ে থাকে, দরকার পড়লে সেগুলোও টেস্ট করা দরকার।" ডঃ চ্যাটার্জী গম্ভীর মুখে বললেন, "যদি কোনওরকম এভিডেন্স থাকে।" -

-"ইউ মিন...!" এ.ডি.জি সেন ফরেনসিক বিশেষজ্ঞের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছেন— "পয়জন?"

- "শিওর নই। ডক্টরকে বলে এসেছি। উনি টেস্ট করবেন বলেছেন। দেখা যাক।" তাঁর চোখে অদ্ভুত একটা কুটিল দৃষ্টি, "আসছি স্যার।"

হসপিটালের বাইরে বেরিয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ ধূমপান করলেন অসীম চ্যাটার্জী। অর্ণব আর আহেলিকে চা অফারও করলেন। তাঁর মাথায় কিছু যে ঘুরছে তা মুখভঙ্গিতেই স্পষ্ট। অর্ণব কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। তার এখনও সন্দেহ যে হিকিজের মাধ্যমে কিছু না কিছু তো হচ্ছেই। অধিরাজের সঙ্গে যে 'সর্বনাশিনী'র দেখা হয়েছে তা ঐ ছোট্ট দাগটাই স্পষ্ট বলে দেয়। আসলে তবে হয়েছিলটা কী? সে একটু আমতা আমতা করে বলে, "স্যার কী বললেন কিছু বুঝেছেন?"

– "কিছুটা তো ভুলভাল! অত ফিভার থাকলে তো ভুল বকবেই।" ডঃ চ্যাটার্জী সিগারেটটাকে ফেলে দিয়ে বললেন, "কিন্তু প্রশ্ন হল, যেটা অর্থহীন নয় সেটা ঠিক কী?"

- "মানে?"

"মানে আসল প্রশ্নটা ও ঠিকই করেছে। আমরা ভাবছিলাম, "হোয়াট? হাউ?" ও সঠিক অ্যাঙ্গেলটাই ধরেছে। প্রশ্নটা হোয়াট বা হাউ নয়, হোয়াই! এই প্রশ্নটাই ওর মাথায় স্ট্রাইক করেছে।"

"হোয়াই!"

-"হ্যাঁ। আমি যা বুঝেছি তা তোমায় বলছি।" ডঃ চ্যাটার্জী একটু চুপ করে থেকে বললেন, "রাজার প্রশ্নটা ছিল 'হোয়াই নাইন্টি সিক্স ? হোয়াই ওয়ান টুয়েন্টি? হোয়াই নট টুয়েলভ্ অর টুয়েন্টি ফোর? হোয়াই? ফ্রিজ...... কেন?' তাই তো? আসলে এই নাইন্টি সিক্স, ওয়ান টুয়েন্টি টুয়েলভ্ আর টুয়েন্টি ফোর সংখ্যাগুলো ও আনতাবড়ি বলেনি। এগুলো আওয়ার্স। মানে ঘন্টা। ও লাশগুলো ডাম্প করার প্যাটার্নটা বোঝাতে চাইছিল আমাকে। কেন লাশগুলো ঠিক ছিয়ানব্বই ঘন্টা বা একশো কুড়ি ঘন্টার পরে পাওয়া গিয়েছিল? চব্বিশ ঘন্টা বা বারো ঘন্টা পরে সুযোগ বুঝে ডাম্প করা হয়নি? ফ্রিজার ইউজ করতে হল কেন? এই প্রশ্নেরই উত্তর চাইছিল ও।" তাঁর কপালে গভীর ভাঁজ, "জাতে মাতাল তালে ঠিক। ভুল বকার মধ্যেও সঠিক কথাটাই বলেছে।"

অর্ণবের মনে পড়ল, ঐ ম্যানেজারও বলেছিল, তারা ভাবতেই পারেনি যে রেফ্রিজারেটর সারাই করার লোক এত তাড়াতাড়ি খবর পাবে! তার মানে এবারও ওরা দেরিতেই ডাম্প করার তালে ছিল। অধিরাজের একটা ফোনেই সব ভেস্তে গিয়েছে।

সে কথা বলতেই ডঃ চ্যাটার্জী প্রায় লাফিয়েই উঠলেন— “রাইট ইউ আর। রাজাও সেটাই বলছিল। ও বলছিল- এবার ছিয়ানব্বই হয়নি! ব্লান্ডার! রাজার হুড়ো খেয়ে সত্যিই ব্লান্ডার করেছে! এইবার আশি ঘন্টার সামান্য বেশি হয়েছে কিন্তু ছিয়ানব্বই হয়নি। এইবার ভুল করেছে অর্ণব! আর এইবার আমি ছাড়ছি না। আহেলি... কুইক! ই-উ-রে-কা!”

আহেলিকে প্রায় বগলদাবা করেই গাড়ির দিকে ছুটলেন ডঃ অসীম চ্যাটার্জী।

(তেইশ)

"আমি সাগরের বেলা, তুমি দুরন্ত ঢেউ
বারে বারে শুধু আঘাত করিয়া যাও।
ধরা দেবে বলে আশা করে রই, তবু ধরা নাহি দাও
বারে বারে শুধু আঘাত করিয়া যাও।"

আবার একটা নিঃশব্দ রাত। চতুর্দিক নিস্তব্ধ, নিঃঝুম। তার মধ্যেই ভেসে আসছে গানের সুর। ঘরে খুব স্তিমিত আলো জ্বলছে। সে আলো এমনই যে টর্চ মেরে দেখতে হবে আদৌ আলোটা জ্বলছে কিনা! সেই আলো-আঁধারিতে ঠিকভাবে কাউকেই দেখা সম্ভব নয়। অবশ্য খুব ভালো করে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে আধো অন্ধকারে মিশে একটা অস্থির ছায়া বিক্ষিপ্তভাবে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে।

গানটা ডিভিডি প্লেয়ারে বাজছিল। মান্না দে'র দরদী কণ্ঠ পরম আকুলতায় কোনও এক নিষ্ঠুর প্রেমিকের উদ্দেশ্যে প্রেমে উপছে পড়ছে। গানটা শুনলেই বুকের মধ্যে একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা পাক মারে। মনে হয়, যেন সত্যিই কাউকে ভালোবাসার কথা ছিল। কিন্তু আজও হল না। যা হতে পারত, তা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। এক বিশাল সমুদ্রতটের মতো শূন্য ভূষিত বুক নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। কেউ তরঙ্গ হয়ে বারবার ঝাঁপিয়ে পড়ছে সেই বুকে। অথচ নিমেষের মধ্যেই সরে যাচ্ছে। তাকে ধরার উপায় নেই। চোখের সামনেই জল ছলছল করছে, অথচ তার বুকে শুধু বালি। তরঙ্গের পর তরঙ্গ শুধু ব্যথাই দিয়ে চলেছে। আর কোনও প্রাপ্তি হল না। মা-ও এই গানটা খুব গাইতেন। পুরনো দিনের গান গাইতে ভালোবাসতেন খুব। গলাটা অপূর্ব ছিল তাঁর। এত মিষ্টি আর সুরেলা কণ্ঠস্বর আর কখনও শোনেনি সে। মায়ের মুখে কতবার যে এই গানটা শুনেছে সে! যখন গাইতেন 'বারে বারে শুধু আঘাত করিয়া যাও' তখন মনে হত সত্যিই আহত বুকের পাঁজর থেকে রক্ত চুইয়ে পড়ছে। চোখদুটো কাতর এক প্রত্যাশায় তাকিয়ে থাকত বাইরের দিকে। মেঘের মতো চুল পিঠ ছাপিয়ে পড়ত। কণ্ঠস্বরে আবেগ পাখির পালকের মতো তিরতিরিয়ে কাঁপত। মা গাইতেন। আর সে হাঁ করে তাকিয়ে থাকত। ভাবত মানুষটা কি এতই কালো

যে তাঁর বাকি গুণগুলোকেও সেই কালি ভেদ করে দেখা যায় না! কোকিলকণ্ঠীর কণ্ঠের চেয়েও তাঁর কালো রংটাই বেশি গুরুত্ব কেন পায়? গান শুনেও কি একবারও ভালোবাসতে ইচ্ছে করে না মানুষটাকে!

– "জানি না তোমার এ কি অকরুণ খেলা,
তব প্রেমে কেন মিশে রয় অবহেলা
পাওয়ার বাহিরে চলে গিয়ে কেন আমারে কাঁদাতে চাও।
বারে বারে শুধু আঘাত করিয়া যাও...!"

অবহেলা, কান্না আর আঘাত, এই তিনটে নিজের জীবনে অনেক দেখেছে ও। অবহেলার চূড়ান্ত প্রকাশ কতটা জঘন্য এবং তার ফলাফল কী হতে পারে তা তার মতো ভালো কেউ জানে না! এক কৃষ্ণবর্ণা নারী নিজের পরাজয়ের ইতিহাস রক্তাক্ষরে লিখে গিয়েছে তার সামনেই। একটু একটু করে সে চলে গিয়েছিল মৃত্যুর খুব কাছে। মেয়েটা শুধু দেখেছে! অসহায়ের মতো নিজের সবচেয়ে বড় অবলম্বনকে ধুঁকতে ধুঁকতে মরতে দেখেছে সে। কিচ্ছু করতে পারেনি! কিচ্ছু না!...

ভাবতে ভাবতেই তার হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে ওঠে। লোকটা কীভাবে মেরে ফেলল একটা আস্ত মানুষকে! এর চেয়ে তো গর্দান নিলেই ভালো হত! বড়জোর কয়েক সেকেন্ডের জন্য ধড়ফড় করত, কষ্ট পেত। কিন্তু এইভাবে চরম অবহেলায়, আঘাতে আঘাতে একটু একটু করে যে মৃত্যু দেওয়া হয়— তার চেয়ে কঠিন শাস্তি আর কিছু নেই। সে চোখ গোল গোল করে সবিস্ময়ে দেখত মাকে এক ধাক্কা মেরে ঘর থেকে বের করে দিল লোকটা। সেই ধাক্কা সামলাতে না পেরে মা পড়ে গিয়েছে! কপাল থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত চুইয়ে পড়ছে নাকের ওপর। নাকের ডগায় ঝলমলে চুনীর নাকছাবির মতো রক্তবিন্দু। সে দু হাত বাড়িয়ে দৌড়ে যেত তাঁর কাছে, "মা...!"

"কিছু হয়নি।" মা অপ্রস্তুত হয়ে সব যন্ত্রণা মুহূর্তের মধ্যে ঢেকে ফেলেন। তাড়াতাড়ি তাকে গভীর স্নেহে, মমতায় বুকে টেনে নিয়েছেন। - "আমি আর বাবা খেলা করছি। যেমন তুমি আর তোমার বন্ধুরা তিনি, খেলা করো, তেমন আমরাও খেলছি।" -

ছোট্ট মেয়েটার বিশ্বাস হয় না। তারা যখন খেলা করে তখন পড়ে। গেলেও কারোর মাথা ফাটে না। তাছাড়া বেডরুমের ভেতর থেকে কীরকম অদ্ভুত আওয়াজ আসছে! বেডরুমে কে আছে? কে ভেতরে?

সে মায়ের বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দৌড়ল বেডরুমের দিকে। দরজাটা ভেজানো ছিল। ধাক্কা মারতেই...!

- "মা...! কী করছিস! ওদিকে যাস না!" তার মা কঁকিয়ে উঠলেন, - "দাঁড়া...!"

কিন্তু ততক্ষণে যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে। নিষিদ্ধ দরজায় দাঁড়িয়ে নিষ্পাপ শৈশব! বিস্ফারিত দৃষ্টিতে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করছে। বাবা অন্য একটা মেয়েকে বিছানায় নিয়ে খেলা করছে কেন? এইমাত্র মায়ের সঙ্গে খেলছিল না? মাকে মারল! আর এই মেয়েটাকে কী করছে! এই মেয়েটাই বা কে! লোকটা তার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে গর্জে উঠল, "হোয়াট? এখানে কী চাই?"

সে ধমক খেয়ে একটু কেঁপে উঠল। কিন্তু বাচ্চাটা কিছু করার আগেই মা শশব্যস্তে কোলে তুলে নিয়েছেন তাকে। অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে একরকম দৌড়েই চলে গেলেন সেখান থেকে! তাঁর অপমানে, যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যাওয়া মুখটা আজও মনে পড়ে...।

তখন সে কিছু বুঝতে পারেনি। কিন্তু এখন? তার মায়ের অবহেলিত, অপমানিত দিনগুলো যতবার মনে পড়ে ততবার যেন ধমনীর মধ্যে রক্ত টগবগিয়ে ফুটতে থাকে। কত রাত যে অভুক্ত থেকেছেন মা তার খবর কেউ রাখত না। ধূম জ্বর গায়ে নিয়ে নিত্যনৈমিত্তিক কাজ মুখ বুজে করে গিয়েছেন। আসলে মা তো ঐ নোংরা মেয়েটার আসার সঙ্গে সঙ্গেই মরে গিয়েছিলেন! দেহটাই শুধু বাকি ছিল। অনাহারে, অসুখে-বিসুখে ক্রমশ জীর্ণ থেকে জীর্ণতর হয়ে চলেছিলেন। তাঁর ফ্যাকাশে ঠোঁট, ভি চোখ রক্তশূন্যতায় কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছিল। ঠিক যেন ব্ল্যাকবোর্ডে আঁকা কোনও ছবিকে একটু একটু করে মুছে দিচ্ছে একটা হাত। মা ক্ষীণতর হতে হতে কঙ্কালসার হয়ে গিয়েছিলেন। তার ভয় হত, হয়তো কোনওদিন মিলিয়েই যাবেন তিনি! সেই ভয়ে রাতে মাকে দুহাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে ঘুমোত সে। ভয় পেত, চোখ খুললেই যদি দেখে মানুষটা নেই। অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে!

শেষ পর্যন্ত তার ভয়টাই সত্যি হল! মা একদিন সত্যিই মিলিয়ে গেলেন। সে চোখের সামনে তাঁকে একটু একটু করে সম্পূর্ণ রক্তশূন্য হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে দেখেছিল। একটা মানুষের অবহেলাই শেষ করে দিল সবকিছু...!"

অবহেলা!... অবহেলা!... মেয়েটার গোটা মস্তিষ্কে শব্দটা ছোট ছোট আলপিনের মতো ফুটেই চলেছে। সে নিজে অবহেলা বরদাস্ত করতে পারে না! তার আফ্রোদিতির মতো অপূর্ব মুখশ্রী মেডুসার মতো ক্রূর হয়ে ওঠে। চোখদুটোয় বাঘিনীর দৃষ্টি। অবহেলা নয়! কেউ তাকে অবহেলা করতে পারবে না! কেউ না! করুণা, অবহেলা— কোনটাই না! কোনও পুরুষের সাধ্য নেই তাকে প্রত্যাখ্যান করে! নীরব উদাসীনতায় তাকে অবজ্ঞা করার ক্ষমতা সে কাউকে দেবে না! কখনও না!

তার চোখের খরদৃষ্টি কী মনে পড়তেই আস্তে আস্তে ফের কোমল হয়ে আসে। হঠাৎ মনে পড়ে যায় সেই গাঢ় চন্দন রঙের মুখ ! নিমীলিত চোখের দীর্ঘ অক্ষিপল্লব। সারা মুখে ঘাম অভ্রের মত চিকচিক করছিল। ঘামে ভেজা অবাধ্য চুলগুলো কপাল ছুঁয়ে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে ছিল। কী ধারালো মুখের আদল! সেই মুহূর্তটা কী অদ্ভুত! সারাজীবনে হয়তো আর কখনও ঐ মুহূর্তটা আর ফেরত পাওয়া যাবে না! ঐ সময়টুকু শুধু লোকটা একান্তভাবে তারই ছিল। সে নীচু হয়ে ঘাম, পারফিউম আর সিগারেটের সম্মিলিত পুরুষালি গন্ধটা বুক ভরে নিয়েছিল। উত্তপ্ত কপালে আঙুল বুলিয়ে সিক্ত কুন্তলচূর্ণ সরিয়ে দিতে দিতে মনে মনে ভেবেছিল, "সারাজীবন চুলোয় যাক। যতক্ষণ না তোমার সাঙ্গোপাঙ্গ এসে পৌঁছচ্ছে, ততক্ষণ তুমি আমার! এই যে শ্বাস নিচ্ছ এটা আমারই দেওয়া! এই অক্সিজেনটা কে দিয়েছে সেটাও তোমাকে জানতেই হবে। যতদিন শ্বাস নেবে, ততদিন তোমার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে সর্বনাশিনীও থাকবে। আমায় অবহেলা করার সাধ্য তোমার নেই।"

ভাবতে ভাবতেই কৌতুকময়ী মৃদু হাসল। ঝকঝক করে উঠল তার দাঁত। লোকটা যখন লাভ বাইটটা দেখবে তখন ওর মুখটা ঠিক কেমন হতে পারে! কী মজা! ভারি মজার ব্যাপার! ভীষণ কৌতুকে সে সজোরে হেসে ওঠে। হাসতে হাসতেই বালিশে মুখ গুঁজে ফেলল। থরথর করে কেঁপে উঠল তার শঙ্খের মতো সাদা পিঠ।

দুরন্ত হাসিতে? না অদম্য কান্নায় ! মান্না দে গেয়েই চললেন—

“আসে আর যায় কত চৈতালি বেলা,

এ জীবনে শুধু মালা গেঁথে ছিঁড়ে ফেলা।

কোন সে বিরহী কাঁদে মোর বুকে, তুমি কি শুনিতে পাও?

বারে বারে শুধু আঘাত...!”

(চব্বিশ)

- "অতঃপর অপরাধী ধরা পড়িল। নাম অ্যামাটক্সিন এক্স। এক্স স্ট্যান্ডস্ ফর এক্সট্রিম! গ্যালেরিনা, অ্যামানিটা মাসকারিয়া আর অ্যামানিটা ফ্যালয়েডের ডেডলি কম্বিনেশন।"

ডঃ অসীম চ্যাটার্জী গ্রাম্ভরি হেসে বললেন, "রাজা রানিকে মাত দিয়ে দিয়েছে। এই গেমটা এবার আমাদের দিকে ঘুরল।"

অর্ণব হাঁ করে তাকিয়েছিল তার দিকে। কী সব ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর নাম বলে যাচ্ছেন ভদ্রলোক! বলাই বাহুল্য, সবই মাথার ওপর দিয়ে যাচ্ছে! অ্যামানিটা... ! কী যেন !

– "এগুলো কোনও সুন্দরী মহিলার নাম নয়!" ডঃ চ্যাটার্জী কটমটিয়ে অর্ণবের দিকে তাকালেন, "তিনটেই ভয়ঙ্কর ডেডলি মাশরুমের নাম। আসল বিষটার নাম অ্যামাটক্সিন। এই তিনটে মাশরুম থেকেই আলাদা আলাদা অ্যামাটক্সিন পাওয়া যায়। কিন্তু এই তিনটের কম্বিনেশন হচ্ছে সবচেয়ে মারাত্মক। অ্যামাটক্সিন এক্স বা এক্সট্রিম। এর কোনও অ্যান্টিডোট এখনও আবিষ্কার হয়নি। রিসার্চ চলছে। শুধু অ্যামাটক্সিন খাওয়ালে তবু বাঁচার উপায় আছে। কিন্তু অ্যামাটক্সিন এক্স একদম শেষ করেই ছাড়বে। লোকগুলোকে যদি জীবন্ত পাওয়াও যেত, কারোর সাধ্য ছিল না তাদের বাঁচায়! অ্যামাটক্সিন এক্সের মাত্র জিরো পয়েন্ট ওয়ান মিলিগ্রামই একটা লোককে ফৌত করার জন্য যথেষ্ট।"

অর্ণব বিমূঢ়ের মতো তাঁর দিকে তাকিয়েছিল— "তবে ফরেনসিক এক্সপার্টরা অন্য বডিগুলোয় বিষটা পেলেন না কেন?"

"এই প্রশ্নটাই হচ্ছে আসল, হোয়াই?" ডঃ চ্যাটার্জী টাকে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, "এক্সপার্টদের দোষ নেই। কারণ অ্যামাটক্সিন এক্স বিষটাই পিকিউলিয়ার। এর প্রয়োগের মাত্র ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সমস্ত বডি পার্টস থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। বিষটা খাওয়ার কয়েক ঘণ্টা পরেই ব্লাড, সিরাম, ফ্লুইড, স্টমাক, লিভার, কিডনি, তন্ন তন্ন করে খুঁজলেও কোনও ট্রেস পাওয়া যাবে না। একদম ভ্যানিশ, পুফ্!"

"সে কী! তবে আপনি পেলেন কী করে?"

“পেতে অনেক পাঁপড় বেলতে হয়েছে। রাজা যখনই ‘হোয়াই' প্রশ্নটা করল, তখনই সন্দেহ হয়েছিল। তারপর তাড়াহুড়ো করে লাশের ব্লাডারে যেটুকু ইউরিন তখনও ছিল সেটাকেই পরীক্ষা করেছি। সবটা তোমার মাথায় ঢুকবে না। তবু যতটা সম্ভব সহজ করে বলছি।” তিনি খুব সিরিয়াস মুখ করে বললেন, “যে বিষ এরকম মারাত্মকভাবে অস্তিত্বহীন হয়ে যায়, তারও একটা উইক পয়েন্ট আছে। সাধারণ অ্যামাটক্সিন মোটামুটি বিষপ্রয়োগের পর ঘন্টা খানেকের মধ্যেই সব জায়গা থেকে হাওয়া হলেও একটা জায়গায় ট্রেস রাখে। ওনলি ইউরিন! ইউরিনে মোটামুটি সত্তর থেকে নব্বই ঘন্টা অবধি থাকে, তারপর আর পাওয়া যায় না। অ্যামাটক্সিন এক্স আবার অতিরিক্ত শক্তিশালী বলে সব জায়গা থেকে মিলিয়ে গেলেও মানুষের মৃত্যুর পরও ছিয়ানব্বই ঘন্টা পর্যন্ত তার ব্লাডারের মধ্যে জমা ইউরিনে থাকে। তারপর আর পাওয়া যায় না। রাজা সেই প্রশ্নটাই ডেলিরিয়ামের মধ্যেই বারবার করছিল। কেন ছিয়ানব্বই বা একশো কুড়ি ঘণ্টা পরে লাশ পাওয়া গেল? কেন মরে গেলেও লাশটাকে রাতের অন্ধকারে ফেলে দেওয়ার বদলে ফ্রিজারে রাখতে হল? এর একটাই উত্তর। মার্ডার ওয়েপন্‌টা এমনই যেটা মৃত্যুর ছিয়ানব্বই ঘন্টা পরে নিজে থেকেই হাপিশ হয়ে যায়। তাকে আর ট্রেস করা যায় না। ফরেনসিক পুরো কনফিউজড। ধরতেই পারবে না লোকটা কী করে মরল। এরকম অবস্থায় ন্যাচারাল ডেথের সার্টিফিকেট লিখতে বাধ্য!” ডঃ চ্যাটার্জী বললেন, “বরাতজোরে এবার লাশটা আগেই ডাম্প করেছে বলেই। বিষটাকে ধরতে পেরেছি, নয়তো কিস্যু করার ছিল না। আর চব্বিশ ঘণ্টা পরে ফেললে আমি কেন, আমার বাপ-ঠাকুর্দা-চোদ্দগুষ্টি এসে ফরেনসিক সায়েন্সের মা-মাসি ঘেঁটে এক করে ফেললেও বিষটাকে উদ্ধার করতে পারত না! আমাদের কপাল, রাজার গুগলিটা ঠিক জায়গায় লেগেছে।”

'কপাল' শব্দটা শুনেই অর্ণব ডঃ চ্যাটার্জীর টাকের দিকে তাকিয়েছে। ভদ্রলোক সেটা লক্ষ্য করেই চিড়বিড়িয়ে উঠলেন— “খবর্দার, নিজের বসকে নকল করবে না। সবাইকে সব কিছু মানায় না।”

-“ওকে। সরি।” সে ঝাড় খেয়ে দুঃখিত মুখ করেছে– “কিন্তু প্রথম দু’বার খুনটা অনেক দেরিতে হয়েছিল। এবার এত তাড়াতাড়ি হল কেন?”

– "অ্যামাটক্সিনের ডোসেজের জন্য।" ডঃ চ্যাটার্জী বললেন, "এটা সায়ানাইডের মতো পুরো এক ছোবলেই ছবি করে না। একটু একটু করে মারে। জেনারেল অ্যামাটক্সিনের মতোই অ্যামাটক্সিন এক্সের সিম্পটমগুলোও প্রথমেই বোঝা যায় না। বিষ দেওয়ার মাত্রার ওপর নির্ভর করে সিম্পটমগুলো কখন থেকে দেখা দেবে। অ্যামাটক্সিন এক্স কাজ করতে সাধারণত মিনিমাম ছয় ঘণ্টা থেকে ম্যাক্সিমাম চব্বিশ ঘণ্টার মতো সময় নেয়। ঐ সময়টা যাকে বিষ দেওয়া হয়, সে ফিট থাকে। কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সময়ের পরই তার অ্যাকিউট ডায়রিয়া হতে বাধ্য। ভমিটিং, হাই ফিভার, ডি-হাইড্রেশন, স্টমাক আপসেট, সিভিয়ার স্টমাক পেইন এমনকি ডেলিরিয়ামও হতে পারে। কিন্তু মজার কথা হল, অ্যামাটক্সিন এক্স এমনই বিষ যেটা খুব কম মাত্রায় দিলে ভিকটিমকে টোট্যাল তিনটে ফেজে মারে। ফার্স্ট ফেজে অ্যাকিউট ডায়েরিয়ার মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে অ্যাটাক করার পর বিষটা সাময়িক বিরতি দেয়। স্ট্রং ওষুধ খেলে কয়েক ঘন্টার জন্য ভিকটিম সামান্য সুস্থ হয়। ডায়রিয়াও সাময়িক কমে। এটা সেকেন্ড ফেজ। কিন্তু বিষটা ভেতরে ভেতরে লিভার এনজাইমগুলোকে ক্রমশ বাড়াতে থাকে আর লিভারটাকে ড্যামেজ করে দেয়। ফলস্বরূপ কয়েক ঘণ্টা পরে ফের মার মার কাট কাট। এটাই তার ফাইনাল অ্যাটাক। এবং এই অ্যাটাকেরই শেষ পরিণতি অ্যাকিউট হেপাটিক অ্যান্ড রেনাল ফেইলিওর। এই তিনটে স্টেজে কাউকে মারতে হলে প্রসেসটা লম্বাই হবে। ভিকটিম পাঁচ থেকে আট-দশদিন অবধি বাঁচতে পারে। সম্ভবত সর্বনাশিনী যেদিনই আর.আই.পি পোস্ট দিয়েছিল সেদিন, কিংবা তার আগের দিনই শিকারকে অ্যামাটক্সিন-এক্স দিয়ে দিয়েছিল। সে জানত এই মৃত্যু ঠেকানোর সাধ্য স্বয়ং

ঈশ্বরেরও নেই। সেজন্যই অত কনফিডেন্ট। কিন্তু সঞ্জীব রায়চৌধুরী আর অর্জুন শিকদারের ক্ষেত্রে ডোসেজ সম্ভবত অনেক কম ছিল। যার জন্য লোকদুটো অতদিন বেঁচে ছিল। ডঃ বিজয় জয়সওয়ালের ক্ষেত্রে সে আরও নিষ্ঠুর। যেখানে জিরো পয়েন্ট ওয়ান এম.জিই প্রাণঘাতী, সেখানে প্রায় আড়াই থেকে তিন মিলিগ্রাম বিষ দিয়ে দিয়েছে। লোকটাকে মারার খুব তাড়া ছিল দেখছি। ডঃ জয়সওয়াল খুব বেশি হলে চব্বিশ ঘণ্টা বেঁচেছিলেন। ইনফ্যাক্ট তার থেকে কম হলেও আশ্চর্য হব না।"

-"আচ্ছা...!" অর্ণব জানতে চায়— "অ্যামাটক্সিন নামের বিষটা যদি কিছুক্ষণের জন্য ভিকটিমকে সুস্থ করে দেয়, তবে দু'জন ভিকটিম ঐ ফাঁকেই হসপিটালাইজ্‌ড হলেন না কেন?"

"জীবনে কখনও অ্যাকিউট ডায়রিয়া নামক বস্তুটির পাল্লায় - পড়েছ?"

ডঃ চ্যাটার্জীর কটমটে প্রশ্নে ঘাবড়ে গেল অর্ণব – "না তো!"

"পড়লে বুঝতে অন্তত চল্লিশ থেকে পঞ্চাশবার বমি করে আর তার থেকেও বেশিবার টয়লেটে দৌড়নোর পর পেশেন্টের কী অবস্থা হয়! ইনফ্যাক্ট, অনেকে ঐ ফার্স্ট ফেজটাই নিতে পারে না। হার্টফেল করে মরে যায়। এই বিষটা ভিকটিমকে বাঁচিয়ে রাখে ঠিকই, তবে তার উঠে দাঁড়ানোর মতো ক্ষমতা রাখে না। পেশেন্ট সেন্সলেস হয়ে যেতে পারে, ডেলিরিয়াম হতে পারে। যার উঠে বসার ক্ষমতাই নেই সে হসপিটালে যাবে কী! যেতে পারত, যদি সঙ্গিনী নিয়ে যেত। কিন্তু সে তো পাবলিকটাকে মারার জন্যই এনেছে। বেচারি যখন রিসর্টে বন্দী অবস্থায় তিলে তিলে পচে মরছিল তখন সে বসে বসে স্রেফ মজা দেখেছে এবং শেষপর্যন্ত দুই ভিকটিমই মরেছে। তাদের পাকস্থলীতে খাবার থাকার চান্সই নেই। কারণ বিষ দেওয়ার পর হয়তো তারা আর কিছুই খাওয়ার মতো অবস্থায় ছিলেন না। ডেথটা স্লো, কিন্তু ভয়ঙ্কর পেইনফুল।"

অর্ণবের গায়ের রক্ত হিম হয়ে যায়। কী ভয়ঙ্কর! চোখের সামনে একটা লোক বিষের প্রভাবে বিনা চিকিৎসায় তিলতিল করে মরছে, খাবি খাচ্ছে; অথচ তার চিকিৎসা করা দূর — কেউ বসে বসে তাদের মৃত্যুর লাইভ শো দেখেছে। কতখানি নিষ্ঠুর হলে এটা সম্ভব! 'সর্বনাশিনী' নাম সত্যিই সার্থক। -"তবে বিজয় জয়সওয়ালকে মারার বিশেষ তাড়া ছিল তার। কোনওরকম রিস্কই নেয়নি।" ডঃ চ্যাটার্জী বললেন, "সে জানত, পুলিস তার প্রোফাইলের ওপর নজর রাখছে। রীতিমতো অ্যালার্ট হয়ে গেছে। তারা। তা সত্ত্বেও কী সাহস! বিজয় জয়সওয়ালের আর.আই.পি পোস্টটা করতে হাত কাঁপল না। এবং সে এটা আগে থেকেই জানত যে বিজয় জয়সওয়াল বললেই তোমরা আগেই নিশান জুয়েলার্সের মালিকের কাছেই যাবে! এবং যদি সে লোকটা মিসিং হয় তবে সব ছেড়েছুড়ে তাঁকে খুঁজতেই দৌড়বে তোমরা। এটাই তার মাস্টারস্ট্রোক। সে প্রথমে জুয়েলার বিজয়

জয়সওয়ালকে সরিয়ে দিল, যাতে দ্বিতীয় কোনও সম্ভাবনা তোমাদের মাথাতেই না আসে। তাঁকে কিছুক্ষণের মধ্যে ছেড়েও দিল যাতে তোমরা তাঁকে নিয়েই ব্যস্ত থাকো। অনেকটা বাচ্চাছেলের হাতে ল্যাবেঞ্চুস দিয়ে ভুলিয়ে রাখার মতো আর কী। যখন তোমরা জুয়েলার বিজয় জয়সওয়ালকে নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে দৌড়ে বেড়াচ্ছ, ততক্ষণে আসল টার্গেট খতম। সর্বনাশিনীর রাস্তা ক্লিয়ার। এই চালটা খুব সাবধানে খেলেছে। আমি খুব আশ্চর্য হব না, যদি সর্বনাশিনীর আসল টার্গেট ডঃ বিজয় জয়সওয়ালই হয়ে থাকেন। আগের দুটো জাস্ট ট্রায়াল। কারণ ডঃ জয়সওয়ালকে মারার জন্য সে একটা ফলস্ দান দিয়েছে তোমাদের বিভ্রান্ত করার জন্য। এটা তাৎক্ষণিক বুদ্ধি হতেই পারে না। ফট করে ঐ একই নামের লোককে বের করে হাপিশ করে দেওয়া, এটা মাত্র কয়েকদিনের প্ল্যানে সম্ভব নয়। রীতিমতো ওয়েল-প্ল্যানড্! এই গেমপ্ল্যানটা সে অনেকদিন ধরেই বসে বসে বানিয়েছে। প্রত্যেকটা স্টেপ দেখো। অনেক ভেবে-চিন্তে নেওয়া। আর বিষটাও কী আমদানি করল সে? অ্যামাটক্সিন এক্স! যার কোনও অ্যান্টিডোটই নেই! তাছাড়া বিষটাও আনকমন। কতগুলো মাশরুম থেকে বের করা একটা পয়জন! সাইলেন্ট কিলারও বলতে পারো।”

অর্ণব একটু চিন্তিত হয়ে পড়ে। এই কেসের গতিপ্রকৃতি ঠিক কোন দিকে যাচ্ছে? ভিকটিমরা কেন হসপিটাল অবধি পৌঁছতে পারেনি, সেটা বুঝতে এখন আর অসুবিধে নেই। ভিকটিমরা প্রথমে স্টমাক আপসেট ভেবে ব্যাপারটাকে পাত্তা দেয়নি। তারা রিসর্টে প্রেম করতে গিয়েছে। সামান্য পেটের গোলমালেই রণে ভঙ্গ দেবে? কিন্তু যখন পাত্তা দিতে হল, তখন কিছু করার নেই! পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে গিয়েছে। বিষের প্রভাবে আর নড়াচড়ার ক্ষমতাও ছিল না। এমনিতেই রিসর্টের প্রাইভেসি ভীষণ ভাবে রক্ষা করা হয়। তার ওপর অফিসার পবিত্র আচার্য কিছুক্ষণ আগেই রিসর্টের প্রত্যেকটি কটেজে ফরেনসিকের টিম সহ সার্চ করেছে। কিছুই পায়নি ঠিকই, তবে বেশ কয়েকটা তথ্য সে জানিয়েছে। প্রথমত, এখানে বোর্ডারদের নামের কোনো রেকর্ড নেই। কোনোরকম রেজিস্টার বুক মেইনটেইন করা হয় না। তাই কে আসছে আর কে যাচ্ছে তা বোঝার উপায় নেই। দ্বিতীয়ত, কটেজগুলো সাউন্ডপ্রুফ। সিসিটিভিও নেই। অর্থাৎ বোর্ডারদের প্রেমালাপ কিছুই দেখা বা শোনা সম্ভব নয়। তার ওপর কটেজগুলো বেশ দূরে দূরে আছে।

একটাতে কী হচ্ছে বাকি কটেজের বোর্ডাররা জানতেও পারবে না। এমন জায়গায় যে খুন হবে, সেটাই স্বাভাবিক! হতভাগ্য মানুষগুলোর মরা ছাড়া দ্বিতীয় কোনও উপায় ছিল না।

—"শুধু তাই নয়, ডঃ বিজয় জয়সওয়ালের চামড়ায়ও আমি অ্যারোমা অয়েলের ট্রেসও পেয়েছি। যথারীতি, ল্যাভেন্ডার! অর্জুন শিকদারের স্কিন স্যাম্পলে এবং রাজার দেওয়া স্যাম্পলের অয়েলের সঙ্গে পারফেক্টলি ম্যাচ করছে। অর্থাৎ তিনটে স্যাম্পলের অয়েল একই!" ডঃ চ্যাটার্জী একটু ভেবে বললেন, "কেন জানি না অর্ণব, আমার মনে হচ্ছে খুনীর বোটানিস্ট হওয়ার পুরোপুরি সম্ভাবনা আছে। নয়তো অ্যামাটক্সিন এক্স সম্পর্কে সাধারণ মানুষের জানারই কথা নয়। এই বিশেষ মাশরুমগুলো সম্পর্কে আলাদা করে রিসার্চ না করলে অ্যামাটক্সিন সম্পর্কে কোনও ধারণাই হয় না। একজন বোটানিস্ট বা টক্সিকোলজিস্টের পক্ষেই কিন্তু অ্যামাটক্সিন-এক্সের মতো বিষের কথা জানা সম্ভব।"

অর্ণবের মাথায় একটাই নাম এল। মানসী জয়সওয়াল! এই কেসের একমাত্র স্কলার বোটানিস্ট।

- "আর হ্যাঁ, তোমাদের সন্দেহই ঠিক। জুয়েলার বিজয় জয়সওয়াল রিয়া বাজাজদের ফ্ল্যাটের পার্সোনাল স্টোররুমেই ছিলেন। পবিত্র ওদের ফ্ল্যাট থেকে যে পেইন্টের কনটেনার এনেছে তার ওপরে মিঃ জয়সওয়ালের জুতোর ছাপ আছে। ওকে ওখানেই রাখা হয়েছিল। তোমরা যখন সর্বনাশিনীর সঙ্গে 'খুঁজি খুঁজি নারি' খেলছিলে, তখন ভদ্রলোক ঠিক তাঁর অপোজিটের ফ্ল্যাটেই ছিলেন।" তিনি অর্ণবের মুখের দিকে তাকালেন, "একটা কথা বলব? কিছু মনে করবে না?"

"বলুন স্যার।"

আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন ডঃ চ্যাটার্জী, "তোমার কম্ম নয়! ইনফ্যাক্ট তোমাদের কারোরই কম্ম নয়। এ একেবারে জাত শয়তান। এরকম ঠান্ডা মাথার শয়তান ক্রিমিন্যালের জন্য তস্য ঠান্ডা মাথার শয়তান অফিসারই লাগবে। লোকিকে একমাত্র থরই হারাতে পেরেছিলেন। তেমনই সর্বনাশিনীর একটাই অ্যান্টিডোট, অধিরাজ ব্যানার্জী!" তিনি কথাটা শেষ করে চাপা স্বরে "হত ইতি গজ" জুড়লেন, "হয়তো বা দুর্বলতাও"। অর্ণব কথাটা শুনে আপনমনেই মাথা নাড়ল। কথাটা ভুল বলেননি ডঃ চ্যাটার্জী। এরকম তুখোড়

বদমায়েশের সঙ্গে এঁটে ওঠা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এই মুহূর্তে সে শুধু একটা কাজই করতে পারে। তদন্তকে যতটা সম্ভব এগিয়ে রাখতে পারে। আর যদি সত্যিই এর মধ্যে আরও একটা আর.আই.পি পোস্ট পড়ে...!

"স্যার।"

হাতে একটা ফাইল নিয়ে এস্তব্যস্ত হয়ে ঢুকল আহেলি মুখার্জী। ডঃ চ্যাটার্জী সাগ্রহে তাকালেন, "ইয়েস?"

- "দুই বিজয় জয়সওয়ালের গাড়ি অনেক খোঁজার পর কিছু এভিডেন্স পাওয়া গিয়েছে।" আহেলি তার স্বভাবমতই এক নিঃশ্বাসে বলতে থাকে, —"ড্রাইভিং সিটে একটা ছোট হেয়ার স্যাম্পল আছে। চুলটা মেরিলিন প্ল্যাটিনামের গেটকীপার গগনের। গাড়িগুলোকে ঠিকানা সেই লাগিয়েছে।

আর কার-এক্সপার্টরা বলছেন যে গাড়িদুটোর সামনের পোর্শন আর মাডগার্ড এমনি তুবড়ে যায়নি। ডেলিবারেটলি হাতুড়ি বা ঐ জাতীয় কিছু দিয়েই তোবড়ানো হয়েছে। এছাড়া...!"

– "তুমি কি ব্রিদলেস গাইছ মিস্ শঙ্কর মহাদেবন?" ডঃ চ্যাটার্জী অধৈর্য হয়ে বললেন, "নাকি ট্রেন ধরার তাড়া আছে?"

ডঃ চ্যাটার্জীর কথা শুনে আহেলি চুপ করে যায়। উঃ, এই বুড়োর সামনে কিছু বলাই দায়। তড়বড়িয়ে কথা বলাই তার স্বভাব। কিন্তু এই লোকটা সবসময়ই কিছু না কিছু উৎপটাং মন্তব্য করে বসে থাকবেই।

"আবার থেমে গেলে কেন!" ফরেনসিক এক্সপার্ট আরও বিরক্ত, "পজ দিতে বলেছি নাকি? শুধু একটু স্লো মোশনে যেতে বলেছি। তুমি তো স্টপই মেরে ফেললে!"

আহেলি অতিকষ্টে নিজের মেজাজ নিয়ন্ত্রণে আনে, "ব্যাকসিটে একটা লিপস্টিকের ছাপ পাওয়া গিয়েছে। খুব হাল্কা রঙের লিপস্টিক। অফিসার ব্যানার্জী ঠিকই বলেছিলেন। মেয়েটি অত্যন্ত ফর্সা!"

ডঃ চ্যাটার্জীর চোখ দুটো চড়াৎ করে তাঁর টাকে চড়ে গেল! কিছুক্ষণ চোখ পিটপিটিয়ে বললেন, "একটা লিপস্টিকের দাগ দেখেই কমপ্লেক্সন ধরে ফেললে খুকি! বাপ রে!"

— "স্যার। হসপিটালের ডক্টর বলেছিলেন অফিসার ব্যানার্জীর ঠোঁটে স্ট্রবেরি লিপবাম পাওয়া গিয়েছে। স্ট্রবেরি লিপবাম কোনও গাঢ় কমপ্লেক্সনের মেয়ে ইউজ করে না...!"

- "এক মিনিট... এক মিনিট...।" ফের আহেলির চেন টেনে ধরলেন ডঃ চ্যাটার্জী। চোখ গোলগোল করে বলেন, "তোমায় কে বলল যে রাজার ঠোঁটে স্ট্রবেরি লিপবাম্ ছিল? যখন সার্জেন এই কথাগুলো বলছিলেন তখন তুমি ওখানে ছিলেই না! তবে?"

আহেলি ঠোঁট কামড়ে নিরুত্তর রইল। অর্ণব তাকিয়ে দেখল তার দু • চোখে ঘন মেঘ নেমে এসেছে। সে মনে মনে প্রমাদ গুনল। সর্বনাশ! কেস কি এখানেও জন্ডিস?

- "ই-উ! পিপিং টম! তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে শুনেছ!" আহেলি একটু চুপ করে থেমে থেকে বলল- "লেডি অফিসাররা বলাবলি করছিল। আমি ওখান থেকেই শুনেছি। তার ওপর আপনিও অফিসার আচার্য'র সঙ্গে ওভারফোনে কথা বলছিলেন...!" ডঃ চ্যাটার্জীর মনে পড়ল তিনি যখন পবিত্রকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে সে বা কোনও লেডি অফিসার অধিরাজকে সি.পি.আর দিয়েছিল কি না, তখনই স্ট্রবেরি লিপবামের কথা উঠেছিল। সম্ভবত সেখান থেকেই খবরটা ফাঁস হয়ে গিয়েছে। লেডি অফিসারদের প্রায় সকলেরই অল্পবিস্তর অধিরাজের প্রতি ব্যথা আছে। অনেকেরই হার্টথ্রব! ফলে লিপবামের কেচ্ছাটা বেশি রসালো হয়েছে। তার ওপর আহেলির আবার আড়ি পেতে কথা শোনার অভ্যাস! তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, "আই উইদড্র! ফুলের সংখ্যা দুই নয়— অজস্র! মালিকে ঈশ্বর রক্ষা করুন।"

"মিস্ মুখার্জী যেন কী বলছিলেন!" - বেগতিক দেখে অর্ণব প্রসঙ্গটাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেয় – "লিপস্টিকের কথা বলছিলেন না?"

"হ্যাঁ।" এবার আহেলি একটু আস্তে আস্তে বলল— "একটা লিপস্টিকের দাগ পাওয়া গিয়েছে। এই দেখুন।"

সে লিপস্টিকের স্যাম্পলটা দেখায়। অর্ণব আর ডঃ চ্যাটার্জী, দুজনেই একসঙ্গে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন স্যাম্পলের ওপর। ফলস্বরূপ দুজনের মাথাই ঠুকে গেল!

—"ওঃ! গেছি... গেছি!" ডঃ চ্যাটার্জী লাফিয়ে উঠলেন, "কী টাইমিং! তোমাদের জ্বালায় আমায় এরপর থেকে হেলমেট পরে আসতে হবে। দেখছি! অলপ্পেয়ে ছোঁড়া। এখনই তোমায় মুণ্ডু বাড়াতে হল।"

- "সরি স্যার!" অর্ণবেরও মাথায় জোরদার লেগেছিল। সে চেপে যায়— "আপনি দেখুন।"

ডঃ চ্যাটার্জী ভয়ে ভয়ে খুব সামান্য ঝুঁকে দেখলেন। লিপস্টিকটা হাল্কা গোলাপি। অদ্ভুত হাল্কা রঙ! একটু ফ্যাকাশে গোলাপির শেড।

"এর থেকে প্রমাণিত হলটা কী?" তিনি বললেন— "লিপস্টিক যে কেউ মাখতে পারে।"

-"পারে না।" আহেলি আত্মবিশ্বাসী— "এটা একে ম্যাট লিপক্রিম, আর এর শেডটাকে বলে অ্যাপ্রিকট ব্লুম। মাসখানেক আগেই বাজারে এসেছিল স্যার। কিন্তু চূড়ান্ত ফ্লপ হয়েছে।" -

– "তাতে কী প্রমাণ হল লিপস্টিক এক্সপার্ট?" ডঃ চ্যাটার্জীর চোখ সরু হয়ে গিয়েছে, "মেয়েটি ফ্লপমাস্টার জেনারেল?"

আহেলি তাঁর বক্রোক্তিকে উড়িয়ে দেয়, "এই অ্যাপ্রিকট ব্লুম শেডটা ফ্লপ হওয়ার একটাই কারণ। এটা এতটাই ফ্যাকাশে, সাদাটে মার্কা যে ভারতীয়দের জেনারেল ট্যান্ড্ কমপ্লেক্সনে একদমই যায় না। কালো মেয়েদের ঠোঁটে মাখলে একদম জোকারের মতো লাগে। হুইটিশ কমপ্লেক্সনেও মানায় না। ঠোঁট সাদা মনে হয়। একমাত্র যারা ধবধবে সাদা, মানে, রীতিমতো গৌরবর্ণা তাদের গায়ের রঙের সঙ্গে চমৎকার মানায়। স্বাভাবিকভাবেই কোনও কৃষ্ণাঙ্গী এই লিপস্টিকটা লাগাবে না। অথচ এই লিপস্টিকটা সেদিন ঐ গাড়িতে যাঁরা ছিলেন তাদের মধ্যে কেউ মেখেছিলেন। গেটকীপার গগন নিশ্চয়ই লিপস্টিক লাগায় না! কিন্তু তার মালকিন লাগাতেই পারেন। আর যদি এই লিপস্টিকটি তিনি মেখে থাকেন তবে কোনও সন্দেহের অবকাশই নেই যে তিনি ফুটফুটে ফর্সা।"

ডঃ চ্যাটার্জী তার দিকে কিছুক্ষণ সরু দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললেন, "বুঝলাম। আর কিছু?"

- “না... কিন্তু...!” আহেলি একটু ইতস্ততঃ করে বলল, “আপনি রাতে হসপিটালে ফোন করেছিলেন স্যার? অফিসার কেমন আছেন...?”, তিনি প্রায় খ্যাকখ্যাক করে উঠলেন “লিঙ্ক নেই— লাঞ্চের পরে এসো। ইস রুট কি সারি লাইন ভেয়াস্ত হ্যায়...!”

আহেলি প্রায় দৌড়েই পালিয়ে গেল। -

(পঁচিশ)

সাত দিন! অর্থাৎ একশো আটষট্টি ঘণ্টা! কীভাবে যে কেটে গেল তা ঠিক করে বুঝে ওঠাই গেল না। প্রচণ্ড ব্যস্ততা, দৌড়োদৌড়ির মধ্যেই প্রায় উড়েই গেল সাত-সাতটা দিন!

এই একশো আটষট্টি ঘণ্টা ধরে দু'দিকে দু'রকম লড়াই চলছিল। একদিকে সর্বনাশিনীর পরিচয় বের করার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে সি.আই.ডি, হোমিসাইড। অর্ণবের নেতৃত্বে যতরকম এভিডেন্স সম্ভব জোগাড় করে রাখছে। সাইবার টিম দিনরাত সর্বনাশিনীর প্রোফাইলে চোখ রেখে বসে আছে। নতুন আর.আই.পি পোস্ট পড়ল কিনা তার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেছে। এ এক শ্বাসরুদ্ধকর প্রতীক্ষা। ব্যালিস্টিক রিপোর্ট এসেছে। তাতে বলা আছে, যে বন্দুকটি রিয়া বাজাজের হাতে ছিল, সেই বন্দুকের গুলিই বিদ্ধ করেছে গগন ও অধিরাজকে। রিয়াকে প্রাথমিকভাবে কাস্টডিতে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করলেও তার মানসিক অবস্থা দেখে আপাতত জামিনে ছাড়া হয়েছে। কিন্তু রেগুলার জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। সে এখনও নিজের বয়ানে অনড়, "সবাইকে আমিই খুন করেছি। কেন করেছি জানি না!" পবিত্র তার কাছে জানতে চায়, "আর.আই.পি পোস্টগুলো কি তুমিই দিয়েছিলে সর্বনাশিনীর প্রোফাইলে? ঐ প্রোফাইলটা কি তোমার?" রিয়া শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, "ওয়ান প্লাস ওয়ান, ইকোয়ালটু ওয়ান।"

মানসী জয়সওয়াল, জুয়েলার বিজয় জয়সওয়াল, অহল্যা, রাধিকা আর সুপর্না জয়সওয়ালকে রাউন্ডের পর রাউন্ড জেরা করে চলেছে সি.আই.ডি অফিসাররা। অহনা ভট্টাচার্য আর অ্যালিসকেও দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। ছাড়া পাননি অ্যাডেলিন বাজাজও। প্রত্যেকের ব্যাকগ্রাউন্ড হিস্ট্রি রীতিমতো খুঁড়ে খুঁড়ে বের করছে খবরিরা। যতরকমের খবর পাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গেই যোগান দিচ্ছে ইনফর্মার নেটওয়ার্ক। বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ খবরও সামনে এসেছে। যেমন গৌরব জয়সওয়ালের মৃত্যুর পেছনেও গোলমাল থাকা অসম্ভব নয়। তিনি যে চিকিৎসকের চিকিৎসাধীন ছিলেন, সেই ডাক্তার স্পষ্ট বললেন, "দেখুন, মিঃ গৌরব জয়সওয়ালের কেসটা আমাদেরও গোলমেলে

লেগেছিল। যখন ওঁকে হসপিটালে নিয়ে আসা হয়েছিল, ততক্ষণে সিরিয়াস অবস্থা হয়ে গিয়েছিল। আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলাম। ইনফ্যাক্ট মেডিসিন দেওয়ার পর উনি সামান্য সুস্থও হয়েছিলেন। কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টা পরেই অ্যাকিউট হেপাটিক আর রেনাল ফেইলিওরের ফলে আমাদের আর কিছু করার ছিল না!"

"আপনাদের সন্দেহ হয়নি?"

অর্ণবের প্রশ্নের উত্তরে তিনি একটু চুপ করে থেকে বললেন, "স্বয়ং বিজয় জয়সওয়াল একজন দক্ষ ডাক্তার ছিলেন। তিনি কোনও সন্দেহ প্রকাশ করেননি। অদ্ভুত লেগেছিল ঠিকই। গৌরবের অবস্থা যে এমনভাবে ডিটোরিয়েট করবে তা আমরা ভাবতেই পারিনি। কিন্তু অ্যামাটক্সিন এঙ্গের কথা মাথায় আসেনি। তাই ন্যাচারাল ডেথেরই সার্টিফিকেট দিয়েছি। এখন এই কেস হলে হয়তো দুবার ভাবব।"

অন্যদিকে অ্যাডেলিন বাজাজ ক্রমাগত হুমকি দিয়ে যাচ্ছেন। অর্ণবকে পারলে এক থাপ্পড়ই কষিয়ে দেন। অর্ণব কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকে শান্তভাবে বলল,"ম্যাডাম, আপনি মহিলা বলে ভাববেন না যে আপনার গায়ে হাত তোলা হবে না। আমাদের লেডি অফিসাররা একবার হাতা গুটিয়ে ফেললে ওদের থামানো কষ্টকর। প্লিজ কো-অপারেট করুন।" বিস্ময়ে, রাগে অ্যাডেলিনের চোখ যেন ফেটে বেরিয়ে আসে, "আপনি জানেন আমার হাত কতদূর"লম্বা?"

অর্ণব আফসোসসূচক ভঙ্গীতে মাথা নাড়তে নাড়তে লেডি অফিসারদের দিকে তাকায়, "উনি বুঝবেন না। এক কাজ করুন তো। প্রাইম মিনিস্টারকে ফোনে ধরুন। বলুন, এক লম্বা হাতওয়ালা মহিলা ওঁর সঙ্গে কথা বলবেন!"

অ্যাডেলিন বাম্বু খেয়ে চুপ করে গেলেন। তারপর থেকেই চুপচাপ কো-অপারেট করছেন। আর কোনও বেগড়বাঁই করেননি। তিনি জানালেন, ছোটবেলা থেকেই দাবা খেলার শখ। রীতিমতো প্রতিভাময়ী দাবাড়ু ছিলেন। ন্যাশনাল লেভেলে একাধিকবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। কিন্তু বিয়ের পর সব গোল্লায় গিয়েছে। মিঃ এ বাজাজের ফুল নেম

জিজ্ঞাসা করলে জানালেন, ‘আনন্দ বাজাজ।' অ্যান্ড্রু বাজাজের ছবি দেখাতেই একটু যেন সতর্ক হয়ে গেলেন। যদিও মুখে বললেন, “চিনি না।”

- “আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা?”

- “পিকিউলিয়ার কোয়েশ্চেন!” তিনি অবজ্ঞায় ঠোঁট ওলটালেন, “বি.এস.সি ইন কেমিস্ট্রি।”

“বিয়ের আগের সারনেম?”

—“ভেরি ফানি!” অ্যাডেলিনের উত্তর, “স্মিথ। অ্যাডেলিন স্মিথ।” ইতিমধ্যেই অবশ্য জানা গিয়েছে যে রাধিকা জয়সওয়াল সত্যিই একজন টক্সিকোলজিস্ট। রাধিকা জেরার মুখে স্বীকার করল যে অ্যামাটক্সিন এক্সের কথা জানে সে। ইনফ্যাক্ট বিষটা ওদের ল্যাবেও আছে। কিন্তু অ্যামাটক্সিন এক্সের প্রয়োগ করার বিষয়টা সম্পূর্ণ অস্বীকার করল। শিনা জয়সওয়াল অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ। অবশ্য মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভদের সর্বক্ষণই ছোটাছুটি করতে হয়। তাকে এখনও জিজ্ঞাসাবাদ করা যায়নি। কারণ কোম্পানির কাজে সে একটু কলকাতার বাইরে গিয়েছে। শিনাকে অবশ্য ফোনে ধরা হয়েছিল। সে খুবই বিনম্রভাবে জানিয়েছে কাজ সেরে এসেই ব্যুরোতে হাজিরা দেবে।

অবশ্য শিনা আর কত ব্যস্ত! সুপর্ণা জয়সওয়াল তার থেকেও ব্যস্ত! সকাল দশটার পর আর রাত দশটার আগে পাওয়াই যায় না তাকে। তবু যথাসম্ভব কো-অপারেট করেছে। সে স্বীকার করেছে, অধিরাজ সংক্রান্ত যে ফাইলটা রিয়া বাজাজের ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার করা হয়েছে, সেই খবরের অধিকাংশ খবরই তার লেখা। ইন্টারভিউটাও সেই নিয়েছে। তবে অধিরাজের তাকে চিনতে পারার কথা নয়। কারণ ইন্টারভিউটা ওভার টেলিফোন নিয়েছিল। বলতে বলতেই সুপর্ণা হেসে ফেলল, “উনি ভারি মজাদার মানুষ! আমি হাসতে হাসতে আরেকটু হলেই মরছিলাম!”

“মানে?” অর্ণব কৌতূহলী।

“আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম দু একটা পার্সোনাল প্রশ্ন করতে পারি কি না!” উনি বললেন, “টুথপেস্ট আর শ্যাম্পুর ব্র্যান্ডটা প্লিজ জানতে চাইবেন না। বাকি সব অ্যালাউড।” সুপর্ণা একটু থেমে জানতে চাইল, “মিঃ ব্যানার্জী এখন কেমন আছেন?

গুলি লেগেছে শুনলাম। সত্যি?" প্রশ্নটা মৃদু হেসে এড়িয়ে গেল অর্ণব, "আপনার বাবার মৃত্যু সম্পর্কে কিছু বলবেন?"

সুপর্ণা জয়সওয়াল একটু থেমে জবাব দেয়, "আমার কিছু বলার নেই। এরকম লোকেরা এভাবেই মরে। উনি আমার বাবা ছিলেন। কিন্তু সত্যি বলছি, তাঁর মৃত্যুর জন্য আমি দুঃখিত নই। বাবা আমাকে আর মাকে মানুষ বলেই গণ্য করতেন না। ইনফ্যাক্ট কেউই দুঃখিত নয়। যদি কেউ দুঃখপ্রকাশ করে সে স্রেফ নাটক করছে!"

এতখানি স্পষ্ট উত্তরের জন্য অর্ণব প্রস্তুত ছিল না। সে একটু হকচকিয়েই গেল। সুপর্ণা জয়সওয়াল কীরকম মেয়ে? নিজের বাবার খুনটাকে এভাবে নিল! সে আর কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই সুপর্ণা উঠে দাঁড়িয়েছে, "আপনার যদি কোয়েশ্চেনিং শেষ হয়ে থাকে, তবে আমি যেতে পারি? আমার অফিসে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে। যদি দরকার পড়ে তবে আবার ডাকবেন। আমি সময় মতো হাজিরা দেব।" অর্ণব নীরবে মাথা নাড়ল।

সুপর্ণার বিরুদ্ধে তাদের হাতে কোনও প্রমাণ নেই। তাকে জেরার নামে ব্যুরোতে আটকে রাখা যায় না। এরকম রূঢ় ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়ার জন্য দোষও দেওয়া যায় না। খবরিদের কাছ থেকে ডঃ বিজয় জয়সওয়ালের চরিত্রের যা বর্ণনা পাওয়া গিয়েছে, তাতে যে কোনও মেয়েই ক্ষুব্ধ হবে। খবরিরা জানিয়েছে ডঃ বিজয় জয়সওয়ালের সঙ্গে তাঁর বড় বৌমা রাধিকা'র যথেষ্টই ফষ্টিনষ্টি চলছিল। অহল্যা জয়সওয়াল সবই জানতেন। কিন্তু ভদ্রমহিলার ভয়ঙ্কর পার্সোনালিটি। তাঁর মনের কথা বোঝা দায়। শিনা জয়সওয়ালের সঙ্গে ছোটছেলে গৌতম জয়সওয়ালের দাম্পত্যের সম্পর্কও খুব সুবিধের নয়। স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে থাকলেই অশান্তি শুরু হয়। ফলস্বরূপ গৌতম শিনার থেকে দূরে দূরেই থাকে। শিনাও স্বামীকে নিয়ে বিশেষ চিন্তিত নয়। সে নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত। পেশাগত কারণে মাঝেমধ্যেই বাইরে ট্যুরে চলে যায়। কলকাতায় থাকলেও বেশিরভাগ সময়টাই বাইরে কাটায়।

জুয়েলার বিজয় জয়সওয়ালের এখন কিছু কথা ঝাপসা ঝাপসা মনে পড়ছে। যেদিন তিনি 'অ্যাবডাক্টেড' হন, সেদিন রাতে নিয়মমতো মেরিলিন প্ল্যাটিনামের গেটকীপার গগন তাঁকে ওয়াইন দিয়ে গিয়েছিল। গগন মাঝে-মধ্যে তাঁর একগ্লাসের সঙ্গী হত। দামি মদের লোভেই এক্সট্রা সার্ভিস দিত। বাড়ির অন্য চাকরদের বললে মানসী জানতে পারবেন। তাঁর

ভয়েই গগনের সঙ্গে সিক্রেট সেটিং বানিয়েছিলেন। সেদিনও গগন তাঁর সঙ্গেই মদ্যপান করেছিল। তারপর আর কিছুই মনে নেই । অর্ণব সব শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্বগতোক্তি করে, "বড় তাড়াতাড়িই মনে পড়ল!"

অহল্যা জয়সওয়াল আবার আরেক অবতার! তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই তিনি উত্তর দিয়ে বসে থাকেন! সন্দিগ্ধ যদি 'হা' বললেই হাওড়া বুঝে যায়, তবে মহাবিপদ। অহল্যাকে কোনওরকম প্রশ্ন করার আগেই তিনি বললেন, "আবারও বলছি, আমার স্বামী মদ্যপ বা লম্পট ছিলেন না।"

"কিন্তু তদন্তে তো...!"

প্রশ্নটা করার আগেই ফের উত্তর চলে এল, "আপনাদের তদন্ত যা বলছে সেটা আপনাদের ব্যাপার। আর আমি যা বলছি, সেটা আমার বিশ্বাস। কোনটা সত্যি তা আপনারা বুঝে নেবেন।"

কী জ্বালা! অর্ণব বিরক্ত হয়ে বলে, "আপনি কি জানতে চান না যে আপনার স্বামীর খুনী...!"

অহল্যার মুখে একটিও ভাজ পড়ল না, "জেনে কী করব? ওটা জানা আপনাদের ডিউটি।"

"কিন্তু কো-অপারেট তো করবেন?"

– "করছি তো!" তাঁর সপ্রতিভ উত্তর, "আমার জানার পরিধির মধ্যে প্রশ্ন রাখুন, অবশ্যই উত্তর দেব। কিন্তু যা আমি জানি না, তা বলব কী করে? আমি জ্যোতিষী নই।"

অর্ণব হালই ছেড়ে দেয়। এই ঝুনো নারকেলে দাঁত বসানোর উপায় নেই। বরং তাতে বত্রিশ পাটিই খুলে হাতে না চলে আসে!

মানসী জয়সওয়াল স্পষ্ট জানিয়েছেন নিজের উকিল ছাড়া তিনি একটি কথাও বলবেন না। অহনা ভট্টাচার্য অবশ্য অনেকটাই ফ্রেন্ডলি। ডঃ বিজয় জয়সওয়ালের সঙ্গে তাঁর কোনও লিঙ্ক নেই। কিন্তু একটি অদ্ভুত তথ্য পাওয়া গেল। মানসী জয়সওয়ালই এ কেসের একমাত্র বোটানিস্ট নন্। অহনাও একজন উদ্ভিদবিশারদ। তাঁর একটি নিজস্ব নার্সারিও আছে। এবং আরও ভয়ঙ্কর তথ্য যে তিনি মাশরুমের চাষও করেন! অ্যালিস

যথারীতি চিরন্তন স্নেহময়ী। রিয়ার ব্যাপারে অসম্ভব পজেসিভ। অবশ্য সেটাই স্বাভাবিক। ছোটবেলা থেকে বুকে করে মানুষ করেছে। সে বিশ্বাস করে না যে রিয়া অধিরাজকে গুলি করেছে। সাফ বলল, "রিয়াবেবি কিছু করেনি। ভুল সময়ে ভুল জায়গায় পৌঁছে যাওয়াটাই ওর স্বভাব। ব্যাডলাক।" অহনা প্রিয়া আর অহল্যা বাজাজের ছবি এনেছেন। অহল্যার ছবি দেখে পবিত্র ও অর্ণব 'থ'! অধিরাজ যা সন্দেহ করেছিল হুবহু তাই! অহল্যা বাজাজকে দেখলেই মনে আফ্রিকান কোনও সুন্দরী শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন! টিপিক্যাল নিগ্রোবটু টাইপের চেহারা। প্রিয়া ষোড়শী। কালো ফ্রক ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ফর্সা ফুটফুটে, রোগা লিকলিকে। দাঁত উঁচু। চোখেও । মোটা পাওয়ারের চশমা। এককথায় দেখতে মোটেই ভালো নয়। তার মাথার পেছনে 'ক্রিশ্চিয়ান বারিয়াল গ্রাউন্ড' এর নাম লেখা গেট উকি মারছে।

ইতিমধ্যে ফরেনসিকও কিছুটা অগ্রসর হয়েছে। ডঃ অসীম চ্যাটার্জী বিষটা ধরতে পারলেও সেটা কীসের মাধ্যমে দেওয়া হল সে বিষয়ে বেশ কিছুক্ষণ অন্ধকারেই ছিলেন। কিন্তু তাঁর অন্ধকারে থাকা কোনওদিনই পছন্দ নয়। লাশের বাইরে থেকে যখন কিছুই পাওয়া গেল না তখন হতাশ হয়ে বললেন,—"অ্যামাটক্সিন এক্স একমাত্র মুখের মাধ্যমেই যেতে পারে। এটা ইনহেল করানো যায় না কিংবা স্কিনের মাধ্যমেও যায় না। প্রয়োজন পড়লে এন্ডোস্কপি করতে হবে।"

- "আপনি হিকিজগুলো দেখেছেন?" অর্ণব বলে, "এমনও তো হতে পারে যে কেউ দাঁতের মাধ্যমে...।"

"হোয়াট!" ফরেনসিক এক্সপার্ট তাকে এই মারেন তো সেই মারেন, – "তোমার মাথা ঠিক আছে? এটা অ্যামাটক্সিন এক্স! টুথপেস্ট পেয়েছ নাকি যে দাঁতে মেখে কামড়ে দেবে? কামড়ানো তো পরের কথা। যে দাঁতে অ্যামাটক্সিন এক্স মাখবে সে ভিকটিমের আগেই টপকে যাবে! আজকাল ভুলভাল থ্রিলার বেশি পড়ছ নাকি! শেষপর্যন্ত কি না দাঁত...!" বলতে বলতেই থমকে গেলেন তিনি। অস্ফুটে বললেন, "তাই তো! দাঁত... দাঁত...!"

তারপরই বাস্কেটবলের মতো একখানা বাউন্স মেরে জাপ্টেই ধরলেন অর্ণবকে। কথা নেই বার্তা নেই, চকাস চকাস্ করে চুমু খেয়ে বললেন,

"জিনিয়াস অর্ণব...!"

সর্বনাশ! অর্ণব ভয়ের চোটে কাটা হয়ে গেল! বুড়োর হল কী! উত্তেজনার চোটে তাকেই না লাভ বাইট দিয়ে দেন!

ডঃ চ্যাটার্জী অবশ্য অত ভয়ঙ্কর কিছু করলেন না। উলটে হাঁক পেড়ে বললেন, "আহেলি। ওপেন হিজ মাউথ। আমি ডঃ জয়সওয়ালের দাঁত দেখতে চাই। তার জন্য যদি বত্রিশ পাটি ভাঙতেও হয় তাও আপত্তি নেই।" -

ফলাফল পাওয়া গেল একটু পরেই। ডঃ চ্যাটার্জী জানালেন, "কী করে বিষটা গিয়েছে জেনেছি। তুমি দাঁতের কথা না বললে ধরতেই পারতাম না। মানছি, খুনীর বুদ্ধি আছে! কী মাথাটাই না খেলিয়েছে। বাপ্ রে।"

"কী বেরোলো?" সে উৎকণ্ঠিত।

"ভদ্রলোকের দাঁতে জিঙ্ক কম্পাউন্ড আর অ্যান্টিমাইক্রোবায়াল এজেন্ট পাওয়া গিয়েছে। সেটিলফাইরিডাইনিয়াম ক্লোরাইড, মনোহাইড্রেট ইউ এস পি।" ডঃ চ্যাটার্জী হাসলেন, "মালটা খাবারের মধ্যে বিষ দেয়ইনি! দিয়েছে মাউথ ওয়াশের মধ্যে। এসব মাউথ ওয়াশ লোকে সেক্সের আগে নয়, পরে ব্যবহার করে। বেসিক্যালি শুতে যাওয়ার আগে।"

-"মানে!"

"মানে একটু শৌখিন লোকেদের অভ্যেস থাকে সেক্সের পর ব্রাশ করে মুখ ধোওয়ার। আর যারা মদ খায়, আফটার সেক্স তাদের মুখ একটু শুকিয়ে যায়। একেই চুমু টুমু খেয়েছে, তার ওপর অ্যালকোহল চিরকালই মুখ ড্রাই করতে ওস্তাদ। যখন ফাইনালি ঘুমোতে যাবে, তখন যাতে মুখ বা গলা শুকিয়ে না যায় সেজন্য মাউথওয়াশ ইউজ করে। তার মধ্যে জিঙ্ক কম্পাউন্ড থাকে। এ জাতীয় মাউথ ওয়াশ মুখকে ভেজা ভেজা রাখে। স্যালাইভা যাতে কন্টিনিউয়াস আসতে থাকে এবং ব্যাড ব্রিদ না হয় তার জন্যই এই ব্যবস্থা। এখানেও তাই হয়েছে। আফটার আ গুড সেক্স ডঃ বিজয় জয়সওয়াল মাউথ ওয়াশ ইউজ করেছিলেন। জিঙ্ক কম্পাউন্ড ছিল বলে স্যালাইভা এসেছে মুখকে ময়েশ্চারাইজ করার জন্য। এবং বিষ স্যালাইভার মাধ্যমেই মহানন্দে ওঁর পাকস্থলীতে চলে গিয়েছে। তারপর কী হয়েছে তা দেখতেই পাচ্ছ!" ডঃ চ্যাটার্জী দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, "পুরো

ঘোল খাইয়ে ছেড়েছে বেটি। আগের দুটো লাশ হাতের কাছে নেই। তবে নির্ঘাৎ দাঁতে এই জিনিসগুলোর ট্রেস পাওয়া যেত। কারণ লোকগুলো ব্রাশ করার পর সেই যে ঘুমিয়েছে, তার মধ্যেই অ্যামাটক্সিন-এক্স কাজ সেরে ফেলেছে। অন্তত বিজয় জয়সওয়াল তো আর কিছু খাওয়ার সুযোগই পাননি।”

– “কিন্তু মাউথ ওয়াশ তো কুলকুচি করে ফেলে দেওয়া হয়! গিলে তো নেয় না!ণ

—“গেলার দরকারই নেই। মাউথওয়াশ যতই কুলকুচি করে ফেলে দাও, কিছুটা মুখে, দাঁতে, জিভে লেগে থাকবেই। সেটা স্যালাইভার মাধ্যমে পেটে যাবে। ইনফ্যাক্ট টুথপেস্টের গল্পটাও তেমন। জল দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেললেও কিছুটা পেটে যায়। মাউথওয়াশের মাধ্যমে যতটুকু অ্যামাটক্সিন এক্স ওঁর পেটে গিয়েছে, তাই মেরে ফেলার জন্য যথেষ্ট।”

অর্ণব স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে। তাহলে আর যাই হোক, সর্বনাশিনীর লাভ বাইট বিষাক্ত নয়! সে অনুভব করল, বুকের মধ্যে উত্তেজনার পারদ খানিকটা চড়ল। ঘন কুয়াশার মধ্যেও তারা সর্বনাশিনীর দিকে আরও এক পা এগোল!

এদিকে সর্বনাশিনীকে নিয়ে সি.আই.ডি, হোমিসাইড লড়ছে। ওদিকে অধিরাজকে নিয়ে ডাক্তাররা ব্যতিব্যস্ত! তার অবস্থা প্রথম বাহাত্তর ঘণ্টায় রীতিমতো আশঙ্কাজনক ছিল। সে নিজে আর লাফালাফি না করলেও তার প্যারামিটারগুলো লম্ফঝম্প শুরু করে দিয়েছিল। সেন্সোরিয়াম জিরো। স্যাচুরেশন একবার বাড়ছে, একবার কমছে। ব্লাড প্রেশারের অবস্থাও তেমন। কখনও ঠিক আছে তো কখনও ধরধর করে নামছে। বড়ি টেম্পারেচারের অবস্থাও তেমনই। ডেলিরিয়াম যতক্ষণ ছিল, ততক্ষণ সামান্য হলেও নড়া চড়ার চেষ্টা করছিল। কিন্তু তারপরই একদম স্থির। শান্ত, নিথর! প্রথম তিনদিন ডাক্তারদের ব্যস্ততা দেখে রীতিমতো ভয়ই লাগছিল! অবশেষে তার শারীরীক অবস্থা প্রাথমিক ক্রুশিয়াল বাহাত্তর ঘণ্টা কাটিয়ে থমকে দাঁড়াল। জ্বর ছাড়ল। স্যাচুরেশনও নর্মাল। ডাক্তাররা জানিয়েছেন, অবস্থা স্টেবল। মাঝে-মধ্যে ভেন্টিলেশনের পার্সেন্টেজ কমিয়েও দেখছেন। আপাতত সে চুপচাপ আছে বলে দড়িদড়াও খুলে দিয়েছেন। জগদ্দল অক্সিজেন মাস্কের বদলে ন্যাসাল ক্যানুলা লাগানো হয়েছে। এখন তার মুখ স্পষ্ট দেখা যায়। কিন্তু যতক্ষণ না হুঁশ ফিরছে. ততক্ষণ নিশ্চিন্ত হওয়া যাচ্ছে না। অর্ণব, পবিত্র সমেত গোটা সি.আই.ডি টিমই দু বেলা

ভিজিট করছে। ডঃ চ্যাটার্জীও রোজ বিকেলবেলা একবার আসেন। প্রত্যেকদিনই ওরা এই আশায় থাকে যে হয়তো আজ কোনও সুখবর পাওয়া যাবে। কিন্তু তেমন কোনও লক্ষণই নেই।

তবে এত চাপের মধ্যেও একটাই ভালো খবর। ডঃ চ্যাটার্জীর কথায় অধিরাজকে ভালো করে পরীক্ষা করে দেখেছেন ডাক্তাররা। তার দেহে অ্যামাটক্সিন এক্স তো দূর, অন্যরকম কোনও বিষই নেই। অন্তত এই সর্বনাশটা হয়নি। তাছাড়া কোনও রকম ইন্টারন্যাল হেমারেজ বা ফুসফুসে কোনওরকম রক্তক্ষরণ হচ্ছে না।

আজও ভারাক্রান্ত মনে বিকেলের ভিজিটিং আওয়ারে হসপিটালে ঢুকল অর্ণব। ডঃ চ্যাটার্জী ওয়েটিং রুমে তারই অপেক্ষা করছিলেন। অর্ণবকে দেখে এগিয়ে এলেন তিনি, "এসেছ? চলো, দেখা করে আসা যাক।" অর্ণবের মুখে বেদনার ছাপ, "কী দেখব বলুন তো। সেই তো একই দৃশ্য!"

সত্যিই! গত সাতদিন ধরে দৃশ্যটা একটুও পালটায়নি। একটা তরতাজা, ছটফটে লোক চোখ বুজে হসপিটালের বিছানায় নির্জীব হয়ে পড়ে রয়েছে। প্রথমদিনের মতো ভুল বকছে না, বা ছটফট করছে না ঠিকই, তবে অর্ণবের মনে হয় সেটাই বরং ভালো ছিল। ঐ অস্থিরতাটুকু অধিরাজের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এই চুপ করে থাকাটা যেন আরও অসহ্য। বুকের সামান্য ওঠাপড়াটা লক্ষ্য না করলে বেঁচে আছে কিনা বোঝাই দায়। হাত দুটো বুকের ওপর জড়ো করা। গোটা দেহ শিথিল। যেন এমন অভিশপ্ত ঘুমে তলিয়ে আছে যা কখনই ভাঙবে না।

এখন ডাক্তাররা দুজন করে ভিজিটর অ্যালাউ করছেন। অর্ণব আর ডঃ চ্যাটার্জী যখন পৌঁছলেন তখন ফের ডাক্তারদের দৌড়োদৌড়ি শুরু হয়েছে। অর্ণবের বুক আশঙ্কায় কেঁপে উঠল। ডাক্তাররা এত ব্যস্তসমস্ত হয়ে কী করছেন? তবে অবস্থা কি ফের ডিটোরিয়েট করল...!

– "এই তো। আপনাদেরই খুঁজছিলাম।" পূর্বপরিচিত ডাক্তারবাবু ডঃ চ্যাটার্জীর দিকে এগিয়ে এলেন, "আপনারা একটু দেরি করে ফেলেছেন।"

–"মানে! কী বলছেন!" অর্ণবের মনে হল ডঃ চ্যাটার্জী এইবার নির্ঘাৎ ফেইন্ট হয়ে পড়ে যাবেন। "আরও কোনও কমপ্লিকেসি...?"

- "না... না!" ডাক্তারবাবু হেসে ফেললেন, "চিন্তার কোনও কারণ নেই। বরং খবর ভালোই। অফিসার সেন্সে ফিরেছেন। ইনফ্যাক্ট সকালেই চোখ খুলে তাকিয়েছিলেন। কিন্তু, লুকটা ব্ল্যাঙ্ক ছিল বলে বুঝতে পারিনি যে সেন্সোরিয়াম ঠিকঠাক আছে কি না। এই দশ মিনিট আগেই ফের তাকালেন। বাবা-মাকে চিনতে পেরেছেন, সামান্য কথাও বলেছেন। আপনাদেরও খুঁজছিলেন। তবে ড্রাউসিনেস আর ক্লান্তি থাকার কারণে বোধহয় বারবার ট্রান্সে চলে যাচ্ছেন। আমরা কতগুলো রুটিন টেস্ট করছি। আপনাদের জরুরি কোনও কথা থাকলে এখনই যান। কারণ যেহেতু এটা সি.আই.ডির কেস, সুতরাং হয়তো ওঁর বয়ান লাগবে। যা বলার এখনই বলে নিন। এরপর আর ওঁকে বিরক্ত করা যাবে না। আপাতত ঘুমোতে দেব। আজ আর কাল অবজার্ভেশনে রেখে আশা করছি পরশুই কেবিনে দিতে পারব।"

"ওকে। থ্যাঙ্ক ইউ।" কথাটা বলেই সিসিইউ'র দিকে দৌড়লেন ডঃ চ্যাটার্জী। তার পেছন পেছনে অর্ণব।

অন্যান্য দিনের থেকে আজ অধিরাজকে তুলনামূলক সম্প্রতিভ লাগছিল। এখনও তার চোখ বোজা ঠিকই, কিন্তু মুখের ফ্যাকাশে ভাবটা অনেক কম। জুনিয়র ডাক্তার ও সিস্টাররা কিছু নল ইতিমধ্যেই সরিয়েছেন। হয়তো আরও কয়েকঘণ্টা পরে আরও কিছু সরবে। ভেন্টিলেটর থেকে সরিয়ে দিলেই আর এত নলের যন্ত্রণা থাকবে না। অধিরাজের মা তার পাশেই বসেছিলেন। ডঃ চ্যাটার্জী আর অর্ণবকে দেখে ম্লান হাসলেন। ডঃ চ্যাটার্জী কোনোমতে তাঁর পাশ থেকে ঝুঁকে পড়লেন অধিরাজের ওপর। "রাজা!"

পুরো একশো আটষট্টি ঘণ্টা পরে আস্তে আস্তে চোখ মেলে তাকাল অধিরাজ। দৃষ্টিটা অসম্ভব ক্লান্ত। কিন্তু তৎস্বত্ত্বেও তীক্ষ্ণ। খুব ক্ষীণ কণ্ঠে থেমে থেমে বলল, "আমি কি মহাকাশে?"

অর্ণব ভয় পেল! সে কী! আবার ডেলিরিয়াম! কিন্তু ডাক্তারবাবু যে বললেন সেন্স ফিরেছে! ডঃ চ্যাটার্জী ও ঘাবড়ে গিয়েছেন। সংশয়াধিত দৃষ্টিতে দেখছেন তার দিকে।

অধিরাজের ঠোঁট শুকিয়ে গিয়েছিল। বাচ্চা ছেলের মতো ঠোঁট চেটে নিয়ে ফের স্তিমিত স্বরে বলল, "তবে আমার নাকের সামনে পৃথিবী ঘুরছে কেন?"

- অর্ণব ব্যাপারটা বুঝতে পেরে হাসি চাপার জন্য মুখ ঘুরিয়েছে। ডঃ চ্যাটার্জী রাগতে গিয়েও হেসে ফেললেন – "শোনো দুষ্টু চাঁদু, তুমি যে বেঁচে ফিরেছ তার একটাই কারণ। অন্য কারোর হাতে নয়, তুমি আমার হাতেই খুন হবে। অ্যামাটক্সিন এক্স দিয়ে মারব তোমাকে।"

অধিরাজ একটু সচকিত, "অ্যা-মা-ট-ক্সি-ন!"

- "হ্যাঁ । বিষটা পাওয়া গিয়েছে।" ডঃ চ্যাটার্জীর চোখে উল্লাস, "কেস আমাদের দিকে ঘুরছে বস্। তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠো।"

একটা স্মিত হাসি ভেসে উঠল তার ঠোঁটে। পরম প্রশান্তিতে সে চোখ বুজেছে। অর্ণব এবার প্রায় অসভ্যের মতো ডঃ চ্যাটার্জীকে ধাক্কা মেরে এগিয়ে গেল অধিরাজের মাথার কাছে। মৃদু স্বরে ডাকল, "স্যার।"

সে একটু যেন বিরক্ত হয়েছে। একটু ঘোরলাগা দৃষ্টিতে তাকাল অর্ণবের দিকে।

"স্যার, বুঝতে পারছি আপনার অসুবিধে হচ্ছে।" অর্ণব একটু বিব্রত,— "তবু ডিউটি! আপনাকে কে গুলি করেছিল দেখতে পেয়েছিলেন?"

অধিরাজের ভুরু কুঁচকে গেল। কী যেন ভাবল কিছুক্ষণ। তারপর মৃদু অথচ দৃঢ় ভাবে বলল, "না।"

অর্ণব স্তম্ভিত, "আপনাকে রিয়া বাজাজ গুলি করেনি?"

অধিরাজ ফের চোখ বুঁজে বলল, "আই সেইড, নো।"

– "যাব্বাবা! কী হল!"

- "ও বিরক্ত হচ্ছে।" ডঃ চ্যাটার্জী অর্ণবকে প্রায় হিড়হিড় করে টেনে সরিয়ে আনলেন, "এখন তোমার সওয়াল-জবাব বন্ধ রাখো।"

"কিন্তু...!"

অর্ণব প্রতিবাদে কিছু একটা বলতেই যাচ্ছিল। তার আগেই অধিরাজ মৃদুস্বরে ফের ডেকে উঠল, "অর্ণব!"

"ইয়েস স্যার?"

সে খুব ক্লান্তভাবেই বলল, "এখনও কাউকে গ্রেফতার করা হয়েছে?"

"হ্যাঁ, ঐ ক্লাবের রেস্টোর‍্যান্টের ম্যানেজারকে।"

- "সে ছাড়া?"

"না। এখনও পর্যন্ত আর কাউকে না।" অর্ণব জবাব দেয়, "তবে সবাইকেই জেরা করা হচ্ছে।"

অধিরাজ আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল, "বেশ। আপাতত সবাইকে ছেড়ে দাও। কাউকে জেরা করার দরকার নেই।"

"স্যার!"

"এভাবে হবে না, হওয়ার নয়! বরং তোমাদের জেরার চোটে অহল্যা জয়সওয়াল একটা বিরাট ভুল করতে পারেন। ওঁকে সেটা করতে দেওয়া ঠিক হবে না।"

বলতে বলতেই সে বালিশে মাথা এলিয়ে দিল। আর কথা বলতে চাইছে। না। অর্ণব একটু বিভ্রান্ত হয়েই বেরিয়ে এল সিসিইউ থেকে। অধিরাজের কথাটা অদ্ভুত লাগছিল তার। অহল্যা জয়সওয়াল এর মধ্যে আবার কোথা থেকে টপ্‌কে পড়লেন! যেখানে গোটা বাজাজ ফ্যামিলিই সামনে চলে এসেছে, দুজন বোটানিস্ট সামনে আছেন, একজন টক্সিকোলজিস্ট, সবাইকে ছেড়ে হঠাৎ অহল্যা জয়সওয়ালই কেন! তিনি আবার কি ভুল স্টেপ নেবেন?

ভাবতে ভাবতেই হসপিটালের বাইরে বেরিয়ে আসছিল সে। আচমকা ফোন বেজে উঠেছে। পবিত্র আচার্য!

"হ্যালো?"

"অর্ণব কাম শার্প!" 1

পবিত্রর উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনে একটু নার্ভাস হয়ে যায় সে। সর্বনাশ! আবার কী হল! আর.আই.পি পোস্ট পড়েনি তো! এখন আরেকটা ডেথ ফোরকাস্ট পড়লে আর দেখতে হবে না। ভয়ে ভয়ে জানতে চাইল, "কেন? কী হয়েছে?"

“অহল্যা জয়সওয়াল ব্যুরোয় এসেছেন।” পবিত্র রুদ্ধশ্বাসে বলল, “এবং দাবি করছেন, সর্বনাশিনীর আসল মুখ তিনিই। গৌরব জয়সওয়াল থেকে শুরু করে ডঃ বিজয় জয়সওয়াল অবধি যত খুন হয়েছে, সব তিনিই করেছেন। স্বামী পুত্র সহ বাকি দুজনকেও তিনিই বিষ দিয়ে মেরেছেন।” অর্ণবের মাথায় যেন বাজ পড়ল! এটাই বাকি ছিল!

(ছাব্বিশ)

মানে মানে আরও আটচল্লিশ ঘণ্টা কাটল। এর মধ্যে সি.আই.ডি হোমিসাইডের অবস্থা রীতিমতো টাইট। অহল্যা জয়সওয়াল তাদের অতিষ্ঠ করে রেখেছেন। ভদ্রমহিলার এমন ব্যক্তিত্ব যে কিছু বলাই বিপদ। তিনি রীতিমতো লিখিত বয়ান দিয়েছেন যে অ্যামাটক্সিন এক্স দিয়ে সবাইকে তিনিই খুন করেছেন। এমনকি গেটকীপার গগনকেও নাকি তিনিই গুলি করেছেন!

অর্ণব ভুরু কুঁচকে বলে, "আপনি গুলি চালাতে জানেন?"

"জানি কি না একটা রিভলবার দিয়েই দেখুন।" অহল্যার শান্ত জবাব।

অর্ণব কী বলবে ভেবে পেল না। ঢোঁক গিলে বলল, "কিন্তু কেন?" অহল্যার চোখ দিয়ে যেন আগুনের ফুলকি ঝরে পড়ল, "কারণ আমার স্বামী আমার লাইফ হেল করে দিচ্ছিলেন। আমাকে ও আমার মেয়েকে কথায় কথায় অপমান করতেন। আমি ফর্সা সুন্দরী নই বলে চিরকালই তাঁর আমার ওপর রাগ ছিল। ভীষণ অত্যাচার করতেন। শুধু তাই নয়, আমার বড় বৌমা রাধিকাকে এক্সপ্লয়েট করছিলেন। আর গৌরব একটা ভেড়া। বাপের এই কাজে তারও মদত ছিল। সহ্যেরও একটা সীমা থাকে। তাই দুজনকেই...!"

- "তাহলে পরপর দুজনকে মারলেই তো হত। মাঝখানের দুজনকে মারলেন কেন?"

"পুলিসকে বিভ্রান্ত করার জন্য। আমি এটাকে সিরিয়াল কিলিঙের কেস হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলাম। সঞ্জীব রায়চৌধুরী আর অর্জুন শিকদারকে গোল্ডেন মুন ক্লাবেই পেয়ে যাই। ওরা একটি কালো মেয়েকে যাচ্ছেতাই ভাবে অপমান করেছিলেন। তাই ওদেরও...।"

অর্ণব এবং পবিত্র পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। এই ভদ্রমহিলাকে সর্বনাশিনী ভাবাই মুশকিল! দুই লম্পট দুশ্চরিত্র ও মাতালকে প্রেমের কুহকের জালে ফেলে বিষ খাইয়ে দেওয়া আর যাই হোক, এই মহিলার কাজ হতেই পারে না। আর যে স্ত্রীকে ডঃ বিজয় জয়সওয়াল নিজেই দুচক্ষে দেখতে পারতেন না, তাঁর সঙ্গে রিসর্টে কী করতে যাবেন! হয় অহল্যা মিথ্যে কথা বলছেন, নয়তো ওঁর কোনও সহকারী আছে।

কিন্তু কেউ যদি নিজেই কনফেস করে বসে থাকে কী উপায়! বাধ্য হয়ে তাঁর বাড়িতেও এভিডেন্সের খোঁজ করেছে সি.আই.ডি হোমিসাইড! আর সত্যি সত্যিই তাঁর ঘর থেকে পাওয়া গিয়েছে অ্যামাটক্সিন এক্সের শিশি! তার সঙ্গে মাউথওয়াশটাও। ডঃ চ্যাটার্জী জানিয়েছেন যে ওটা অ্যামাটক্সিন এক্সই বটে! মাউথওয়াশে যে পরিমাণ অ্যামাটক্সিন এক্স আছে তার একফোঁটাও প্রাণঘাতী! মাউথওয়াশের বোতলের মুখে ডঃ বিজয় জয়সওয়ালের স্যালাইভাও পাওয়া গিয়েছে। বিষের শিশি, ও মাউথওয়াশের অহল্যার আঙুলের ছাপও আছে। যথেষ্টই জোরালো প্রমাণ!

কিন্তু তা সত্ত্বেও থিওরিটাকে কিছুতেই হজম করতে পারছে না টিম অধিরাজ। যে তন্বী, সুন্দরী, ফর্সা, রতি ক্রিয়ায় পারদর্শিনী, প্রেমিককে লাভ বাইট দেওয়া ট্যাটুওয়ালি দাবাড়ুকে তারা খুঁজছে, তিনি কিছুতেই অহল্যা হতে পারেন না! আবার অধিরাজের একটা কথাও নজর আন্দাজ করে যাচ্ছে না। তার মনে হয়েছিল যে অহল্যা জয়সওয়াল একজন চমৎকার খুনী হতে পারেন।

– "আগে রিয়া বাজাজ একাই বলছিল যে সে খুন করেছে। এখন অহল্যা জয়সওয়ালও জুটলেন। তিনি তো লিখিত বয়ানও দিয়ে দিয়েছেন! এবার প্লিজ উদ্ধার করো রাজা। আরও দু একজন যদি এই একই ডায়লগ ঝাড়ে তবে আমাদেরও অ্যামাটক্সিন এক্স ছাড়া উপায় নেই।"

অধিরাজ কোলের ওপরে ল্যাপটপ রেখে খুব মনোযোগ সহকারে প্রত্যেকের বয়ানের অডিও রেকর্ডিং আর ভিডিও ফুটেজ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শুনছিল এবং দেখছিল। এখন তার গায়ে পেশেন্টের নীল জামা। গালে বেশ কয়েকদিনের না কামানো খোঁচা খোঁচা দাড়ি। আজ সকালে ভিজিটিং আওয়ারে এসেই অর্ণব তার ল্যাপটপ, মোবাইল সমেত সমস্ত ফরেনসিক রিপোর্ট, এভিডেন্স আর ফুটেজও দিয়ে গিয়েছে। সে সকাল থেকেই বিকেল অবধি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সেগুলো দেখছিল। পবিত্র'র কথা শুনে হেসে ফেলল, "অত ভয়ঙ্কর কিছু করতে হবে না আশা করছি। তবে শিনা জয়সওয়ালের বয়ান নাওনি তোমরা?"

"উনি কোম্পানির কাজে বাইরে গিয়েছেন। আজ রাতের ফ্লাইটে ফিরবেন।"

অধিরাজ আলগোছে মাথা নাড়িয়ে ফের ফুটেজে মন দেয়। এখন তাকে কেবিনে শিফট করে দিয়েছেন ডাক্তাররা। যদিও এখনও নজরে নজরে রাখছেন। পুরোপুরি ফর্মে ফিরতে আরও আটচল্লিশ ঘণ্টা লেগেছে। ডাক্তাররা স্ট্রেস নিতে বারণ করলেও সে খুব একটা পাত্তা দেওয়ার লোক নয়। সুতরাং যথারীতি বিছানায় আধশোয়া হয়েই কাজে নেমে পড়েছে। পুলিসি তদন্তের সমস্ত ভিডিও, অডিও রেকর্ডিংগুলো খুব মন দিয়ে দেখছে। আজকাল কলকাতা পুলিস থেকে সি.বি.আই পর্যন্ত সব গোয়েন্দাবিভাগেই সন্দিগ্ধদের বয়ানের অডিও ও ভিডিও রেকর্ড থাকে। তাতে তদন্তের ক্ষেত্রেও সুবিধা হয়। কোর্টে প্রমাণ হিসাবেও পেশ করা যায়। অডিও প্রমাণ হিসাবে গ্রাহ্য না হলেও ভিডিও গ্রহণযোগ্য। - "অহল্যা জয়সওয়ালের বাড়ি থেকে আর কী কী পেয়েছ তোমরা? এভিডেন্সের মধ্যে একটা চেসবোর্ড আছে দেখছি!"

অর্ণব জানায়, "হ্যাঁ স্যার। চেসবোর্ডটাও আমরা এনেছি।"

– "ফিঙ্গারপ্রিন্টের জন্য ফরেনসিকের কাছে পাঠিয়ে দাও। জিজ্ঞাসা করবে সাদা আর কালো ঘুঁটিগুলোয় কার কার হাতের ছাপ আছে।" সে ফুটেজ দেখা শেষ করে ল্যাপটপটা বন্ধ করে, "সকালে যে বলেছিলাম, অহল্যা জয়সওয়ালের সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করে দাও, তার কী হল?" পবিত্র মাথা চুলকে বলল, "ওঁকে এনেছি আমরা। লেডি অফিসাররা ওঁর সঙ্গে নীচে দাঁড়িয়ে আছেন।"

- "সে কী!" অধিরাজ শশব্যস্ত, "ভদ্রমহিলাকে নীচে বসিয়ে রেখেছ তোমরা? ছিঃ ছিঃ! যাও, এখনই নিয়ে এসো। সঙ্গে লেডি অফিসারদের দরকার নেই। তিনি এক পেশেন্টকে দেখতে আসছেন, কোর্টে যাচ্ছেন না। বুঝেছ?"

"ওকে।"

পবিত্র মাথা নেড়ে চলে গেল। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই অবশ্য ফিরেও এল। সঙ্গে অহল্যা জয়সওয়াল। অর্ণব দেখল ভদ্রমহিলার মুখে ইস্পাতকঠিন দৃঢ়তা! এত সহজে বাঁকানো যাবে না তাঁকে। ভাঙা তো দূর! আটচল্লিশ ঘণ্টা ধরে অনেক চেষ্টা করে দেখেছে। মহিলা নিজের জায়গা থেকে একচুলও নড়েননি।

অধিরাজকে দেখেই অহল্যার মুখে একটা রহস্যময় হাসি ভেসে ওঠে, —"ভেবেছিলাম, বোধহয় পেশেন্ট দেখতে এসেছি। এখন আপনাকে দেখে বুঝতে পারছি, ফের জেরা শুরু হল বলে!"

অধিরাজ কোনও কথা না বলে মৃদু হাসল। দুজনেই দুজনের চোখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। অর্ণব স্পষ্ট বুঝল, দাবাখেলাটা ফের শুরু হয়ে গিয়েছে।

"আমার যা বলার আমি কিন্তু বলে দিয়েছি।" অহল্যা দৃঢ়ভাবে বললেন, —"আমিই খুনী। স্বীকারোক্তিও দিয়েছি। কিন্তু আপনার এই দুই অফিসার বিশ্বাস করছেন না।"

অধিরাজ আলগোছে একটা হাই তুলে বালিশের ওপর পিঠ রেখে আরাম করে আধশোয়া হয়ে বসেছে, "ওরা বিশ্বাস করুক বা না করুক, আমি কিন্তু সত্যিই বিশ্বাস করেছি ম্যাডাম। আপনিই খুনী সে বিষয়ে সন্দেহই নেই।"

এই ধরনের কথা সম্ভবত অহল্যা আশা করেননি। তাঁর পাথরের মতো মুখে সামান্য বিস্ময় উঁকি মেরেই মিলিয়ে গেল, "তবে আমাকে ডেকে পাঠানোর মানে কী!"

অধিরাজ তাঁর দিক থেকে চোখ না সরিয়েই বলল, "আসলে আমি খুব ফিল্মি লোক। গল্প শুনতেও খুব ভালোবাসি। তার ওপর বাইরেও বেরোতে পারছি না। ডাক্তারেরা বাগে পেয়ে খুঁচিয়ে খাচিয়ে, ওষুধ গিলিয়ে বোর করছে। একটু এন্টারটেইনমেন্টেরও তো দরকার। তাই আপনার কাছে। একটাই আবদার। অন্যদের বাদ দিন। গৌরবকে কীভাবে মারলেন সেটাই একটু বিস্তারিতভাবে বলবেন প্লিজ?"

অহল্যার মুখ পাথরের কঠিন, "কেন? অ্যামাটক্সিন এক্স দিয়ে?"

– "সে তো আমাদের সবারই জানা। যেটা জানি না সেটাই বলুন।" অধিরাজ তাঁর চোখে চোখ রেখেই বলে, "একদম সিন বাই সিন। কাট বাই কাট, উইথ ডিটেলিং। আমারও একটু মনোরঞ্জন হবে।"

– "আমি ওর খাবারের মধ্যে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিলাম। তারপর ও অসুস্থ হয়ে পড়ল। হসপিটালে নিয়েও যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু...!" অধিরাজ বাচ্চা ছেলের মতো ঠোঁট উলটে বলল, "এটা একটা গল্প হল!

সরি ম্যাডাম, আপনি কিন্তু গল্পকার হলে ফেল মারতেন।"

অহল্যা জয়সওয়াল একটু কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো তার দিকে তাকিয়ে আছেন। একটু চুপ করে থেকে বললেন, "আমি গল্প বলতে জানি না।"

"কিন্তু বাংলা ক্লাসিক সাহিত্য তো পড়েন। দেখেননি ওখানে লেখকেরা কী সুন্দর বর্ণনা দিয়ে লেখেন? এত নিখুঁত ডিটেলিং যে মনে হয় চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি!" অধিরাজ শান্ত ভঙ্গিতে বলল, "আপনি যখন পারেন না, তখন গল্পটা আমিই বলি। আপনি না হয় শুনুন। ভুল হলে শুধরে দেবেন। নাথিং সিরিয়াস, জাস্ট টাইমপাস।"

অহল্যা সতর্ক দৃষ্টিতে অধিরাজকে মেপে নিলেন। মৃদু স্বরে বললেন, —"ওকে।"

অধিরাজ আস্তে আস্তে বলতে শুরু করল। তার কণ্ঠস্বর মায়াবী, "গৌরব জয়সওয়াল আপনার প্রথম সন্তানের নাম। সে যখন জন্মেছিল তখন প্রথমবার আপনি 'মা' হয়েছিলেন। সে ছোট্ট ছোট্ট হাত দিয়ে আপনার এই কোঁকড়াচুলের গুচ্ছ মুঠো করে ধরত। ফোঁকলা মুখে খিলখিলিয়ে হাসত আর 'মা' শব্দটা উচ্চারণ করার চেষ্টা করত। যখন প্রথমবার সে 'মা' শব্দটা সঠিকভাবে উচ্চারণ করেছিল, আপনি আনন্দে কেঁদে ফেলেছিলেন। যখন সে হাসত, তখন আপনিও হাসতেন। যখন কাঁদত, কী করে কান্না থামাবেন ভেবে অস্থির হয়ে যেতেন। অসুস্থ হয়ে পড়লে রাতের পর রাত জাগতেন। আপনার হাত ধরেই সে হাঁটতে শিখেছিল...!"

অহল্যার চোখদুটো যেন স্মৃতিমেদুর হয়ে আসে। যেন সত্যিই শিশু গৌরব জয়সওয়াল তাঁর সামনে হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছে। যেন নিষ্পাপ শিশু গৌরব টলমলিয়ে তাঁর দিকেই ছুটে আসছে...!

"সেই গৌরবই বড় হয়ে অন্যরকম হয়ে গেল। হ্যাঁ, তার দোষ ছিল। মহাপাপ করেছে সে। নিজের অর্ধাঙ্গিনীকে বাবার ভোগ্যবস্তু হয়ে ওঠার পথে বাধা দেয়নি। হয়তো বাবার কঠোর ব্যক্তিত্বের সামনে হেরে গিয়েছিল। আর সেই পাপের শাস্তি পেতেই হত তাকে। আপনি নিজের হাতেই দিলেন। এবং আমার মতে একদম ঠিক কাজই করেছেন। অ্যামাটক্সিন এক্সের প্রভাবে প্রথমে তার পেটে অসহ্য যন্ত্রণা হতে শুরু করল। যখন সে বিছানায় পড়ে কাটা পাঁঠার মতো দাপাদাপি করছিল তখন আপনি শুধু দেখছিলেন! একদম ঠিক করেছেন!" -

অহল্যার ভাবলেশহীন মুখে অব্যক্ত যন্ত্রণার ছাপ পড়েছে। শান্ত চোখদুটোয় ঈষৎ চাঞ্চল্য।

"তারপর শুরু হল অ্যাকিউট ডায়রিয়া! কিছু খেতে পারছে না! এমনকি জলও না! যা খাচ্ছে বমি হয়ে যাচ্ছে! বমি করতে করতেই একসময় রক্ত উঠতে শুরু করল। একদম টাটকা তাজা রক্ত। আপনার রক্তের ধন আপনারই সামনে মুখে রক্ত তুলছে, যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে নিস্তেজ হয়ে পড়ছে। আপনি জানতেন অ্যামাটক্সিন-এক্স তার লিভার ছিন্নভিন্ন করে দেবে। গৌরব আর কোনওদিন আপনাকে মা বলে ডাকবে না! তার লিভার আর রেনাল ফেইলিওর অবধারিত ছিল। ও আপনার চোখের সামনে যন্ত্রণায় আধমরা হচ্ছিল, হয়তো খুব কাতরভাবে ডাকছিল, 'মা...মা' বলে। ওর আর কোনও চয়েসই ছিল না। নিজের উঠে দাঁড়ানোরও শক্তি ছিল না। একটু একটু করে বীভৎস এক যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর দিকে যাচ্ছিল। তবু আমার বিশ্বাস, সে আপনাকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ডেকেছিল। কারণ প্রত্যেক সন্তানই বিশ্বাস করে যে তার মা এসে তার অসহ্য যন্ত্রণা কমিয়ে দেবেন... যেমন ছোটবেলায় দিতেন... পড়ে গিয়ে চোট পেলে, আদর করে ব্যথা ভুলিয়ে দিতেন, তেমনভাবেই পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা ঔষধিটি নিয়ে আসবেন মা! তাই হয়তো আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েও সে আপনাকেই ডেকে যাচ্ছিল। আপনিই ছিলেন তার বাঁচার শেষ অবলম্বন। কিন্তু...!"

"স্টপ...স্ট....প! আই সে!"

দুই অফিসারকে স্তম্ভিত করে দিয়ে হা হা করে কান্নায় ভেঙে পড়লেন অহল্যা জয়সওয়াল, "আপনি এত নিষ্ঠুর!... চুপ করুন...... প্লিজ! আমি আর পারছি না!...আর পারছি না।"

অধিরাজ নির্বাক দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। তার বেডের পাশে একটা টিস্যুপেপারের বাক্স ছিল। সে নীরবে একটা টিস্যুপেপার বের করে অহল্যার দিকে এগিয়ে দেয়। অহল্যার দেহটা অদম্য কান্নায় কাঁপছে! কোনোমতে ধরা গলায় বললেন, "ওঃ।"

তাঁকে পুরোপুরি ধাতস্থ হওয়ার প্রয়োজনীয় সময় ও সুযোগ দিল অধিরাজ। তারপর খুব সস্নেহভাবে বলল, "আমার কথা শুনুন ম্যাডাম। বৃথাই কষ্ট করছেন আপনি। অনেকক্ষণ

ব্যুরোতে আছেন শুনলাম। এখন বাড়ি যান। রেস্ট নিন। ভালো করে ঘুমোন। দু দিন ভাবুন। তারপরও যদি আপনার স্থির বিশ্বাস হয় যে গৌরব জয়সওয়ালকে আপনিই মেরেছেন, তখন না হয় দেখা যাবে।"

অহল্যার গোটা দেহ তখনও কাঁপছিল। উঠে দাঁড়াতে গিয়েও পড়ে যাচ্ছিলেন। পবিত্র তাঁকে তাড়াতাড়ি ধরে ফেলে।

"ওঁকে একটু জল-খাবার খেতে দিও পবিত্র।" অধিরাজ ফরেনসিক রিপোর্টের ফাইল তুলে নিয়েছে, "তারপর একদম বাড়িতে ড্রপ করে দিয়ে আসবে।"

"ডান্।"

মিসেস অহল্যা জয়সওয়ালকে নিয়ে চলে গেল পবিত্র। অর্ণব দেখল ভদ্রমহিলার হাত-পা তখনও থরথর করে কাপছে। ভেঙে পড়েছে ওপরের পাথুরে আবরণ! পাথরের ভেতরে এক মায়ের অপরূপ ভাস্কর্য বেরিয়ে পড়ে যেন নকশাটাকেই আমূল বদলে দিল। এক অন্য অহল্যা জয়সওয়ালকে এক মুহূর্তের জন্য দেখা গেল।

"সরি ফর দ্য ড্রামা অর্ণব।" টিস্যুপেপারে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বলল অধিরাজ, "কিন্তু টেম্পোটা না তুললে মহিলাকে ভাঙা যাচ্ছিল না।"

সে আর বলতে! স্নায়ুযুদ্ধটা তো এইমাত্র নিজের চোখেই দেখল সে। প্রায় বাকরুদ্ধই হয়ে গিয়েছিল অর্ণব। কোনোমতে বলল, "এটা কী হল?"

"দাবার চাল! কাসলিং বোঝো? চেকমেট বাঁচাতে কিং এর সঙ্গে রুক, মানে নৌকো জায়গা পালটে নিচ্ছিল। আমি শুধু ডিফেন্সটা ভেঙেছি।" -

অধিরাজকে একটু ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। সে কথা বলতে বলতেই ফের বালিশে ঠেশ দিয়ে শুয়ে পড়েছে— "চমৎকার মহিলা, আই মাস্ট সে। ইউ নো অর্ণব, আমার হাতে যদি চয়েস থাকত, আমি এই মহিলার প্রেমে পড়তাম।"

"উনি নন, তাই না?"

"কোনোমতেই না। কিন্তু উনি কাউকে সন্দেহ করেছেন। অসম্ভব বুদ্ধিমতী মহিলা। কিছু আঁচ করেছেন নিশ্চয়ই। যাকে সন্দেহ করেছেন, তাকে গার্ড করার চেষ্টা করছেন। আমি খুব

অবাক হব না, যদি অহল্যা বাড়িঘর খুঁজে কোনও প্রিয় মানুষের ঘরে ঐ মোক্ষম এভিডেন্স দুটো পেয়ে থাকেন।"

"তবে তো ওঁকে জেরা করতে হয়!"

"একদম না। ভদ্রমহিলাকে দেখে তোমার মনে হল যে উনি সব গড়গড়িয়ে বলবেন?"

অর্ণব কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "অহল্যা জয়সওয়াল! অভিশপ্ত নাম। কিন্তু উনি সুন্দরী নন।"

– "আমার মতে উনি যথেষ্টই সুন্দরী। সৌন্দর্যের সবটাই চোখে দেখা যায় না অর্ণব।" অধিরাজ ফের ফুটেজগুলো দেখছে, "তবে জিজ্ঞাসা করার দরকার নেই। উনি যা জানেন, আমিও মোস্ট প্রব্যাবলি তাই জানি।"

-"মানে!"

অর্ণবের মাথার চুলগুলো যেন হাই ভোল্টেজ খেয়ে খাড়া হয়ে যায়। এ কী বলছে অধিরাজ। সে অস্ফুটে বলল, "আপনি জানেন? কে এবং কেন?"

- "অফকোর্স জানি।" সে ল্যাপটপেই চোখ রেখে বলল, "কিন্তু তোমরা এ কী করেছ! সব সন্দিগ্ধদের একটা ভাঙা চেয়ারে বসিয়েছ! নতুন চেয়ার নেই!"

অর্ণব মনে মনে জিভ কাটে। এই রে! ওটাও গোয়েন্দাপ্রবরের চোখে পড়েছে। তার মনের কথা পড়ে নিয়েই যেন বলল অধিরাজ, "চোখে পড়াই স্বাভাবিক। কারণ প্রথমবার এটা আমাকে নিয়েই ভেঙে পড়েছিল! সে কোমর আর পিঠের ব্যথা এখনও মনে আছে। সুপর্ণা জয়সওয়াল যদি এই তথ্যটা জানতে পারতেন, তবে কাল সকালের নিউজ পেপারেই বেরোত— "সর্বনাশিনী সন্দেহে ভাঙা চেয়ারের দ্বারা গণহত্যার প্রচেষ্টা সি.আই.ডি, হোমিসাইডের!"

- "কিন্তু ওটা আপনি কী বললেন স্যার! আপনি জানেন কে?"

– "কে, কী করে এবং কেন!" অধিরাজ মিটিমিটি হাসল, "কী করে তা তো সোনালি চাঁদে গিয়েই বুঝেছিলাম। রানির বোড়ে ভুলটা করে বুঝিয়ে দিল। বাকিটা তোমাদের ইনভেস্টিগেশন। এখন নিশ্চিতভাবেই জানি কে এবং কেন। ভেরি গুড জব অর্ণব। ফাটিয়ে দিয়েছ গুরু।"

অর্ণব যেন নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছে না। তার অবস্থা দেখে হেসে ফেলল অধিরাজ, "আচ্ছা, একটা ছোট ক্লু দিই। যেদিন লোকটাকে চেজ করেছিলাম সেদিন তিনটে দফায় চেজ হয়েছিল। তুমি আর পবিত্র গাড়িতে ছিলে আর আমি রেসিং বাইকে। রেসিং বাইক আনার একটাই

কারণ, ঐ বাইকে 'পুলিস' শব্দটা লেখা নেই। আর লেদার জ্যাকেট মার্কা হুলিয়াটা বাইক রেসারদেরই। তোমরা দুজন এমনভাবে ওকে পাগল করে দিয়েছিলে যে অনেকটা পেছনের বাইক রাইডারকে পাত্তাই দেয়নি। যদি দেখতেও পেত তাহলে ভাবত যে যেসব বাইক রাইডাররা আজকাল শহরের ফাঁকা রাস্তায় বে-আইনি রেস করে, তাদেরই কেউ হবে। কোনও পুলিস অফিসার যে রেসিং বাইকে ওরকম হুলিয়া মেরে ওর পেছনে দৌড়তে পারে এটা ঐ টেনশনের মধ্যে ভাবতেও পারেনি। স্বাভাবিকভাবেই ও একেবারে সটান গিয়ে হাজির হল রানির দরবারে । রানি বিপদ বুঝতে পেরে ওখানেই ব্যাটাকে উড়িয়ে দিলেন এবং সেখানেই দেখা দিলেন রিয়া বাজাজ।"

"রিয়া বাজাজই কি আপনাকে...?"

"ও প্রশ্নটা স্থগিত থাক...।" সে অভ্যাসবশতই পেশেন্টের ইউনিফর্মেই বুক পকেট খুঁজছে। অর্ণব আস্তে বলল, "ওটা ওখানে নেই। নো স্মোকিং স্যার। ডাক্তারদের বারণ আছে।"

"সরি। রিয়া বাজাজের প্রসঙ্গে আসি।" অধিরাজ হতাশ ভঙ্গিতে ফের শুয়ে পড়েছে, "প্রথম কথা রিয়া বাজাজ ওখানে এল কী করে? এল তো এল, বন্দুক নিয়ে প্রায় দু মিনিট পোজ মেরে বসে রইল কেন? যাতে পুলিস ওকে একেবারে হাতেনাতে ধরে ফেলে? তার চেয়েও বড় প্রশ্ন, যার প্যারানয়েড স্কিজোফ্রেনিয়া আছে সে পাবলিকের এত সেন্স থাকতেই পারে না যে বন্দুকটা তাক করে চালাবে! ওর 'মাউ' ওরফে মাসি অহনা ভট্টাচার্য বলেছেন যে ও ম্যানিকুইনটাকে মিঃ বাজাজ ভেবে খুন করে, তারপর বস্তাবন্দী করে টেনে হিঁচড়ে ডাম্প করে। হোয়াই? একটা ম্যানিকুইন এত ভারীও নয় যে সেটাকে রিয়ার মতো বড়সড় মেয়ে ঘাড়ে করে নিয়ে যেতে পারবে না! আজকাল লোকে বড় বড় স্যুটকেসে

ভরেও লাশ ফেলে দেয়। তবে এত অপশন থাকতে ম্যানিকুইনটা বস্তাবন্দী করে নিয়ে যেতে হল কেন? তাও আবার টেনে হিঁচড়ে! বস্তাটা ঘাড়ে ফেলে নিয়ে গেলেই তো হয়।"

অর্ণব সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায়, "তবে কি রিয়া অভিনয় করছে?"

- "একদমই না। রিয়ার মেন্টাল প্রবলেম সত্যিই আছে।" অধিরাজ রিয়া বাজাজের বইয়ের ছবিগুলো তুলে ধরল, "এই দ্যাখো, ওর কম্পিউটার হ্যাকিঙের ওপর গুচ্ছ বই এবং তার ওপর ওর নিজের নামের স্টিকার। কোনওটাতে রিয়ার 'আর'টা বড় হাতের! কোনওটায় সেই 'আর'ই ছোট হাতের ! অথচ কনস্ট্যান্টলি বাজাজের 'বি' টা কিন্তু ক্যাপিটাল লেটার! মেয়েটার মাথার ঠিক নেই। ভাবনাচিন্তাগুলো অস্থির।"

"তবে?"

"রিয়া কাউকে নকল করছে।" অধিরাজ বলল, "স্কিজোফ্রেনিয়ার পেশেন্টরা অনেকসময়ই ইকোপ্র্যাক্সিয়ার শিকার হয়। সম্ভবত রিয়ারও সেই সমস্যাটা আছে। রিয়া কাউকে কাজটা করতে দেখেছে, এবং প্যারানয়েড স্কিজোফ্রেনিয়ার সেলফ টর্চারের প্রবণতা অনুযায়ী নিজেকেই সেই অপরাধী ভাবছে! ও চোখের সামনে যে অ্যাকশনটা দেখেছে সেটাকেই বারবার রিপিট করছে।"

– "তাহলে কি সত্যিই প্রিয়াকে মিঃ বাজাজ খুন করেছিলেন?" অর্ণব বলল, – "রিয়া সেটাই দেখে ফেলেনি তো? অহনাও এরকম কিছুই সন্দেহ করেন! অহনা বলেছিলেন হয়তো রাতের অন্ধকারে প্রিয়াকে খুন করেছিলেন মিঃ বাজাজ! এবং তারপর বস্তাবন্দী করে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে কোথাও ডাম্প করেছিলেন বা পুঁতে দিয়েছিলেন। টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার হয়তো ওটাই কারণ! একটা আস্ত মানুষকে ওভাবেই নিয়ে যাওয়া হয়। সেজন্যই রিয়া অত ভয় পায়! ও হয়তো ভাবে মিঃ বাজাজ ওকেও খুন করবেন। ও মিঃ বাজাজকেই হয়তো নকল করছে।"

"ইমপসিবল নয়।" অধিরাজ মিটিমিটি হাসে, "সবই সম্ভব। সুপর্ণা জয়সওয়ালের ক্যারেক্টারটাও কী অদ্ভুত দেখো। গোটা ইন্টারোগেশনে ওঁর একটা প্রশ্ন করা উচিত ছিল। কিন্তু করেননি! আশ্চর্য!"

- "ওঁকে যখনই আমার ফাইলটা দেখিয়েছিলে তখনই তিনি স্বীকার করেছেন যে রিপোর্টগুলো এবং ইন্টারভিউটা ওঁরই নেওয়া। ওনার জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল যে ওটা তোমরা কোথায় পেলে? ফাইলটা ওখানে গেলই বা কী করে? অথচ প্রশ্নটা সুপর্ণা করেনইনি। একজন ক্রাইম রিপোর্টার এত উদাসীন কী করে হন?"

অর্ণব হাল ছেড়ে দেয়। এ কুয়াশা ভেদ করা তার সাধ্য নয়। সে অসহায়ভাবে বলল, "তবে এরপর কী করব স্যার?"

"শিনা জয়সওয়ালকে ইন্টারোগেট করে ছেড়ে দাও।" অধিরাজ একটু অন্যমনস্ক, "আপাতত আর কিছু করার নেই। স্রেফ হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকো।"

-"ইনভেস্টিগেশন চলবে না?" অর্ণব অবাক।

"দরকার নেই। কারণ তিনি জবরদস্ত একটা ইনভেস্টিগেশন এক্সপেক্ট করছেন। অন্তত অহল্যা জয়সওয়ালের কনফেশনের পর তো বটেই। এবার আমরা একটু তাঁকে হতাশ করি। ততক্ষণ কিচ্ছু করব না যতক্ষণ না তিনি কিছু করছেন। অর্থাৎ নেক্সট আর.আই.পি পোস্ট পড়ছে। আপাতত সব সাসপেক্টদের বলো একটা করে স্বহস্তলিখিত বয়ান দিতে।" তার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে, "তলে তলে একটু খোঁজ নাও যে অ্যাডেলিন বাজাজের পতিদেব এর মধ্যে ভারতবর্ষে আসছেন কি না। এলে কবে আসছেন? আর ট্র্যাফিক ডিপার্টমেন্টকে একটু অ্যালার্ট করো। রাতের বেলায় চারটে চাকাই পাংচারওয়ালা কোনও বেওয়ারিশ কার দেখলেই যেন প্রথম ফোনটা সি.আই.ডি, হোমিসাইডেই করে।"

অর্ণবের মাথার ভেতরে একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি! তাই তো! যাঁরা যাঁরা কালো মেয়েটিকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে এখন অ্যাডেলিন বাজাজের স্বামীই শুধু বাকি আছেন। তাহলে কি এরপর তাঁরই পালা! ভাবতেই রক্তহিম হয়ে গেল অর্ণবের। সে কোনও কথা না বলে দ্রুতগতিতে বেরিয়ে গেল। এখন তার অনেক কাজ। তাই তাড়াহুড়োতে বিদায় সম্ভাষণ করতেও ভুলে গেল।

সে চলে যেতেই হঠাৎ অধিরাজ সচকিত হয়ে ওঠে। হাতের কাছেই কলিংবেল। সেটা টিপতেই সাদা ইউনিফর্ম পরা নার্স এসে দাঁড়াল, "ইয়েস স্যার?"

"গিভ মি আ মিরর প্লিজ।"

"মিরর!" নার্সটি যেন একটু অবাক হল। কিন্তু মুখে প্রকাশ না করে বলল— "ওকে স্যার।" -

অধিরাজের মুখ সন্দেহসঙ্কুল হয়ে ওঠে। গত আটচল্লিশ ঘণ্টা ধরেই একটা ব্যাপার লক্ষ্য করছে সে। অর্ণব, ডঃ চ্যাটার্জী, পবিত্র এমনকী অহল্যা জয়সওয়ালও কথা বলতে বলতেই তার ডান কাঁধের দিকে তাকাচ্ছিলেন। ওরা ভেবেছে, সে লক্ষ্য করেনি! অধিরাজ অত বোকা নয়। প্রথমে ভেবেছিল, হয়তো চোখের ভুল। কিন্তু এখন আর সন্দেহ নেই। ওরা তার ডানকাধের দিকেই খুব সন্তর্পণে তাকাচ্ছে। কিছু তো গোলমাল আছেই। কিছু গন্ডগোল...!

"এই যে স্যার, আপনার আয়না।"

সে বিনীত হেসে আয়নাটা নিয়ে নেয়। নার্সটি চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল। আর তারপরই...!

আয়নায় ঠিক ধরা পড়ল সেই মোক্ষম জিনিসটি! এখনও মিলিয়ে যায়নি। সামান্য কালশিটের মতো জ্বলজ্বল করছে এখনও! লাভ বাইট! অসহ্য রাগে, প্রচণ্ড অপমানে তার চোখদুটো জ্বলে ওঠে। দাঁতে দাঁত পিষে বলল অধিরাজ,

"আই হে-ট ইউ!"

(সাতাশ)

দিন কাটতে থাকে দিনের মনে। থম্‌কে যাওয়া রাস্তা আবার সময়ের নিয়মে বাঁক নেয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছুই বদলাতে থাকে। কিন্তু যে লড়াইটা কিছু দিন আগেই শুরু হয়েছিল, এখনও সেটা শেষ হয়নি। শুধু সাময়িক বিরতি হয়েছে মাত্র। তবু প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছে টিম অধিরাজ। মনে মনে বলছে, "উই মে হ্যাভ লস্ট দ্য ব্যাটল, বাট নট দ্য ওয়ার।"

সর্বনাশিনীর তৃতীয় অ্যাটাকের পর প্রায় মাসখানেক হতে চলল। ডঃ বিজয় জয়সওয়ালের বডি অহল্যা জয়সওয়াল এবং সুপর্ণা জয়সওয়ালকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। গোটা তদন্তে এই প্রথম গৌতম জয়সওয়ালকে দেখল অর্ণব। বাবার বডি নিতে মা আর বোনের সঙ্গে এসেছিল। ডার্ক-টল-হ্যান্ডসাম চেহারার ব্যক্তিত্ববান পুরুষ। পবিত্র তাকেও জেরা করার তাল করছিল। কিন্তু অধিরাজকে জিজ্ঞাসা করতেই সে বলল, –"দরকার নেই। চুপচাপ থাকো।"

ওরা অবশ্য একদম চুপচাপ বসে নেই। সব সন্দিগ্ধের ফোন রেকর্ড আর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ঘেঁটে দেখেছে। যথারীতি কোথাও কোনও সন্দেহজনক কিছু নেই। অ্যাডেলিন বাজাজ জানিয়েছেন যে তাঁর স্বামী কিছুদিনের মধ্যে সত্যিই ভারতবর্ষে ফিরছেন। সঠিক তারিখ বা সময়, কিছুই এখনও বলেননি। তবে খুব তাড়াতাড়িই জানাবেন। অর্ণব বেশি কথা না বাড়িয়ে বলল— "উনি ডেট জানিয়ে দিলেই ব্যুরোয় ইনফর্ম করবেন।"

অ্যাডেলিনের স্বচ্ছ ঝিলের মতো চোখে একরাশ অবজ্ঞা। তিনি ফের একটা ছোট্ট হাই তুলে বললেন, "আচ্ছা।"

তারপর গঙ্গা-ভল্গা দিয়ে যে কত জল বয়ে গেল তার ঠিক নেই ইতিমধ্যেই ট্র্যাফিক ডিপার্টমেন্টকে অ্যালার্ট করে দেওয়া হয়েছে। তারা দুটি বেওয়ারিশ গাড়ি পেয়েছে যেগুলোর সঙ্গে সর্বনাশিনীর ভিকটিমদের গাড়ির লক্ষণ হুবহু মিলে যায়। সব গাড়িগুলোকেই মধ্যরাত্রে পাওয়া গিয়েছে। এবং তাদের চারটে চাকাই যথারীতি পাংচারড! গাড়িগুলো পাওয়ার খবর পেতেই ফরেনসিক টিম তৎক্ষণাৎ ছুটেছিল। অবশ্য পরীক্ষা করে কিছুই পায়নি। অর্ণব আর পবিত্র আশঙ্কায় কাঁটা হয়ে ভাবছিল, এই বুঝি আরও

একখানা আর.আই.পি পোস্ট পড়ল! সাইবার টিম সর্বনাশিনীর প্রোফাইলের ওপর থেকে একমুহূর্তের জন্যও নজর সরাচ্ছে না। কে জানে কখন ফের গড়বে সেই সর্বনেশে ডেথ ফোরকাস্ট! ভগবানই জানেন, কার ওপরে এবার সর্বনাশ ঘনিয়ে আসছে! টিক টিক করে ঘড়ির সেকেন্ডের কাঁটা সরছে। আর সি.আই.ডি অফিসারদের হৃৎপিণ্ডও তার তালে তালে লাফাচ্ছে। এই বুঝি এল... হয়তো এসেই পড়ল সেই অমোঘ পোস্ট। সেই ভয়ানক শব্দগুচ্ছ...'আর.আই.পি...।"

তবে শেষপর্যন্ত সেই সর্বনেশে পোস্ট পড়েনি। উলটে দুটি সন্দেহজনক গাড়ির মালিকেরা নিজেরাই গাড়ি ক্লেম করে ফেরত নিয়ে গিয়েছেন। গোয়েন্দা দফতর সাময়িক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছে। যাক, পাংচারড গাড়ির মালিকেরা নিজেরাই পাংচার হননি! যে সাদা বোলেরোতে লাশ ডাম্পড হয়েছিল, আর.টি.ও অফিসের মাধ্যমে জানা গিয়েছে যে সেই গাড়িটি চোরাই।

শিনা জয়সওয়ালকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। একেবারেই রুটিন প্রশ্ন । উত্তরও যথেষ্ট সন্তোষজনক। শ্বশুরের মৃত্যুতে একটুও দুঃখিত নয়। রাধিকা জয়সওয়ালের সঙ্গে তাঁর অবৈধ সম্পর্ক ছিল সে কথা শিনা জানে। ডঃ বিজয় জয়সওয়াল সম্পর্কে যথেষ্ট বিরক্তি প্রকাশ করল সে। তাঁর স্বভাব যে মোটেই সুবিধের ছিল না সেটা প্রকাশ করতেও দ্বিধা করল না।

সন্দিগ্ধদের প্রত্যেকেই নিজের স্বহস্তলিখিত জবানবন্দী দিয়েছে। সেগুলো ভালো করে দেখে নিয়ে অর্ণব অধিরাজকে দিয়ে দিয়েছে। জবানবন্দীতে দেখার বিশেষ কিছু নেই। সবাই মুখে যা বলেছেন, তাই লিখেছেন। ব্যতিক্রম শুধু রিয়া বাজাজ, অহল্যা জয়সওয়াল। রিয়া কিছু লেখার অবস্থাতেই নেই। তার জবানবন্দী অহনাই লিখেছেন। সে নীচে সই করেছে। অহল্যা জয়সওয়াল মুখে যা বলেছিলেন, তাঁর উলটোটাই লিখেছেন। তিনি জবানবন্দীতে স্বীকার করেছেন যে তাঁর স্বামী সত্যিই মদ্যপ ও লম্পট ছিলেন। বোকার মতো ভ্রান্তিবশত তিনি ইনভেস্টিগেশনে যে বাধা সৃষ্টি করেছিলেন, তার জন্য আন্তরিক ক্ষমাপ্রার্থী।

ডঃ জয়সওয়ালের মৃত্যুটাকে আটকানো যায়নি বলে এবার মিডিয়া পুলিসকে ছেড়ে সি.আই.ডির চোদ্দ গুষ্টির তুষ্টি করতে শুরু করেছে। ব্যুরোর সামনে ভিড় করে সোশ্যাল

অ্যাক্টিভিস্টরা হল্লা করতে শুরু করেছেন। তাদের সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে পুলিস। অনেকে সি.বি.আই তদন্তের দাবি করছেন। সর্বনাশিনীকে অনেকেই আবার 'সমাজসেবিকা' তকমা দিয়ে দিয়েছেন। নিউজ চ্যানেলগুলো রীতিমতো সমীক্ষা করে দাবি করছে যে তার প্রকোপে অবৈধ প্রেম, তথা পরকীয়া করতে ভয় পাচ্ছেন পুরুষেরা! চ্যানেলে চ্যানেলে সর্বনাশিনীকে নিয়ে চলছে মনোবিদদের অ্যানালিসিস। এ.ডি.জি শিশির সেনকে প্রশ্নের মুখে পড়তে হচ্ছে। তাঁর অবস্থাও খুব ভালো নয়। একদিকে ওপরমহলের চাপ, অন্যদিকে আমজনতার ভোট সর্বনাশিনীর দিকেই। অপর পক্ষে তাঁর সবচেয়ে শক্তিশালী ঘোড়াটি জখম ! সব দিক দিয়েই পরিস্থিতি উত্তেজনার চরমবিন্দুতে।

আপাতত অধিরাজকে হসপিটাল থেকে ছেড়ে দিয়েছেন ডাক্তাররা। এখন সে কিছুটা সুস্থ। যদিও পুরোপুরি বিশ্রামে থাকতে হবে। স্মোক করতেও বারণ করেছেন তাঁরা। তারপর থেকেই বোধহয় মুড বিগড়েছে তার। অর্ণব লক্ষ্য করেছে হসপিটালে থাকাকালীনই কেমন যেন গুম মেরে গিয়েছিল অধিরাজ। বেশি কথা বলছিল না। মাঝেমধ্যেই বিরক্ত হয়ে উঠছে। সবসময়ই কেমন যেন তিরিক্ষি মেজাজ! বেচারি আহেলি একদিন খুব সুন্দর একটা বোকে নিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। কথা নেই, বার্তা নেই তাকে দেখেই এমন খেঁকিয়ে উঠল যে স্বয়ং ডঃ চ্যাটার্জীও অবাক! বিস্মিত স্বরে বললেন, তুমি আহেলিকে বকছ! হল কী তোমার?"

অধিরাজ আরও রেগে গিয়ে বলল— "ফুল আনতে কে বলেছে? আমি বলেছি? কোনও দরকার নেই ফুলের।"

"আরে।" তিনি আহেলির মুখের অবস্থা দেখে অধিরাজকে শান্ত করার চেষ্টা করেন, "ও তো ভালোর জন্যই এনেছে। গেট ওয়েল সুন কার্ড দেখছ না? আহেলি, ওটা টেবিলের ওপর রাখো।"

আহেলি মাথা নীচু করে টেবিলের ওপর বোকেটা রাখতেই যাচ্ছিল। তার আগেই যেন আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ হল। অধিরাজ প্রায় গর্জন করেই ওঠে,— "আই সেইড, নো।"

– "রাজা, এটা কোনও বম্ব নয়! তুমি এভাবে রি-অ্যাক্ট করছ কেন? জাস্ট আ গেট ওয়েল সুন উইশ...!"

‘কোনও উইশের দরকার নেই।” তার মাথায় যেন খুন চড়ে গিয়েছে,— “আমি ঠিক আছি। কাউকে আমার ভালো ভাবতে হবে না। আই ডোন্ট বদার... আই ডোন্ট কেয়ার! আউট! আ...উ...ট! ওঃওঃ!”

উত্তেজনা ক্রমশই হিংস্র রূপ ধরছে দেখে ডঃ চ্যাটার্জীই শেষ পর্যন্ত ইশারায় আহেলিকে বেরিয়ে যেতে বললেন। প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে যাওয়ার ফলে ফের শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল অধিরাজের। জখম হওয়া ফুসফুস উত্তেজনা নিতে পারছিল না। ডঃ চ্যাটার্জী ন্যাসাল ক্যানুলাটা লাগিয়ে দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দিলেন।

অর্ণব হাঁ করে দেখছিল অধিরাজকে। কীরকম অদ্ভুত ব্যবহার করছে সে! মেয়েদের ব্যাপারে সে চিরকালই অতি ভদ্র, নম্র। ভীষণ কেয়ারিং। আজ পর্যন্ত কোনও মহিলার প্রতি খারাপ ব্যবহার করতে দেখেনি তাকে। অথচ সে যেভাবে থেকে থেকেই খেপে উঠছে, তা এক কথায় অস্বাভাবিক! সম্পূর্ণ তার স্বভাববিরুদ্ধ। এমনকি সিস্টারদেরও ছাড়ছে না। এক বেচারি নার্স ব্লাডপ্রেশার মাপতে এসেছিল। তাকেও হুট আউট করে দিয়েছে। তার বক্তব্য, ব্লাডপ্রেশার মাপার কোনও দরকার নেই। আমার প্রেশার ঠিক আছে।”

শেষমেষ আর থাকতে না পেরে ডঃ চ্যাটার্জী বলেই ফেললেন, “তোমার হলটা কী! তুমি এরকম পিকিউলিয়ার ব্যবহার করছ কেন? রগচটাশ্রী উপাধি তো আমার পাওয়া উচিত! তুমি আবার অন্যতম দাবিদার হচ্ছ কেন? কী হয়েছে?”

“জানি না... জানি না!” সে মাথার চুল খামচে ধরে, “প্লিজ, লিভ মি অ্যালোন! প্লিজ ডক্!”

বাড়ি ফেরার পরও সে যে খুব স্বাভাবিক হয়েছে তাও বলা যায় না। অর্ণব আর পবিত্র তার বাড়ি বয়ে সমস্ত ইনফর্মেশন দিয়ে আসে। কিন্তু তার মুখের সেই ছেলেমানুষী ঝলমলে হাসিটাকে কেউ যেন কেড়ে নিয়েছে। কেমন যেন বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। অল্পেই বিরক্তি, রাগ, ক্ষোভ! আগে যে লোকটা সবসময়ই কারোর না কারোর লেগপুলিং করতেই ব্যস্ত থাকত, সে যেন ঠাট্টা, ইয়ার্কি, সব ভুলে গিয়েছে! শুধু কাজের কথা ছাড়া আর কিছুই বলে না।

নিজে থেকে কিছু জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে স্রেফ 'হুঁ... হাঁ' আর 'না'! বাড়তি একটি কথাও নেই। অর্ণব পরিবেশটা একটু হাল্কা করার জন্য বলেছিল,

-"আপনি দাড়ি রাখলেও পারেন স্যার। দারুণ লাগছে কিন্তু।" অধিরাজ তার দিকে বিরক্তিমাখা ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বিছানা থেকে নেমে সটান টয়লেটে ঢুকে গেল। মিনিট দশেক পরে যখন বেরোলো তখন তার গালে আর দাড়ি নেই! ক্লিন শেভড্!

ভাবতেই অর্ণবের বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস পড়ে। হল কী লোকটার! এত পরিবর্তন! এ যেন অধিরাজ নয়, অন্য কেউ! চেহারাটা একই, কিন্তু মানুষটা আলাদা। কী হয়েছে তা জিজ্ঞাসা করার সাহস নেই। তাই সে নিজেও ভেতরে ভেতরে কষ্ট পাচ্ছে। কী করলে, কী বললে লোকটা খুশি হবে ভেবে পাচ্ছে না। কেন এমন করছে সে...!"

— "অর্ণব।"

পবিত্র দুমদাম করে পা ফেলে এসে হাজির হয়েছে। তার উত্তেজিত বুটের খটখটানিতে চিন্তাসূত্র ভেঙে গেল অর্ণবের। সে জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে - তাকায়, — "বলুন।"

— "অ্যাডেলিন বাজাজ কয়েক সেকেন্ড আগেই ব্যুরোতে ফোন করেছিলেন। মিঃ আনন্দ বাজাজ আর আধঘণ্টার মধ্যেই কলকাতায় ল্যান্ড করছেন।"

– "কী!"

মুহূর্তের মধ্যেই স্নায়ু, পেশীগুলো টানটান হয়ে ওঠে অর্ণবের। মিঃ আনন্দ বাজাজই সম্ভবত সর্বনাশিনীর শেষ টার্গেট! সুতরাং আধঘণ্টার মধ্যেই শেষ যুদ্ধটা শুরু হবে। একবার ব্যর্থ হয়ে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে। এবার এস্পার কী ওস্পার করতেই হবে। এ.ডি.জি শিশির সেন টিম অধিরাজের ওপরে ভরসা রাখেন বলে এখনও কেসটা তার কাছ থেকে সরিয়ে নেননি। নয়তো সে যখন ইনজিওর্ড হয়ে পড়ল তখনই ওপরমহলে প্রশ্ন উঠেছিল। এ.ডি.জি সেন স্পষ্ট বলেছিলেন, "আমি মনে করি কেসটা হোমিসাইডের যোগ্যতম অফিসারের হাতেই আছে। তাদের হাতে যথেষ্ট ডেটা না থাকা সত্ত্বেও সাধ্যের বাইরে গিয়েই আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল তার টিম। কিন্তু বিজয় জয়সওয়ালকে বাঁচানো যায়নি। এটা দুঃখজনক ঘটনা হলেও বাস্তব এটাই যে তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া গেলেও কিছুতেই বাঁচানো যেত না। ফরেনসিক এক্সপার্ট ডঃ অসীম চ্যাটার্জীর রিপোর্ট অনুযায়ী

আর.আই.পি পোস্ট পড়ার আগে, কিংবা কিছু পরেই ডঃ বিজয় জয়সওয়ালকে অ্যামাটক্সিন-এক্স দেওয়া হয়েছিল এবং অ্যামাটক্সিন-এক্সের কোনও অ্যান্টিডোট নেই। তাই বিজয় জয়সওয়ালের কেসে কিছু করার ছিল না ছেলেদের। যতটা পেরেছে, করেছে। আমি ব্যানার্জীর টিমের ওপরই ভরসা রাখতে রাজি আছি।"

অথচ সেই ভরসাই এখন প্রশ্নের মুখে! আনন্দ বাজাজ আর আধঘণ্টার মধ্যেই এসে পৌঁছবেন! অথচ এখনও কোনও প্রস্তুতি নেই টিম অধিরাজের।

হাতে মাত্র আধঘণ্টা! কে জানে ওদিকে সর্বনাশিনী কী করছে! সে সম্পূর্ণ প্রস্তুতি ছাড়া কোনও কাজ করে না।

অর্ণব প্রায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো লাফিয়ে উঠল, "মানে? উনি এখন ফোন করছেন। আমি পইপই করে বলে এলাম মহিলাকে যে মিঃ বাজাজের ফেরার ডেটটা আগেই যেন ব্যুরোতে ফোন করে জানিয়ে রাখেন! আর তিনি কিনা...!"

- "আধঘণ্টা আগে জানালেন!" পবিত্রর মুখ রাগে, উত্তেজনায় রক্তিম।

- "লিখে নাও অর্ণব— আইদার এই অ্যাডেলিন বাজাজ আমাদের কথা সিরিয়াসলি নেননি। নয়তো স্বামীকে যমের বাড়ি পাঠানোর জন্য অত্যন্ত আগ্রহী!"

"কিন্তু এখন কী করব?"

"রাজাকে ইমিডিয়েটলি ফোন করো... আর..!"

পবিত্র আরও কিছু বলতেই যাচ্ছিল। তার আগেই অর্ণবের ফোন সশব্দে বেজে উঠল । অর্ণব উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে দেখল, সাইবার সেলের বিশ্বজিত ফোন করছে।

"ইয়েস, বিশ্বজিত!"

ওপ্রান্তে বিশ্বজিতের কণ্ঠস্বর উত্তেজনায় কাঁপছে, "পড়েছে স্যার। সর্বনাশিনীর টাইমলাইনটা ইমিডিয়েটলি দেখুন।"

অর্ণব আরেকটি কথাও না বাড়িয়ে দ্রুত হাতে কম্পিউটার অন করল। ফেসবুকে ঢুকে সার্চ মারতেই সর্বনাশিনীর প্রোফাইলটা খুলে গেল। এতবার এই প্রোফাইল ঘেঁটেছে যে খুঁজতে সেকেন্ডের ভগ্নাংশও লাগল না! আর তার টাইমলাইনেই লাল ব্যাকগ্রাউন্ডে জ্বলজ্বল করছে কালো অক্ষরগুলো! "আর.আই.পি মিস্টার এ বাজাজ!"

অর্ণব স্তম্ভিতের মতো পবিত্রর দিকে তাকায় !

(আঠাশ)

বারবার ফোনে ঐ নম্বরটাই ডায়াল করছিল সে। অবশ্যই একটা ফোন থেকে নয়। বিভিন্ন ফোন থেকে সিম পালটে পালটে একটা নম্বরই ডায়াল করছে সে। ফোনটা রিং হতেই ভয় পেয়ে কেটেও দিচ্ছে। সে আদৌ ভয় পাওয়ার লোক নয়। কিন্তু জীবনে এই প্রথম কারোর সঙ্গে কথা বলতে ভয় করছে। বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করছে! একবার তো রিং হতে না হতেই ওপ্রান্তে জাগ্রত হয়েছিল গম্ভীর মোলায়েম কণ্ঠস্বর, – "হ্যালো?"

হৃৎপিণ্ডটা দপদপিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গেই কেটে দিল সে। অদ্ভুত! এ কীরকম অনুভূতি! এত ভয় তার মধ্যে কোথা থেকে এল! একটু কথা বললে কী ক্ষতিই বা হত? কেন এত দ্বিধা! একজন অজ্ঞাত শুভাকাঙ্ক্ষী তো! ফোন করাটা তো ক্রাইম নয়!

সেই ভেবেই ফের ফোন করল সে। এবার ওদিকের কণ্ঠস্বরে বিরক্তি প্রকট,—"হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট? বারবার ফোন করছেন কেন?"

ও চুপ করে ছিল। শুধু তার নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। দু একবার কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল। একটা লজ্জা, একটা সংশয় তার মুখ চেপে ধরছিল। তাই শত চেষ্টাতেও মুখ থেকে একটা শব্দও বেরোল না।

ও প্রান্তে কিছুক্ষণ নীরবতা । ঘন নিঃশ্বাসের শব্দ। তারপর আস্তে আস্তে ভেসে এল একটাই উষ্ণ বাক্য, "আই হেট ইউ!"

লাইনটা কেটে গেল। এবার খিলখিলিয়ে হেসে উঠল নারীটি। এই না হলে তার টাইগার! ঠিক চিনতে পেরেছে! তার কণ্ঠস্বরও শোনেনি। শুধু নিঃশ্বাসের শব্দ শুনেই চিনে নিয়েছে নিজের বাঘিনীকে! মাশাল্লাহ!

মেয়েটা আজ কুচকুচে কালো পোশাক পড়েছে। তার শ্বেতপাথরের মতো সাদা ত্বকের রঙ বুঝি ঝলসে ঝলসে ওঠে। চুলটা চুড়ো করে। বেঁধেছে। গলায় একটা সোনার চেন চিকচিকিয়ে উঠছে। কানের সাবেকি হীরের দুলের ঝলমলে দ্যুতি! এই চেনটা আর হীরের দুল তার মায়ের। সে একটা শ্বাস টানল। এই চেন আর হীরের দুলে তার মায়ের স্পর্শ রয়েছে। পরলেই মনে হয় গ্রীবার ওপরে মায়ের সুগন্ধী নরম স্পর্শ এসে পড়ল। কানের

হীরেগুলো যেন মায়ের সস্নেহ হাসির মতোই ঝিকিমিকি প্রভা ছড়াচ্ছে। মা এমন করেই চুড়ো করে চুল বাধতেন একসময়! তারপর আর বাঁধেননি। বাঁধার প্রয়োজন ছিল না! আর তার কোনও প্রসাধন, কোনও যত্নের দরকার ছিল না।

মেয়েটার চটুল দৃষ্টিতে আচমকা সন্ধ্যার মতো বিষণ্নতা নেমে আসে। মনে পড়ে যায় তার মায়ের কুচকুচে কালো মুখ! সাদা ঝকঝকে চোখ, কোঁকড়া কোঁকড়া চুলের গুচ্ছ, মোটা নাক, মোটা ঠোঁট! উঁচু কপালে স্বামীর কল্যাণ কামনায় ডগডগে সিঁদুর। কালো হাতে সাদা শাঁখা ঝকঝক করত...! কেন? কার জন্য? যে লোকটা চিরদিনই তাকে পথের বেওয়ারিশ কুকুর ছাড়া আর কিছুই ভাবল না, তার জন্য? যে মানুষটা বেঁচে থাকতেই তাঁর অস্তিত্ব মুছে দিল তার কল্যাণ কামনা করে কী হবে? কী পেলেন মা? শুধু অপমান! এক নারীর নয়, এক মানুষের অপমান! যেমন মানুষ খাবার খেয়ে উচ্ছিষ্ট শালপাতা বা থার্মোকলের থালা ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, তেমনই তাঁকেও ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল লোকটা। যে নারী তাঁর প্রিয়তম পুরুষকে ভালোবেসে সব কিছু দিয়েছিল— অর্থ, কায়িক শ্রম, নিজস্ব সত্ত্বা, দেহ-মন, সংসার, সন্তান, সব কিছু দিয়ে পরিপূর্ণ করে তুলেছিল, সেই মানবীকেই ঘরের এককোণায় অপ্রয়োজনীয় আবর্জনার মতো ফেলে রেখেছিল সেই দানব! যে বিছানা, যে স্বামীর সহবাসের ওপর একমাত্র তাঁরই একান্ত অধিকার ছিল, সেই অধিকারকেই দুমড়ে মুচড়ে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছিল। সেই নারী নীরবে ব্যথিত দৃষ্টিতে প্রত্যেক রাতে দেখে গিয়েছেন। তাঁর মাতাল স্বামীর বক্ষলগ্না হয়ে আছে কোনও এক অপরূপ সুন্দরী! যে শয্যা কোনওদিন তাঁর জন্য মধুর স্মৃতি বয়ে এনেছিল, সেই শয্যায় দাপাচ্ছে দানবীয় রিরংসা! কী যন্ত্রণা...! কী অপমান...! কী অভিশপ্ত দৃশ্য...! বুকের ভেতরে চরম একটা যন্ত্রণা ঘোঁটু পাকিয়ে উঠল। মেয়েটি অতিকষ্টে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। তার দু চোখের কোণ রক্তাভ! যেন রক্ত ফেটে পড়বে।

রক্ত! রক্তই তো ছিল না মানুষটার গায়ে। এখনও চোখ বুজলে সেই দৃশ্যটা মনে পড়ে! মা পড়ে আছে মেঝের ওপর। চতুর্দিকে যেন রক্তের বন্যা বইছে! সাদা মেঝের ওপরে তাজা টকটকে লাল রক্তের ধারা! দশ বছরের শিশু ভয় পেয়ে দৌড়ে গিয়েছিল সেই

লোকটার কাছে। বলেছিল— "মা পড়ে গেছে! রক্ত... কত রক্ত! এখনই ডাক্তার ডাকো...!"

লোকটা তখন ঐ মেয়েটার সঙ্গে দাবা খেলছিল। টেবিলের পাশে রাখা মদের গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল, "গেট আউট!"

দশ বছরের মেয়েটা কী করবে বুঝে পায়নি। অসহায়ভাবে একবার মায়ের কাছে দৌড়চ্ছিল। আরেকবার লোকটার কাছে। লোকটা শেষমেষ তার মুখের ওপরই দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। সে আপ্রাণ দরজায় করাঘাত করেছিল। কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল, "প্লিজ, সেভ হার! মা চোখ খুলছে না! প্লিজ, ওপন দ্য ডোর!"

কিন্তু দরজা আর খোলেনি। সে কিংকর্তব্যবিমূঢ়! ছোট ছোট হাত দিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছিল। ডাকছিল, "মা... মা!" মা সাড়া দেননি। এক ভীষণ অনিশ্চয়তায়, প্রচণ্ড ভয়ে, নিরাপত্তাহীনতায় ক্রমাগত ডুবে যাচ্ছিল সে। শেষপর্যন্ত বাইরে দৌড়ে গিয়ে চিৎকার করে কেঁদে উঠেছিল, "প্লিজ হেল্প! সেভ মাই মাদার! প্লিজ... হেল্প! হে—ল্প!"

প্রতিবেশীরা তার আর্ত চিৎকার আর কান্না শুনে তাড়াতাড়ি ছুটে এসেছিল। আর তারপর...!

তার চোখের সামনে আবার আরেকটা দৃশ্য ভেসে ওঠে। হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আছেন মা। ফ্যাকাশে ঠোঁট! ঐ মুহূর্তটায় মনে হয়েছিল মাকে আগের থেকে অনেক কম কালো দেখাচ্ছে। ডাক্তারদের গম্ভীর মুখ। মাউকে বলছিলেন সাদা অ্যাপ্রন পরা ডাক্তার, "ব্লিডিং থামানো যাচ্ছে না। এমনিতেই অ্যানিমিয়া পেশেন্ট। প্রেগন্যান্সির সময় আপনারা লক্ষ্য করেননি সেটা? ঠিকমতো যত্ন নেওয়াই হয়নি। আধখানা আগেই মরে গিয়েছিলেন! এখন আর কিছু করার নেই।"

মাউ কী বলবে বুঝতে পারেনি। মুখে কাপড় চাপা দিয়ে কাঁদছিল!

ডাক্তারবাবু বললেন – "বেবিকে বাঁচাতে পেরেছি। কিন্তু মাকে পারব না। ইন্টারনাল ব্লিডিঙের ফলে আস্তে আস্তে শরীরের সব রক্ত বেরিয়ে যাচ্ছে। শেষবারের মতো যদি কিছু বলার থাকে....।"

কথাটা শেষ না করেই তিনি চলে গেলেন। সে অবাক হয়ে দেখল, মা তাকে ইশারায় কাছে ডাকছেন। মেয়েটা গিয়ে তাঁর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল,— "মা! মা!"

মা হাসলেন। সে হাসি বর্ণনা করা যায় না! সে হাসির মধ্যে স্নেহ ছিল, যন্ত্রণা ছিল, কান্না ছিল, প্রিয় মানুষকে হারানোর ভয়ও ছিল! তিনি খুব শান্তস্বরে বললেন, "মাউকে একদম বিরক্ত করবে না। ড্যাডকেও নয়। তোমার একটা বোন হয়েছে। দেখেছ তুমি?"

সে কোনও কথা না বলে মাকে দুহাতে আঁকড়ে ধরে বলে চলেছে, "মা...মা!" আর কিছু এ পৃথিবীতে সত্য নয়। আর কাউকে এ জীবনে তার দরকার নেই। অবুঝ শৈশব শুধু নিজের মাকে বেঁধে রাখতে চায়। সে হাতের বন্ধন এতটাই দৃঢ় যে সহজে ছাড়ানো যায় না! সে বন্ধনের সামনে হয়তো মৃত্যুও অসহায়! মেয়ের সে আলিঙ্গন ছাড়িয়ে মাকে টেনে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা মরণেরও নেই।

মা তার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললেন,"ভালো থাকিস মা। বোনের খেয়াল রাখিস।"

বলতে বলতেই ক্লান্তিতে চোখ বুজলেন। সেই চোখ আর খোলেনি! মৃত্যু আসতে সময় লেগেছিল। রক্তের সঙ্গে তিলে তিলে খসে পড়েছিল আয়ু। মা সাদা হয়ে গিয়েছিলেন। একদম সাদা! এখন মনে হয় মা কি সত্যিই অহল্যা ছিলেন! পাথরের অভিশপ্ত নারী!

"আমি তোমার মতো হব না মা। আর কাউকে হতেও দেব না!"

মেয়েটা চোখের জল মুছে আয়নার দিকে তাকায়! সেখানে তার পিছনেই ঠিক সেই লোকটার প্রতিবিম্ব! সে মধুর হাসল!

এই লোকটাই শুধু বাকি আছে! শুধু ওকেই শেষ করতে হবে। তারপর...!

(উনত্রিশ)

অধিরাজের ঘরে পা রাখতেই ডঃ চ্যাটার্জী অস্বস্তি বোধ করলেন। ঘরের ভেতরটা পুরো অন্ধকার। এখন সকাল সাতটা বেজে পাঁচ মিনিট। বাইরে চতুর্দিকে সূর্যালোক ঝলমল করছে। অথচ এ ঘরে যেন অনন্ত রাত্রি। যেন এখানে কখনই সূর্যোদয় হয়নি, হবে না! প্রথমে কিছুই দেখা যায় না! তিনি একটু ভুরু কুঁচকে অন্ধকারটাকে চোখে সইয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন। একটু মন দিয়ে দেখতেই একটা মানুষের দীর্ঘ সিলুয়েট ধরা পড়ল। বিছানায় চুপ করে শুয়ে আছে সে।

ডঃ চ্যাটার্জী কোনও কথা না বলেই হাত বাড়িয়ে সুইচবোর্ডের আলোর সুইচটা টিপে দিলেন । দপ্ করে আলোটা জ্বলে উঠতেই একটা বিরক্তিমিশ্রিত মৃদু স্বর ভেসে এল, "কে?"

—"আমি।" তিনি বক্তার কোনওরকম অনুমতি না নিয়েই ধপাস্ করে বিছানার ওপরই বসে পড়লেন, "মহম্মদ পর্বতের কাছে না এলে পর্বতকেই মহম্মদের কাছে আসতে হয়। এই যে তোমার অহল্যা জয়সওয়ালের চেসবোর্ডের ফিঙ্গারপ্রিন্ট রিপোর্ট! তোমার ল্যাজেরা ব্যস্ত বলে আমাকেই আসতে হল।"

– "এত দেরিতে?"

অধিরাজ এবার উঠে বসেছে। সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে দিল, "দেখি।"

এই ফাঁকে ডঃ চ্যাটার্জী তার হুলিয়াটা দেখে নিলেন। এমনিতে ওপর থেকে কিছু বোঝার উপায় নেই। হসপিটালে থাকাকালীন চেহারাটা একটু ভেঙেছিল। এখন আবার শুধরে গিয়েছে। সাদা গাউনে যথারীতি চিরপরিচিত লেডিকিলার! কিন্তু তারচোখ মুখের চিন্তিত ভাবটা নজর এড়াল না। কোনও একটা চিন্তা তাকে ভেতর থেকে কুরে কুরে খাচ্ছে। তা দেখলেই বোঝা যায়।

"কালো ঘুঁটিতে ডঃ বিজয় জয়সওয়াল, গৌতম, অহল্যা, শিনা, রাধিকা এবং সুপর্ণার আঙুলের ছাপ। সাদা ঘুঁটিতে গৌতম, রাধিকা, বিজয়, সুপর্ণা!" সে ফরেনসিক রিপোর্টটা দেখতে দেখতেই বলল, "গোটা ফ্যামিলিটাই দেখছি দাবা খেলে!"

"হুম।"

ডঃ চ্যাটার্জী সবিস্ময়ে দেখলেন অধিরাজের বেডরুমের চতুর্দিকে বিভিন্ন রঙের গোলাপের বোকের ছড়াছড়ি! কোনওটা শুকিয়ে গিয়েছে, কোনওটা সামান্য ঝরে পড়েছে, কোনওটা আবার একদম তাজা! প্রত্যেকটাতেই 'গেট ওয়েল সুন' স্টিকার সাঁটা!

"এ কী রাজা! তুমি ফ্লাওয়ার শপ খুলছ নাকি?" সবিস্ময়ে বলেন তিনি— "তোমার ঘরটাকে এরকম গুলবাগ বানাল কে?"

"কে জানে!" অধিরাজের মুখে স্পষ্ট বিরক্তি, "কোনও এক মুন্নাভাই আমাকে লাকি সিং ভেবে গেট ওয়েল সুন উইশ করছেন হয়তো!"

"সে কী! কে সে!"

— "জানি না।" সে ঠোঁট উলটায়, "রোজ ঘুম থেকে উঠেই দেখি একটি করে গোলাপের বোকে আমার ঠিক মাথার কাছে বসে রয়েছে। কে রাখে, কখন রাখে ভগাই জানে! মাকে জিজ্ঞাসা করলেই মুচকি হেসে বলেন, 'গোয়েন্দাটা কে? আমি না তুই? তুই না জানলে আমি জানব কী করে?' পিকিউলিয়ার ব্যাপার স্যাপার!"

"অর্ণব বা পবিত্র নয় তো?"

– "ওরা কেউ হলে আমার হাতেই দিত। তাছাড়া কার্ডের নীচে নামও "লেখা থাকত।" সে আবার অধৈর্য হয়ে উঠেছে, "যত রাজ্যের ইররেসপন্সিবল পাবলিক। কার্ডের নীচে নাম লেখে না কেন? এভাবে পুরো বাগানটাকেই ইনস্টলমেন্টে আমার ঘরে ঢোকানোর মানেটা কী? প্রথম প্রথম ফেলে দিতাম! এখন হালই ছেড়ে দিয়েছি! আই অ্যাম সিক্ অব্ ইট!"

ডঃ চ্যাটার্জী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন তার দিকে। যেভাবে সামান্য ফুলের বোকে নিয়ে সে উত্তেজিত হয়ে উঠছে, সেটা মোটেই ভালো লক্ষণ নয়। উত্তেজনার কারণ আর যাই হোক, ফুলের তোড়া হতে পারে না। তিনি কিছুক্ষণ সময় দিলেন তাকে। কিছুক্ষণ আপনমনেই বকবক করে ফের শান্ত হল ঠিকই, কিন্তু মুখের সেই প্রশান্ত ভাবটা ফিরে এল না। অদ্ভুত তিরিক্ষি মেজাজ। চোখে মুখে বিক্ষিপ্তভাব। অর্ণব আর পবিত্র আগেই তাঁকে বলেছিল। আহেলির সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতে তিনি স্বচক্ষেই দেখেছেন। এ অধিরাজ আর যেই

হোক, তাঁর চিরপরিচিত 'পা-জি, বদমাশ ছোঁড়া' নয়। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি সপাটে বললেন, "নিজের ডান কাঁধটা দেখেছিলে?"

অধিরাজের চোখ মুখ ইস্পাত কঠিন হয়ে ওঠে। উত্তেজনার পারদও হট্ করে বেড়ে গেল। সে চাপা অথচ উত্তেজিত স্বরে বলল, "দেখেছি। দ্যাট উইচ্ ইজ্ প্লেয়িং উইথ মি! আমায় 'মক' করছে ও! হাউ ডেয়ার ইজ শি...!"

ডঃ চ্যাটার্জী বুঝলেন ঢিলটা সঠিক জায়গাতেই লেগেছে! তিনি আস্তে আস্তে বললেন, "রাজা, ইট্স জাস্ট আ কিস্!"

এইবার বিস্ফোরণটা হল! যে জ্বালা এতদিন সে বুকের মধ্যে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল, এবার সেই অপমানের জ্বালা প্রচণ্ড উত্তেজনার হল্কা নিয়ে প্রকাশ্যে এল, "নো! ইটস্ অ্যান ইনসাল্ট টু মাই এবিলিটি! ঐ ডাইনিটা প্রকাশ্যে আমায় জোকার বানিয়ে দিল! ও দেখিয়ে দিল, আমি একটা লুজার! ওকে ধরবার ন্যূনতম যোগ্যতাও আমার নেই। আমি ওকেই চেজ করছিলাম! ও আমাকে বুঝিয়ে দিল – 'অফিসার ব্যানার্জী, তুমি একটি গাড্ডু! তোমার নাকের সামনে দিয়ে এই দ্যাখো আমি বেড়িয়ে গেলাম। এমনকী তোমায় নিয়ে সবকিছু করার ক্ষমতা আমার ছিল! স্রেফ একটা লাভ বাইট দিয়ে ছেড়ে দিয়েছি এই তোমার চোদ্দপুরুষের ভাগ্যি! নয়তো যদি আরও পাঁচটা গুলি করতাম তাহলেই বা তুমি কী করতে বীরপুঙ্গব! আমার কোন কেশকর্তনটি করতে!' ডক, এটাই ও বোঝাতে চেয়েছিল। এবং বোঝাতে পেরেছে! ও সবার সামনে আমাকে ইনসাল্টই করতে চেয়েছিল।" বলতে বলতেই সে দুহাতে মুখ ঢেকেছে,

"ডিপার্টমেন্টের সবাই দেখেছে, আপনি দেখেছেন, এডিজি শিশির সেন- অর্ণব-পবিত্র-আহেলি... কারোর জানতে বাকি নেই! সবাই নিশ্চয়ই আমাকে নিয়ে গসিপ করছে। সবাই করুণা করছে, আমার বাবা-মা...ওঃ! আই হেট হার! আই হেট হার! ড্যা-ম ই-ট!"

প্রচণ্ড রাগে হাতের কাছের গোলাপের বোকেটাকে একটা আছাড় মারল অধিরাজ! ডঃ চ্যাটার্জী স্তম্ভিত! এত রাগতে তাকে আগে কখনও দেখেননি। তিনি সুযোগ বুঝে ফের একটু ফোড়ন কাটলেন, "হোয়াট অ্যাবাউট মানসী জয়সওয়াল! ওঁকে ঘৃণা হয়নি? উনি তোমাকে ছেড়েছেন?"

"মানসী জয়সওয়ালের সঙ্গে আমার কিছু হয়ইনি!" উত্তেজনার চরমমুহূর্তে বলেই ফেলল সে, "উনি যা চেয়েছিলেন, শুধু সেটুকুই পেয়েছেন। জাস্ট ওয়ান কিস্! সেখানেই গল্প শেষ! আমার সন্দেহ হয়েছিল যে যিনি ওরকম ধুরন্ধর বিজনেস-ওম্যান, তিনি এত গর্দভের মতো কথা বলেন কী করে! মহিলা সুন্দরী। ন্যাকামি করে ছলে, বলে, কৌশলে যে কোনও পুরুষকে ক্যাপচার করতে পারেন! আপনার অ্যারোমাথেরাপির লিড ছিল। মানসী স্কলার বোটানিস্টও। দাবাও খেলতে জানেন। তার ওপর ওঁর হাতে কাঁকড়াবিছের ট্যাটু। স্করপিয়ন সেক্স, স্ট্রেঙ্গথ, আর ডমিনেটিং নেচারের প্রতীক। সর্বনাশিনীর প্রোফাইলের সঙ্গে যথেষ্টই মিল আছে। ইন দ্যাট কেস্, সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল যে ওপরের বোকা বোকা ভাবটা নেহাতই ওঁর ক্যামোফ্লেজ! সেজন্যই আমি রিস্কটা নিয়েছিলাম!"

"আর উনিও সুযোগ নিলেন।"

- "ধুত্তোর!" অসম্ভব বিরক্তিতে সে মাথা ঝাঁকায়, "কিছুই সুযোগ নেননি উনি। ভদ্রমহিলা একটাই কিস চেয়েছিলেন। ওনলি ওয়ান! সেটা উনি পেয়েছেন। অবশ্য তারপর ওকে থামাতে আমার ঘাম ছুটে গিয়েছিল। কিন্তু বুঝিয়ে সুঝিয়ে থামিয়েছি। ওঁকে বোঝাতে পেরেছি যে আমার ওঁর প্রতি করুণা ছাড়া আর কোনও অনুভূতি নেই। আমি জাস্ট ওঁকে সহ্য করছি মাত্র। এভাবে কিছু হয় না। তাছাড়া উর্দিতে না থাকলেও আমি নিজের ডিউটিই করছি। আই মাস্ট অ্যাডমিট, শি ইজ ভেরি প্রোফেশনাল! একটু হার্ট হলেও বাকি ম্যাসাজটা ঠিকঠাকই করেছেন।"

– "এটাও তো একটা কিসই!" ডঃ চ্যাটার্জী তাকে শান্ত করার চেষ্টা করেন,—"ভুলে যাও না! সুন্দরীরা চুমু খেলে তোমার খুশি হওয়া উচিত! মেয়েরা তোমার মতো একটা সোমত্ত ছেলেকে চুমু খাবে না তো কি আমার টাকে খাবে?"

"আমার ইচ্ছের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে? টোট্যাল এম্ব্যারাসিং! জাস্ট... জাস্ট...!" সে উত্তেজনার চোটে কথাই হারিয়ে ফেলেছে। যেন শব্দ খুঁজে পাচ্ছে না!

-"ইন দ্যাট কেস...।" ডঃ চ্যাটার্জী দীর্ঘশ্বাস ফেলে নীচুস্বরে বললেন,

– "তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে আরেকটি কাজ সে করেছে।" অধিরাজ স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে থাকে। ডঃ চ্যাটার্জী অত্যন্ত সংক্ষেপে সি.পি.আর এবং স্টবেরি লিপ বামের ঘটনাটি বিবৃত

করলেন। সে প্রথমে বিহ্বল হয়ে যায়। মুখে কোনও কথা নেই। যেন বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। এই মেয়েটা এ কী জাতীয় শত্রুতা শুরু করেছে! খেলা তো এতদিন বাইরেই চলছিল। হঠাৎ এরকম বিলো দ্য বেল্ট অ্যাটাকের কারণ! সে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে ফের বিড়বিড় করে গোঁয়ারের মতো বলল,

—“আই হেট হার! আ-ই জা-স্ট হে-ট হা- র!” ডঃ চ্যাটার্জী তার মুখের অবস্থা দেখে মনে মনে হাসলেন। ছেলেটা অত্যন্ত বুদ্ধিমান কিন্তু কিছু কিছু ব্যাপারে একেবারে রামছাগল! দোষও নেই। সর্বক্ষণ অপরাধীদের ঠ্যাঙাতে ঠ্যাঙাতে কিছু সূক্ষ্ম অনুভূতি বোঝার সুযোগ পায়নি। নয়তো বুঝতে পারত, ঘৃণাটাও একরকমের অবসেশন! কাউকে ঘৃণা করা মানে অবচেতনে তাকে গুরুত্ব দিয়ে ফেলা। তার প্রতি অন্যভাবে আকৃষ্ট হওয়াও বটে! অনেক সময়ে ভালোবাসার চেয়েও বেশি শক্তিশালী হয়ে দাঁড়ায় ঘৃণা! এটাই বাস্তব! নেগেটিভ সবসময়ই পজিটিভকে টানবে! এটাই বিজ্ঞানের নিয়ম।

“কিস্ কিস্ নে কিস্ কিস্ কো কিস্ জগাহ্ পে কিস্ কিয়া/ ম্যায় উয়ো বদনসিব হুঁ, যো হর কিস্ কো মিস্ কিয়া!” তিনি হেসে উঠে বললেন, “তুমি একটি গাধা! এইজন্যই সবার ওপরে মেজাজ দেখিয়ে বেড়াচ্ছ! কেউ কিচ্ছু জানে না। সবাই তোমার অবস্থা দেখে এতই ব্যস্ত ছিল যে ওদিকে তাকায়নি। শুধু আমি আর অর্ণব জানি। তাছাড়া বেচারি আহেলি কী দোষ করেছে? তাকে ওরকমভাবে সবার সামনে ইনসাল্ট করার মানে কী? সর্বনাশিনী তোমায় ইনসাল্ট করেছে বলে তুমিও সবাইকে ইনসাল্ট করে বেড়াবে? কাম অন, গ্রো আপ বয়!” -

অধিরাজের উত্তেজনা অনেকটাই প্রশমিত হয়েছে। হয়তো এই বিস্ফোরণটা তার জন্যও অত্যন্ত জরুরি ছিল। সে ফের বিছানায় আধশোয়া হয়ে বসেছে। একটু দম নিয়ে এবার অনেকটাই স্বাভাবিক এবং তরল কণ্ঠে বলল, “আপনি উর্দু শিখলেন কবে? মিস্ অপোগন্ড শেখাচ্ছেন নাকি?”

ফরেনসিক এক্সপার্ট কৃত্রিম রাগ ফলালেন, “ওঁর নাম মোটেই অপোগন্ড নয়...!”

“জানি!” অধিরাজ সদ্য আগত ফুলের বোকেটা এগিয়ে দিয়ে বলল, —“কার্ডটা একবার শুঁকে দেখুন। নিজেই বুঝে যাবেন এই অজ্ঞাত মুন্না ভাইটি কে!”

কার্‌ডটা শুঁকেই ডঃ চ্যাটার্জীর চক্ষু চড়কগাছ! ‘গেট ওয়েল সুন' কার্ডের গা থেকে একটি বিশেষ অ্যান্টিব্যাক্টিরিয়াল হ্যান্ড স্যানিটাইজারের কড়া গন্ধ বেরোচ্ছে! এই গন্ধ তাঁর অতি পরিচিত! কারণ তাঁর ল্যাবেই রাখা আছে এই বিশেষ ধরণের হ্যান্ড স্যানিটাইজার! তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, “মাই গড! এ তো মুন্নিবেন ! তাই ভাবছি মহারানি রোজ সকালে আধঘণ্টা লেট করে ল্যাবে ঢুকছেন কেন! দাঁড়াও, আজই কড়কে দিচ্ছি।”

-“দরকার নেই।” অনেকদিন পর স্মিত হাসল সে, “বরং আমারই ওকে একটা ট্রিট দেওয়া উচিত! ওর সঙ্গে একটু অভদ্রতা করে ফেলেছি। উলটে ও এবার অনেক সার্ভিস দিয়েছে।”

ডঃ চ্যাটার্জী মৃদু হাসলেন। তাও ভালো! ছেলের সুবুদ্ধি হয়েছে! এখন ভালোয় ভালোয় মাথা ঠান্ডা হলেই বাঁচা যায়।

ইতিমধ্যেই অধিরাজের মোবাইলে ‘দেশ’ রাগ বেজে উঠল। সে মোবাইলের দিকে তাকিয়েই উত্তেজিত হয়ে উঠে বসেছে, “অর্ণব ফোন করছে! এক মিনিট ডক। মনে হচ্ছে কোনও খবর আছে।”

সে ফোন রিসিভ করতে না করতেই ওপ্রান্ত থেকে অর্ণবের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল, “স্যার! আবার আর.আই.পি পোস্ট পড়েছে। এ বাজাজ! ওদিকে ঠিক আধঘণ্টা পরেই আনন্দ বাজাজ কলকাতায় ল্যান্ড করছেন। কী করব?”

“ফাইন।”

অধিরাজ বলল, “মিস্টার আনন্দ বাজাজকে তাঁর ইচ্ছেমতোই ফিরতে দাও। কারণ এই আর.আই.পি পোস্টটা ওঁর জন্য নয়। এটাও বিজয় জয়সওয়ালের মতোই আমাদের মিস্‌লিড করার একটা চেষ্টা মাত্র। ‘এ’ ফর আনন্দ নয়, অ্যান্ড্রু বাজাজ! এবং নিশ্চিন্ত থাকো তিনি অ্যাডেলিন বাজাজের স্বামী কোনোমতেই নন।”

-“অ্যান্ড্রু বাজাজ!” অর্ণব প্রায় হাহাকার করে ওঠে, “এই আধঘণ্টার মধ্যে তাঁকে খুঁজব কী করে?”

“খুঁজতে হবে না। সে আত্মবিশ্বাসী, আমি জানি তিনি এখন কোথায় আছেন!”

ওদিকে অর্ণবের কী অবস্থা হল তা জানা নেই। কিন্তু ডঃ চ্যাটার্জীর চোয়াল এতটাই ঝুলে পড়ল যে তার মধ্যে আস্ত একটা প্রমাণ সাইজের কচ্ছপ ঢুকিয়ে দেওয়া যায়।

– “তুমি ইমিডিয়েটলি ডঃ বিজয় জয়সওয়ালদের বাড়িতে ফোন করে। খোঁজ নাও এই মুহূর্তে বাড়িতে কে কে উপস্থিত আছে। আমি লাইনে আছি।”

অধিরাজের ফোনটা মিনিট খানেকের জন্য হোল্ডে চলে গেল। এক মহিলা কণ্ঠস্বর কিছুক্ষণ ঘ্যানঘ্যান করে গেলেন। তারপরই ফের শোনা গেল অর্ণবের কণ্ঠস্বর, “স্যার, ডঃ বিজয় জয়সওয়ালের বাড়িতে শুধু অহল্যা জয়সওয়ালই আছেন। আর কেউ নেই।”

“চমৎকার! এবার তুমি তাড়াতাড়ি মিস ঘোষকে নিয়ে মেরিলিন প্ল্যাটিনামে পৌঁছে যাও। একদম সোজা রিয়া বাজাজদের ফ্ল্যাটে গিয়ে উপস্থিত হবে। কাউকে কিছু বলবে না। আশা করি এখনও ওদের কারোর ব্রেকফাস্ট হয়নি। অহনা ভট্টাচার্য আর মানসী জয়সওয়ালকে ফোনে চেতিয়ে দাও, যাতে ওরা ব্রেকফাস্ট না করেন। আর মানসী এবং জুয়েলার বিজয় জয়সওয়ালকে উপস্থিত থাকতে বলবে। নিজে কিছু খাবে না, ওদেরও কিছু খেতে দেবে না। আই রিপিট, কিছু খেতে দেবে না। একগ্লাস জলও না! আমিও ডককে নিয়ে আসছি। হাতে বিশেষ সময় নেই। এই খুনটাকে আটকাতেই হবে অর্ণব। আর এবার সে আমাদের একটুও সময় দেবে না! ধারে কাছে পবিত্র আছে?”

“হ্যাঁ স্যার! উনি পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন।”

— “ফ্যান্টাস্টিক। ফোনটা ওকে দাও তো।”

কয়েক সেকেন্ডের বিরতি। ফোন হস্তান্তরিত হল।

“হ্যাঁ রাজা।”

পবিত্র’র কণ্ঠস্বর ভেসে আসতেই অধিরাজ বলল, “তোমার কাছে উমঙ্গ

অ্যান্ড্রু বাজাজের বাড়ির ঠিকানা আছে না?”

-“হ্যাঁ।” পবিত্র একটু কনফিউজড, “কিন্তু সেখানে তো এখন কেউ থাকে না কতগুলো মাকড়সা আর টিকটিকি ছাড়া! ওঁর দ্বিতীয় স্ত্রী সিঙ্গাপুরে থাকেন। আর রিয়া বাজাজ...।”

"উঁহু উঁহু! কারোর থাকার দরকার নেই।" সে মাথা ঝাঁকায়,

"কাউকে না পেলেও অন্তত কিছু তুমি ওখানে পাবে। ল্যাপটপ, ট্যাব বা এমনকিছু যা থেকে সর্বনাশিনী অনলাইন হচ্ছেন! সদ্য সদ্য আর.আই.পি পোস্টটা পড়েছে। উনি ভাবতেও পারবেন না যে এত তাড়াতাড়ি তুমি একেবারে দলবল নিয়ে অন্ দ্য স্পট হানা দেবে। সুতরাং লুকিয়ে ফেলার প্রয়োজনীয় সময় পাবেন না। ধরা পড়তেও পারেন। তোমার হাতে দশ মিনিটের বেশি নেই। শিগগিরি টিম নিয়ে পৌঁছে যাও।"

"ওকে বস ।"

ফোন কেটে যেতেই দ্রুত হাতে আলমারি খুলে নিজের জামা-কাপড় বের করতে শুরু করল অধিরাজ। ডঃ চ্যাটার্জীকে বলল, "আপনি একটু নীচে গিয়ে ড্রয়িংরুমে বসুন ডক। আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যেই রেডি হয়ে আসছি।"

"কিন্তু...!" তিনি বিমূঢ়ের মতো বললেন, "তুমি ড্রাইভ করবে? সেটা উচিত হবে?"

– "আমি যদি আজ মরেও যাই, এই খুনটাকে আটকেই মরব ডক্।"

"কিন্তু এর মধ্যে অ্যান্ড্রু বাজাজ এলেন কী করে?" তাঁর মাথায় সব যেন গুলিয়ে তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে।

—"তিনি গিয়েছিলেন কখন যে আসবেন? সর্বনাশিনীর পুরো গল্পটাই তো উমঙ্গ অ্যান্ড্রু বাজাজের থেকেই শুরু হয়েছে। শেষও সেখানেই হবে।" অধিরাজের মুখে সেই দুষ্টুমিভরা হাসিটাই ঝিলিক দিয়ে ওঠে, "ভিকটিমের নাম শুনেই আপনার যদি এই অবস্থা হয়, তবে খুনীর নাম শুনলে কী করবেন?"

ডঃ চ্যাটার্জী সন্দিগ্ধ কণ্ঠে জানতে চান, "খুনী কে?"

অধিরাজ একগাল হেসে বলল— "প্রিয়া এস্থার বাজাজ।" ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ শুধু একটাই বাক্য উচ্চারণ করতে পারলেন, "ঘ-ড, এটা কী হচ্ছে!"

(ত্রিশ)

সারা রাস্তা আর একটিও কথা বলেনি অধিরাজ। তার চোখে মুখে অদ্ভুত একটা কাঠিন্য খেলা করছে। চোয়াল অদ্ভুত প্রতিজ্ঞায় দৃঢ়সংবদ্ধ। শুধু বাড়ি থেকে বেরোবার আগে ডঃ চ্যাটার্জীকে জিজ্ঞাসা করেছিল – "ফরেনসিক কিটস আছে আপনার সঙ্গে? খাবারের মধ্যে বিষ থাকলে ট্রেস করতে পারবেন?"

"ফরেনসিক কিটস তো আছেই, ইমিউনো ফ্লোও আছে। অন দ্য স্পট্ বিষ ধরার জন্য গ্যাজেটটা ইউজড হয়। জেনারেলি পনেরো থেকে তিরিশ মিনিট লাগে। তবে আমারটা আরও অ্যাডভান্সড বলে আরও তাড়াতাড়ি হয়।"

— "ফাইন।"

তারপর থেকেই মুখে কুলুপ এঁটেছে সে। ডঃ চ্যাটার্জী একটু মিনমিনিয়ে কিছু জানতে চাইছিলেন। কিন্তু সে এমন রাগী রাগী দৃষ্টিতে তাকিয়েছে যে ভয়ের চোটে ল্যাম্পপোস্ট হয়ে রয়েছেন। একদম "সাইলেন্ট মোডে!"

বালিগঞ্জ ফাঁড়ি ক্রস করতে না করতেই পবিত্র'র ফোন এল। সে বলল

"রেড মেরেছি বস্। তুমি ঠিকই ধরেছিলে। এবার আর প্রমাণ লোপাট করার সুযোগই পায়নি। ছোট্ট একটা ল্যাপটপ, ট্যাব, ব্যাকপ্যাক, বেশ কয়েকটা মোবাইলও পেয়েছি। আর অনেকগুলো সিরিঞ্জ, বোটক্স ইঞ্জেকশন, ল্যাভেন্ডার ম্যাসাজ অয়েল! আশ্চর্যের বিষয় একখানা বোরখাও পাওয়া গিয়েছে! ইনি মুসলিম নাকি?"

"না। ক্রিশ্চান।" অধিরাজ বলল, "দেবীকে নিশ্চয়ই পাওনি?"

"না।" পবিত্র জানায়, "পাখি উড়ে গিয়েছে। তিনি রেডি ছিলেন না ঠিকই। কিন্তু অপ্রত্যাশিত আক্রমণটাও সামলে নিয়েছেন! বাড়ির পেছনের দরজা খোলা দেখছি। তবে শ্রীমুখ মিস্ করলেও তেনার ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া গিয়েছে।"

"ঠিক আছে, কোনও ব্যাপার নয়। আমি জানি তাকে কোথায় পাওয়া যাবে।" সে বলে, "তোমাদের কাছে বেলচা, কোদাল জাতীয় যন্ত্রপাতি আছে?"

“সে কী! তুমি তো বলোনি যে এবার আমাদের চাষবাসও করতে হবে!” পবিত্র ফিচেল হাসি হাসে, “কী দুর্দিন এল সি.আই.ডির। এখন সব কিছু ছেড়ে গাইতে হবে “চলো কোদাল চালাই, ফেলে মানের বালাই!” তা ট্র্যাক্টরটাও কি লাগবে? না আমাকে আর অর্ণবকে যুতে দেওয়ার তাল করছ।”

– “ফাজলামি নয়। টেক ইট ভেরি সিরিয়াসলি।” অধিরাজ নিজেও সিরিয়াস – “শাবল, কোদাল, বেলচা, ট্রাক্টর — যা খুশি আনাও, আই ডোন্ট কেয়ার। কিন্তু মিঃ বাজাজের বাড়ির চতুর্দিকটা খোঁড়ো। ওখানে কেউ বেশ কয়েকবছর হল আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। তাঁকে আর অপেক্ষায় রাখা উচিত হবে না।”

“মানে?” এবার পবিত্র বিস্ময়ের ধাক্কায় কথা বলতেই ভুলে যায়, “ইউ মিন,...স্কেলিটন!”

“এগজ্যাক্টলি। সঙ্গে যন্ত্রপাতি আছে?”

“না থাকলেও জোগাড় করে নেব। হয়ে যাবে।”

‘গ্রেট!”

সে লাইন কেটে দিয়ে ড্রাইভে মন দেয়। ডঃ চ্যাটার্জী শুধু বিড়বিড় করলেন,— “এখন মরতে চলেছেন অ্যান্ড্রু বাজাজ। মারতে চলেছেন প্রিয়া এস্থার বাজাজ। অহল্যা বাজাজ আগেই টপকে গিয়েছেন। রিয়া বাজাজকে জলজ্যান্ত চোখের সামনেই দেখেছি। তবে মাটির তলায় কে?”

“ধৈর্য আছে?”

“আছে।”

“তাহলে চুপ করে থাকুন।” অগত্যা! ডঃ চ্যাটার্জী মুখের জিপার টেনে দিলেন। এ ছেলের এখন মতিগতির কিছুই ঠিক নেই! কখন আবার খ্যাঁক করে ওঠে কে জানে!

অন্যদিকে অর্ণব মিস্ ঘোষ সমেত মেরিলিন প্ল্যাটিনামে পৌঁছতেই মহা হাঙ্গামা শুরু হয়ে গিয়েছে। সে যখন পৌঁছেছিল তখন মানসী জয়সওয়াল বাড়িতে ছিলেন না। ফিরে এসে সি.আই.ডি অফিসারদের দেখেই খেপে গেলেন,—“আপনাদের ব্যাপারটা কী? যখন তখন এসে জ্বালাতন করছেন! আপনাদের উৎপাতে ঠিক মতোন খেতেও পারছি না। পেয়েছেনটা কী?”

"শা-ট আ-প!" মিস্ ঘোষ ধমকে উঠল, "একদম চুপ! বেশি খাওয়ার ইচ্ছে থাকলে যা খুশি খান। কিন্তু সেটা যে আপনার শেষ খাওয়া হবে না, তার কোনও গ্যারান্টি নেই।"

যেখানে প্রাণের দায় সেখানে সবাইকে চুপ মেরে যেতে হয়। মানসীও চুপ করলেন। বিজয় জয়সওয়াল অবশ্য নীরবেই ব্যাপারটা মেনে নিলেন। অহনা ভট্টাচার্য একটু বিস্মিত হলেও কিছু বললেন না। অ্যালিস মার্কেট থেকে ফিরে এসে সবে ব্রেকফাস্ট সার্ভ করছিল। কিন্তু অর্ণব হাঁ হাঁ করে ওঠায় থেমে গেল। রিয়া শুধু ভুরু কুঁচকে বলল, "আমার খিদে পেয়েছে।"

কিন্তু ঐ একবারই। আর কিছু বলেনি সে। অর্ণব সবার দিকে আড়চোখে একবার তাকিয়ে নেয়। প্রত্যেকের মুখেই চিন্তার ছাপ। একমাত্র রিয়া সামান্য বাজাজ শূন্য দৃষ্টিতে ছাতের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। টিকটিকি দেখছে না মাকড়সা, ভগবানই জানেন।

বেশিক্ষণ অবশ্য অপেক্ষা করতে হল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই অধিরাজ এবং ডঃ চ্যাটার্জী এসে উপস্থিত। ডঃ চ্যাটার্জী এতই কনফিউজড যে তাঁর মুখটাই কেমন বোকাটে হয়ে আছে। মানসী জয়সওয়াল যথারীতি টেরোডাক্টেল মার্কা একটা লুক দিয়ে দিলেন অধিরাজের দিকে। সে অবশ্য তাঁকে বিন্দুমাত্রও পাত্তা না দিয়ে বলল, "আপনাদের অভুক্ত রাখার জন্য দুঃখিত। টেবিলে তিনটে ব্রেকফাস্ট প্লেট দেখছি। কোনটা কার?"

অ্যালিস একটু অবাক হয়েই জানায়, "ডানদিকেরটা ম্যামের, বাঁ দিকেরটা আমার, আর উলটো দিকেরটা রিয়াবেবির।"

"ব্রেকফাস্ট যখন বানানো হচ্ছিল তখন আপনি বাড়িতে ছিলেন?" অ্যালিস হাঁ— "না। আমি রোজ সকালে বাজারে যাই। রিয়াবেবি আটটার আগে ওঠে না। আমি সেই ফাঁকেই বাজার করে ফেলি। ম্যামই ব্রেকফাস্ট রেডি করেন। আমি শুধু সার্ভ করি।"

"আজও ম্যাডামই ব্রেকফাস্ট রেডি করেছেন?"

"হ্যাঁ।"

– "সেই সময় আপনি মার্কেটে ছিলেন?"

"হ্যাঁ।"

অধিরাজ এবার ডঃ চ্যাটার্জীর দিকে ফিরেছে, "ডক, অ্যালিস আর রিয়ার খাবারগুলো একবার টেস্ট করে দেখুন। আমার ধারণা এই দুজনের খাবারেই বিষ পাবেন আপনি।"

ডঃ অসীম চ্যাটার্জী আবার একটা জোরদার ধাক্কা খেলেন! মরার কথা তো অ্যান্ড্রু বাজাজের! আর এরা দুজনেই তো মহিলা! কে মারছে, কাকে মারছে, সব ফের গুলিয়ে গেল তাঁর! কিন্তু শক্‌টা সামলে নিয়ে ফরেনসিক কিট নিয়ে কাজে লেগে গেলেন।

ওদিকে অর্ণবের হালও খারাপ। কোথা দিয়ে কী হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছে না। তবু নিজের গাম্ভীর্য বজায় রেখেই সে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। দেখা যাক, শেষপর্যন্ত কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়! বিজয় জয়সওয়াল ভুরু কুঁচকে আছেন। মানসী এখনও তার ইপ্সিত বস্তুকেই দেখছেন।

অধিরাজ এবার আস্তে আস্তে অহনা ভট্টাচার্যের দিকে এগিয়ে গেল, —"অ্যালিস খুব ভালো রান্না করে তাই না?"

- এ কী জাতীয় প্রশ্ন! বিস্ময়ে অহনার চক্ষু ছানাবড়া, "হ্যাঁ! কিন্তু...।"

"তবে ব্রেকফাস্টটা সে বানায় না কেন? আপনাকেই কষ্ট করতে হচ্ছে কেন?"

অহনা একটু রেগে গিয়েই বললেন, "কারণ অ্যালিস বাজারও করে। ও যথেষ্ট সুইফট নয়। একসঙ্গে সব কাজ ফটাফট করতে পারে না। মাল্টি টাস্কিঙের ক্ষেত্রে হিমশিম খায় । তাই আমাকেই বানাতে হয়।"

"হুঁ।" অধিরাজ দড়াম করে প্রায় অসভ্যের মতোই প্রশ্ন করে, "আচ্ছা আপনার বয়েস কত?"

– "এটা কী প্রশ্ন!" তিনি এবার চটে লাল, "মেয়েদের বয়েস কেউ এভাবে জিজ্ঞাসা করে?"

"সরি। আই অ্যাপলোজাইজ। কিন্তু...। অধিরাজ মৃদু হেসে সেই প্রশ্নটাই আবার করে, "আপনার বয়েস কত?"

"ফর্টি ফাইভ।" তিতিবিরক্ত মুখে উত্তর দিলেন অহনা।

- "সে কী! আপনাকে দেখে তো বত্রিশ-পঁয়ত্রিশের বেশি মনে হয় না। কপালে বা চোখের তলায় কোনও রিঙ্কল নেই, যেটা থাকা সবচেয়ে স্বাভাবিক।" সে খুব শান্ত গলায় বলল, "আপনার এই চিরযৌবনের রহস্যটা একটু জানাবেন? ডঃ চ্যাটার্জী সদ্য সদ্য এক যুবতীর প্রেমে পড়েছেন। আপনার টিপস্ ওঁর কাজে লাগবে!"

ডঃ চ্যাটার্জী অ্যালিস আর রিয়ার ফুডস্যাম্পল টেস্ট করছিলেন। অধিরাজের কথা শুনে এক রামবিষম খেলেন। অর্ণব আর মিস্ ঘোষ মুখে উৎকট গাম্ভীর্য মেখে দাঁড়িয়ে আছে । অহনা ভট্টাচার্য রাগে, অপমানে লাল হয়ে গেছেন, –"হাউ ডেয়ার ইউ! আপনি সি.আই.ডি অফিসার বলে যা খুশি তাই প্রশ্ন করতে পারেন না!"

"রহস্যটা ফাঁস করবেন না তাহলে?" অধিরাজ মুচকি হাসল, "আপনি বোটক্স ইউজ করেন? বোটক্স ইঞ্জেকশন? দমক্তি হুই জওয়ানি কা রাজ! বোটক্স মুখে বলিরেখা পড়তে দেয় না। জানেন নিশ্চয়ই?"

"জানি না।" অত্যন্ত বিরক্তি সহকারে উত্তরটা এল।

"অ্যামাটক্সিন-এক্স কাকে বলে নিশ্চয়ই জানেন!" সে বিনয়ে গলিতং— "একেই বোটানিস্ট! তার ওপর মাশরুমের চাষ আপনার। প্লিজ, আমায় আশাহত করবেন না! অ্যামাটক্সিন-এক্স কাকে বলে ম্যাডাম?"

অহনা নির্বাক। কোনও উত্তর নেই তাঁর কাছে। অথবা উত্তরটা দেবেন না। অধিরাজ তাঁর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই জিজ্ঞাসা করল—"ডক, কতদূর?"

ডঃ চ্যাটার্জী একটু চিন্তিত ভাবেই বললেন, "তোমার সন্দেহই ঠিক। দুজনের খাবারেই প্রচুর পরিমাণে বিষ রয়েছে। বিষটা কী সেটা অবশ্য বলতে পারছি না।"

- অধিরাজ অহনা ভট্টাচার্যের দিকে ফিরল। এখন তার চোখে যেন বিদ্বেষের আগুন জ্বলছে। প্রত্যেকটা শব্দ কেটে কেটে বলল সে, "এনাফ ইজ এনাফ ! আপনি এতদিন ধরে গোটা পুলিস-প্রশাসন বিভাগকে যথেষ্ট নাকাল করেছেন। টোট্যাল ছ'টা খুন করেছেন! অর্ণব ঠিক সময়ে এসে না পৌঁছলে আরও দুটো খুন হত! আমাকেও বাগে পেয়ে যথেষ্টই ইনসাল্ট করেছেন! এবার আমার পালা! আমাকে যেমন সবার সামনে হ্যারাস করেছিলেন, আমিও সেটাই করব! টিট্ ফর ট্যাট্!" অহনা ভট্টাচার্য ঘাবড়ে গিয়েছেন, "মি!"

“এনাফ।”

“নট ইউ! শি!” -

বিদ্যুৎবেগে অ্যালিসের দিকে ঘুরল অধিরাজ। তারপর যা ঘটল তা কল্পনারও অতীত! কেউ কিছু বোঝার আগেই সে একটানে অ্যালিসের কাঁচাপাকা চুলের গুচ্ছ খুলে আনল, “চে-ক-মে-ট!” -

সবাই স্তম্ভিত! অ্যালিসের কাঁচাপাকা চুলের উইগ খসে পড়তেই তার মেঘের মতো কালো রেশমী একঢাল চুল বেরিয়ে পড়ল। তাতেও যেন অধিরাজের শান্তি নেই। সে রাগে প্রায় জ্ঞানশূন্য হয়ে অ্যালিসকে একেবারে দেওয়ালের সঙ্গে ঠেসে ধরেছে। এবং আক্ষরিক অর্থেই তার প্রায় ছাল-চামড়া তুলে আনল। অর্থাৎ গাল ও গলার দুপাশ থেকে খানিকটা থলথলে চামড়া টান মারতেই হাতে খুলে চলে এল। দর্শকেরা বিস্ময়ের আঘাতে বোধহয় নিঃশ্বাস নিতেও ভুলে গিয়েছে। এ কী! এ তো প্রস্থেটিক মেক-আপ!

তখনও অধিরাজের শান্তি হয়নি। সে ওয়েট টিস্যুপেপার রোল বের করে অ্যালিসকে চেপে ধরে তার মুখে পাগলের মতো জোরে জোরে ঘষছে! এত জোরে ঘষছে যে অর্ণবের ভয়ই হচ্ছিল যে গোটা চামড়াটাই না ঘষার চোটে উঠে আসে। কিন্তু অধিরাজের মাথায় যেন দানব ভর করেছে। সে একটার পর একটা ভিজে ন্যাপকিন নিয়ে সজোরে অ্যালিসের মুখ পরিষ্কার করছে। চিরকালীন ভদ্র নম্র মানুষটার এইমুহূর্তে এইটুকু জ্ঞানও নেই যে এই কাজটা আইনত কোনও পুরুষ অফিসার করতে পারে না। এটা লেডি অফিসারদের কাজ। অ্যালিস তার বিরুদ্ধে মলেস্টেশন, কিংবা হ্যারাসমেন্টের কেস ঠুকতেই পারে। আর অ্যালিসও আশ্চর্য! সে ও লক্ষ্মী মেয়ের মতো চুপ করে অধিরাজের অত্যাচার সহ্য করছে। বরং তাকে দেখে মনে হয় সে ব্যাপারটা বেশ উপভোগই করছে।

টিস্যুপেপারের মর্দনের ফলে আস্তে আস্তে কালো মেক-আপওয়ালা মুখের পেছনের ফর্সা মুখটা প্রকাশ্যে এল। অ্যালিস একটু মৃদু হেসে বলল, “হয়েছে? শান্তি?”

অধিরাজ এবার থেমে গেল। অত্যন্ত উত্তেজনায় হাঁফাচ্ছিল সে। হাতের কালো হয়ে যাওয়া টিস্যুপেপারটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে একটা শ্বাস টেনে বলে; – “চেকমেট! সর্বনাশিনী, ওরফে অ্যালিস ওরফে শিনা জয়সওয়াল ওরফে প্রিয়া এস্থার বাজাজ! ইউ আর আন্ডার

অ্যারেস্ট! এবার বাকিটা নিজেই খুলবেন? না আমিই লজ্জার মাথা খেয়ে টেনে খুলব। ইন্ডিয়ান পিনাল কোডের আজ নিকুচি করেছে!"

"শিনা জয়সওয়াল!" অর্ণব আর মিস্ ঘোষ প্রায় একসঙ্গেই বলে ওঠে। বিজয় জয়সওয়াল আর মানসী প্রস্তরীভূত ! ডঃ চ্যাটার্জীর প্রায় ভির্মি খাওয়ার মতো দশা! কোনোমতে বললেন, "শি-না!"

"কোনও সন্দেহই নেই! শিনা জয়সওয়াল বলেই ওঁকে চেনো তোমরা।" সে বলল, "চোখ আর ঠোঁটে বোটক্স ইঞ্জেকশন দিয়ে ফুলিয়েছেন! বোটক্স শুধু রিঙ্কই ম্যানেজ করে না, একটু বেশি পরিমাণে স্কিনটাকে ফুলিয়েও দিতে পারে। ফোলা ভাবটা কমে গেলেই চিনতে পারবে। আর যে ভয়ঙ্কর বহরটা দেখছ— সেই বহরটা চিলড্রেন্স পার্কে দেখা শেরু বা টমি টেডির কলেবরের মতোই ফাঁপা! একটা মোটকা খোলস মাত্র। ওর ভেতরে ওঁর চাবুকের মতো ফিগারটা রয়েছে।" অধিরাজ ফের ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে শিনার দিকে তাকায়, "নিজের মূর্তিতে দয়া করে এবারে আসবেন কি? আপনার ল্যাপটপ, ট্যাব, মোবাইল, ব্যাকপ্যাক, সব বাজেয়াপ্ত হয়েছে।

যে বোরখাটা পাওয়া গিয়েছে, সেটা আমাদের ফরেনসিক এক্সপার্ট পরীক্ষা করলেই আপনার তিন ভিকটিমের মধ্যে কারোর না কারোর ডি.এন.এ পেয়ে যাবেন। সঙ্গে আপনার ফিঙ্গারপ্রিন্টও। রিয়ার সঙ্গে, এবং যে কঙ্কালটা পাওয়া যাবে সেটার সঙ্গে ডি.এন.এ টেস্ট করলে বুঝতে বাকি থাকবে না যে আপনিই প্রিয়া এস্থার বাজাজ। শুধু তাই নয়, যেদিন জুয়েলার বিজয় জয়সওয়াল অ্যাবডাক্টেড হন, সেদিন ওর ফোন থেকে যে লাস্ট মেসেজটি গিয়েছিল সেখানে ওঁর নাম 'বিজয় নয় ভিজয়' জয়সওয়াল লেখা হয়েছিল। আর.আই.পি পোস্টেও তাই ছিল। কিন্তু সমস্ত সাসপেক্টরা যখন নিজের হাতে বয়ান লিখে দিলেন তখন স্বাভাবিকভাবেই –'বিজয়' জয়সওয়াল নামটা কোনও না কোনও ভাবে এসেছিল। বাকি সবাই নামের স্পেলিং 'বিজয়'ই লিখেছিল। আপনি এবং অ্যালিসই সেই দুজন ব্যক্তি যারা 'ভিজয়' লিখেছিলেন। যতই বেঁকিয়ে চুরিয়ে লেখেন, হ্যান্ডরাইটিং এক্সপার্টদের বোকা বানাতে পারবেন না। বাকি প্রমাণও পেয়ে যাব। যথেষ্ট দৌড় করিয়েছেন আমায়। এবার অন্তত দয়া করুন।"

—"আপনিও আমার ধড়াচুড়ো খুলতে পারেন। ভয় নেই। মি-টু করব না।" অ্যালিস, ওরফে শিনা, ওরফে প্রিয়া বাজাজ মোহিনী হাসি হাসল, "বিউটিফুল! জাস্ট ব্রিলিয়ান্ট! এবার আপনি আমাকে এভিডেন্স লোপাট করার সময়টাই দেননি। আমি সত্যিই ভাবতে পারিনি আপনি সর্বনাশিনীর সঙ্গে প্রিয়া বাজাজের লিঙ্কটা এত পার্ফেক্টলি বুঝতে পারবেন! আমি আরও ভাবছিলাম, পুলিস চুপচাপ বসে আছে কেন! ওখানেই ভুলটা করেছি। আপনি স্রেফ আর.আই.পি পোস্টের অপেক্ষায় ওঁত পেতে বসেছিলেন! এমনকি 'ভিজয়' স্পেলিংটাও আপনার চোখে পড়েছে। আমি তো ওটা ধর্তব্যের মধ্যেই আনিনি! সত্যি, আপনার বুদ্ধির তারিফ না করে পারছি না! হোয়াট আ ব্রেন! দাবা খেলেন নাকি?"

— "লজ্জা করে না?" ডঃ চ্যাটার্জী খেঁকিয়ে ওঠেন, "পাঁচখানা খুন করে আবার হাসা হচ্ছে। তাছাড়া অ্যান্ড্রু বাজাজই বা কোথায়? নাকি তাঁকেও মেরে ফেলেছেন?'

"পাঁচটা নয় ছ'টা খুন। আসলে অ্যান্ড্রু বাজাজ অনেকদিন আগেই মারা গিয়েছেন ডক্।" অধিরাজই উত্তরটা দিয়ে দেয়, "এতক্ষণে পবিত্ররা হয়তো তাঁর কঙ্কালটা খুঁজেও পেয়েছে। বলাই বাহুল্য, মিঃ বাজাজের সুপুত্রীই কাজটা সেরেছেন।"

"বে— শ করেছি!" শিনা বা প্রিয়ার চোখে দাবানল লাগল— "আপনারা কী করে বুঝবেন! আমি চোখের সামনে নিজের মাকে একটু একটু করে রোজ মরতে দেখেছি। কিচ্ছু করতে পারিনি। আমার মা অত্যন্ত সুশিক্ষিতা মহিলা ছিলেন। সাহিত্য পড়তেন, চমৎকার গান গাইতেন, তাঁর হাতের রান্না যে খেয়েছে, সে কোনওদিন ভুলবে না। তাঁর মতো গভীরমনস্ক মানুষ খুব কম ছিল। তাঁর মতো ধৈর্য, সহ্য খুব কম লোকেরই আছে। তাঁর মতো নিপুণ গৃহিনী, স্নেহময়ী মা পাওয়া দুষ্কর। তিনি তাঁর গোটা জীবন, যৌবন একটা অপদার্থ পুরুষকে দিয়েছিলেন। সেই লোকটার সংসারে খাটতে খাটতে মুখে রক্ত তুললেন! একজন সম্পূর্ণ নারীর যা গুণ থাকা দরকার, সব ছিল তাঁর। বিনিময়ে কী পেলেন? শুধু যন্ত্রণা! দু বেলা খেতে পেতেন না! নিজের স্বামীর বিছানায় বসার অধিকার তাঁর ছিল না! একটা কুকুর-বিড়াল পুষলেও তার প্রতি মায়া পড়ে। আমার মা তাও পাননি! রোজ স্বামীর সঙ্গে অন্য নারীকে শয্যাসঙ্গিনী হিসাবে দেখাটা কী প্রচণ্ড অপমানের, কী ভীষণ যন্ত্রণার তা বোঝেন আপনারা? লোকটা তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছিল, 'তুমি সম্পূর্ণ

অপ্রয়োজনীয় জিনিস!’ কেন? শুধু তাঁর গায়ের রঙ কালো বলে! এটা কী জাতীয় ন্যায়! গায়ের রঙ কালো হলেই সে অসুন্দর? কেন? কোন্ শাস্ত্রে লেখা আছে? শুধু গায়ের রং কালো বলে তাঁর আর কোনও গুণই গ্রহণযোগ্য নয়। আমার মা দগ্ধে দগ্ধে মরেছেন ! রিয়ার কী অবস্থা হয়েছে আপনারা নিজের চোখেই দেখছেন! সারাজীবন ধরে সে মরেছে। আজও মরছে। আমিও সবক'টাকে তেমনই যন্ত্রণা দিয়ে দিয়ে মেরেছি।” প্রিয়া এবার হিংস্রভাবে বলে, “বেশ করেছি। ওরা যত কষ্ট পেয়েছে – আমি ততই আনন্দ পেয়েছি! সুযোগ পেলে আরও মারতাম! শুধু একটাই দুঃখ! অ্যান্ড্রু বাজাজকে মারার সময়ে -রিয়া দেখে ফেলেছিল। আমায় চিনতে পারেনি। আমিও বুঝতে পারিনি যে ও দেখেছে। কিন্তু তারপর থেকেই ওর অবস্থা খারাপ হয়ে গেল! খুনটা রাতে হয়েছিল বলেই রাত হলেই প্রচণ্ড ভয় পেত! আর যা দেখেছে সেই অ্যাকশনটাই বারবার আজও রিপিট করছে! ওটাই একমাত্র আফসোস। আর কোনও আফসোস নেই।”

অর্ণব কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসাই করে ফেলে, “কিন্তু প্রিয়া বাজাজ থেকে শিনা মৈত্র বা জয়সওয়াল হলেন কী করে?” প্রিয়া ফুঁসে ওঠে, “কারণ লোকটা আমায় প্রায় খুন করেই ফেলেছিল। মাউ ঠিক বলেছে। ঐ শুয়োরের বাচ্চাটা রিয়াকে বেল্ট দিয়ে পেটাচ্ছিল। আমি আর সহ্য করতে পারিনি। লোকটার গলা টিপে ধরেছিলাম। হারামিটা নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে আমার মাথায় ফ্লাওয়ারভাস দিয়ে মেরেছিল। তারপর আমি মরে গিয়েছি ভেবে রাস্তায় ফেলে দিয়েছিল। কপালগুণে যেখানে ও আমাকে ডাম্প করেছিল, সেখান দিয়েই এক কাপল যাচ্ছিলেন। তাঁরা আমায় হসপিটালাইজ্‌ড্ করেন। মাথায় এত জোরে মেরেছিল যে আমি একবছর কোমায় ছিলাম। ঐ কাপল বাবা-মায়ের মতোই আমায় সামলেছেন। তাঁদের এক মেয়ে ছিল। শিনা মৈত্র। সে আমারই বয়েসী। কিছুদিন আগেই অরিজিনাল শিনা ক্যান্সারে মারা যায়। তাঁরা আমার নাম-ধাম জানতেন না বলে হসপিটালের রেজিস্টারে আমায় ‘ডটারের’ পরিচয় দেন। জ্ঞান আসার পরেও আমি বেশ কিছুদিন কিছুই মনে করতে পারিনি। মিঃ আর মিসেস মৈত্র আমায় শিনা মৈত্র হিসাবেই বড় করে তুলেছেন। নিজের মেয়ের জায়গা দিয়েছেন। আমি তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ। বিয়ের পর জয়সওয়াল হলাম। তবে যখন সব মনে পড়ল তখন মিঃ বাজাজকে ছাড়িনি। ও

কারোর সঙ্গে পালায়নি। ওর সমস্ত টাকা পয়সা-গয়না আমিই লোপাট করেছিলাম। মেইলগুলো সব আমারই পাঠানো। এমনকি ওর সমস্ত টাকাও আমি খুব সহজেই অন্য অ্যাকাউন্টে ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং এর মাধ্যমে ট্রান্সফার করেছিলাম। রিয়া একাই শুধু হ্যাকার নয়, ওর থেকেও ভালো হ্যাকার আমি। ও শুধু আই.পি স্পুফিং অবধি ভাবতে পেরেছিল। কিন্তু ধরা পড়ে যায়। সেটা দেখেই আমি শিক্ষা নিয়েছি। আরও এক স্টেপ এগিয়ে খেলেছি।"

"থ্যাঙ্কস ফর দ্য কনফেশন। আমি অবশ্য সেটা আগেই বুঝেছি।" অধিরাজ বলল, "তারপর?"

"আমি মাউয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। মাউ বলল রিয়া মিঃ বাজাজকে হ্যারাস করার জন্য গ্রেফতার হয়েছিল। ওর মানসিক অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। মিঃ বাজাজ ওকে সামলাতে না পেরে মাউয়ের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ও কোথাও গায়েব হয়নি বা গা ঢাকা দেয়নি। শুধু মাউয়ের কাছে ছিল। আর মিঃ বাজাজের ভয়ে বাইরে বেরোত না। শুধু মাসে একদিন কী দুদিন ও বাজাজের কাছে থাকত। কারণ বাজাজেরও টর্চারের জন্য কাউকে দরকার ছিল। তাছাড়া রিয়ার নামে একটা টাকা প্রতি মাসে আসত। মায়ের প্রপার্টির ও একজন দাবিদার। আর বাজাজ জানত আমি সিনেই নেই। সেই টাকাটার ওপরও বাজাজের লোভ ছিল। তাই লোক দেখানো ভড়ং।" গভীর আফসোসে মাথা নাড়ল সে, "এমনই কপাল, যেদিন বাজাজকে মারলাম সে রাত্রেই রিয়াকে ওখানে থাকতে হল!"

"অ্যালিস তো অনেক আগেই মারা গিয়েছিল।" অধিরাজ বলল, - "তাহলে আবার তার অবতারে আপনাকে নামতে হল কেন? রিয়ার জন্য?" প্রিয়ার চোখে বাষ্প, "আমারই দোষ। অ্যালিস রিয়াকে ছোটবেলা থেকে মানুষ করেছিল। ওর সমস্ত অভ্যাস, সমস্ত আতঙ্ক, সবরকমের অসহায়তা একমাত্র দুজনই জানত। পৃথিবীতে ওকে সামলানোর মতো শুধু দুজনই ছিল। অ্যালিস আর আমি! মাউও রিয়াকে ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারত না। বাজাজকে খুন হতে দেখে ও এত শক্ড হল যে অতীতের সব কথা ভুলে

গেল! চূড়ান্ত ভয়ে সে বারবার সেই লোকটাকেই খুঁজতে শুরু করল যে ওকে ছোটবেলা থেকে মানুষ করেছে। যার সঙ্গে ও সবচেয়ে বেশি কমফর্টেবল। মাউ আর আমি, দুজনেই বুঝতে পারলাম, ও অ্যালিসকে ছাড়া বাঁচবে না। সেইজন্যই আমি ওর ঘুম থেকে ওঠার আগেই অ্যালিস হয়ে চলে আসতাম। আবার রাতে ও ঘুমিয়ে পড়লে চলে যেতাম। ওর অত বোঝার ক্ষমতা ছিল না, তাই আমাকে অ্যালিস ভেবেই আঁকড়ে ধরেছিল। নয়তো ও মরে যেত। আপনি ঠিকই ধরেছেন। বোটক্স ইঞ্জেকশন এমন মাত্রায় নিতাম যাতে একটা সময় পর্যন্ত ওটার এফেক্ট থাকত। বাকিটা প্রস্থেটিক মেক-আপ যেটার খানিকটা অংশ আপনি এই মাত্রই টেনে খুললেন। আর গায়ের রঙ বলাই বাহুল্য...।"

"যখন মিঃ বাজাজকে মেরেই ফেলেছিলে বাপু, তখন ফের এতগুলো খুন করতে হল কেন?" ফের ডঃ চ্যাটার্জী নাক গলালেন— "অ্যান্ড্রু বাজাজকে মেরে শান্তি হয়নি? এতদিন পরে আবার? হোয়াই?" অধিরাজ উত্তরটা দিয়ে দেয়, "ওটা পরে বুঝিয়ে বলব। এক কথায় বলতে গেলে অহল্যা জয়সওয়ালের নাম যদি 'অহল্যা' না হত, তবে এতগুলো খুন হতই না ডক!"

- "আপনি সেটাও বুঝেছেন! ব্রিলিয়ান্ট! বিউটি!" প্রিয়া অধিরাজের দিকে তাকিয়ে খিলখিল করে হাসল, "আপনার মতো সমঝদার পেলে ক্রাইম করার মজাই আলাদা! একটা ছোট্ট গিফট্ দিয়েছিলাম আপনাকে। পেয়েছেন?"

অধিরাজের চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে। অর্ণব প্রসঙ্গ পালটানোর জন্য বলে উঠল— "তা বলে আইনকে নিজের হাতে তুলে নেবেন?"

প্রিয়া এবার ফুঁসে ওঠে, "আমার মাকে বাঁচাতে পেরেছে আপনার আইন? তিনি মারা যাওয়ার পরে আমি চিৎকার করে বারবার বলেছিলাম, 'ইস্ আ মার্ডার!' তখন আপনার আইন কী ছিঁড়েছে? রিয়াও আইনি পথে. বাজাজকে শাস্তি দিতে চেয়েছিল। আইন ওকেই উলটে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিল! কী প্রচণ্ড যন্ত্রণা ওর ভেতরে ছিল তার খোঁজ কোন্ আইন রেখেছে? যে বাস্টার্ডগুলোকে আমি মেরেছি, সে শালারা আমার প্রেমে পড়ে নিজেদের বৌকেই মারার তালে ছিল! আমি বাধা দিয়েছিলাম, পালিয়ে যাওয়ার লোভ দেখিয়েছিলাম বলে সেই মহিলারা এখনও বেঁচে আছে। কেন? তারা কালো বলে? সান

অফ আ বিচ্! সবার ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আছে! তাদের কী অবস্থা হত? আমি আর রিয়া যেমনভাবে মরেছি, মরছি তারাও মরত! বেশ করেছি শালাদের মেরেছি। ওদের এভাবেই মরা উচিত!

আইন দেখাচ্ছেন! কীসের আইন মশাই! আপনাদের আইন একদিকে ডিভোর্স করতে গেলে বলে, 'সন্তানদের কথা ভাবুন' অন্যদিকে সেই আইনই এক্সট্রাম্যারিটাল অ্যাফেয়ারকে লিগ্যাল বলে। ন্যাকামি! তখন সন্তানদের কথা মনে পড়ে না? বাপ যদি মাকে ফেলে দিনের পর দিন অন্য মেয়ের সঙ্গে ঘোরে তাহলে সন্তানদের কেমন লাগে জানে আপনাদের আইন? আমি জানি!" উত্তেজিত হয়ে বলল সে, "আইন স্রেফ দাঁড়িপাল্লা ধরানো গান্ধারী! আইন মানে আ ব্লাডি ব্লাইন্ড ফুল!"

"তাহলে শেষমেষ নিজেই সুইসাইড করার সিদ্ধান্ত নিলেন কেন?" মিস্ ঘোষ এতক্ষণে মুখ খুললেন।

-"নিজেকে নয়, ঐ শুয়োরের বাচ্চাটাকে মারতে চেয়েছিলাম ! অ্যান্ডু বাজাজ!" প্রিয়া হিসহিসিয়ে বলল, "ঐ কুত্তাটার মতো দেখতে হয়েছি যে! মহাপাপ করেছি! কসমেটিক সার্জারি করে মুখটাকে পালটাতে পেরেছি। কিন্তু স্কিন! এই সাদা চামড়া যাবে কোথায়! মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভের চাকরি নেওয়ার পেছনেও এই একটাই কারণ। রোদে পুড়ে পুড়ে যদি চামড়াটা তামাটে হত তবে শান্তি পেতাম। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না!" বলতে বলতেই কেঁদে ফেলল প্রিয়া, "যতবার আয়নায় নিজেকে দেখি, ততবার নিজের ওপরেই ঘেন্না হয়! ততবার নিজের পেছনে অ্যান্ডু বাজাজকে দেখতে পাই! সেই সাদা চামড়া, যার জন্য আমার মা শেষ হয়ে গিয়েছিলেন! দেখতে পাই লোকটা ব্যঙ্গের হাসি হাসছে। একমাত্র আমি মরলেই ঐ লোকটা হারত। পুরো চেকমেট! রিয়াকে ফেলে রাখলে ও এমনিতেই মরত! তাই ওকেও...!"

প্রচণ্ড কান্না এসে গিলে নিল বাকি কথাগুলোকে। দু হাতে মুখ ঢাকল প্রিয়া এস্থার বাজাজ।

– "অ্যামাটক্সিন এক্স? সেটা কে দিয়েছিল? অহনা ভট্টাচার্য?" অধিরাজের কথা শুনে সে জলভরা চোখ তুলে তাকিয়ে ক্লান্ত ভাবে বলল "অনেক বলেছি, আর একটা কথাও

বলব না।”

— “বেশ। মিস্ ঘোষ, অ্যারেস্ট হার!”

মিস্ ঘোষ এগিয়ে যেতেই ফোঁস করে উঠল প্রিয়া, “এই মহিলা আমাকে হ্যান্ডকাফ পরাবেন কেন? উনি কি আমায় ধরেছেন? যে আমায় ধরেছে সেই আমার হাতে হাতকড়া পরিয়ে, কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যাবে।”

“কো অপারেট করুন ম্যাডাম...।” মিস ঘোষ শান্ত ভাবেই বলে।

প্রিয়া অবজ্ঞাসূচক মুখভঙ্গী করে, “এখানে বাঘ আর বাঘিনীর মধ্যে লড়াই চলছে। তুমি কে ছুঁচোসম্রাজ্ঞী যে মাঝখানে নাক গলাচ্ছ!”

মিস্ ঘোষ তার কথায় পাত্তা না দিয়ে তাকে ধরতেই যাচ্ছিল। প্রিয়া তাকে এক ঝটকায় সরিয়ে দেয়। উন্মত্ত রাগে বলল, “খবর্দার! শেষ বিষটা অ্যামাটক্সিন নয়, সায়ানাইড ছিল। আর তার অ্যাম্পুল এখনও একটা আছে আমার কাছে। অন্য কেউ আমাকে হাতকড়া পরালেই অ্যাম্পুলটা খেয়ে নেব আমি।”

সর্বনাশ ! অর্ণব শুনল ডঃ চ্যাটার্জী আপনমনেই বলছেন— “লাও ঠ্যালা! এ কে রে! এ তো পুরো সাইকো!”

অধিরাজ কোমরে হাত দিয়ে ঘটনাটা দেখছিল। এবার অত্যন্ত তিক্তবিরক্ত হয়ে বলল, “সরুন মিস ঘোষ। আমি দেখছি।”

প্রিয়া বাজাজ মুখ টিপে হাসল। অধিরাজ হ্যান্ড কাফ নিয়ে তার দিকে এগিয়ে যেতেই পরম আগ্রহে দুই হাত এগিয়ে দিয়েছে। যেন হ্যান্ডকাফ নয়, তাকে শাঁখা বা বালা পড়ানো হচ্ছে! অধিরাজ একটু ঝুঁকে পড়তেই ফিঁক করে হেসে কানের কাছে ফিসফিস করে বলল — “ফর ইয়োর কাইন্ড ইনফরমেশন টাইগার, আমার কাছে কোনও পটাশিয়াম সায়ানাইডের অ্যাম্পুল নেই।”

— “জানি।” কড়াৎ শব্দে তাকে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে বলল অধিরাজ, “আই হেট ইউ!”

পরাজিত বন্দিনী অর্ধনিমীলিত নেত্রে ভীষণ মোহ নিয়ে বিজয়ী সম্রাটের দিকে তাকাল। তার বিভাজিত ওষ্ঠাধরের ফাঁক দিয়ে বরফসাদা দাঁত ঝলসে ওঠে। ফের ফিসফিসিয়ে বলল সে,

“অ্যান্ড আই লাভ ইওর হেট্রেড!”

(একত্রিশ)

“শেষপর্যন্ত শিনা জয়সওয়াল। তুমি ভাবতে পেরেছিলে অর্ণব।” অর্ণব আড়চোখে অধিরাজের দিকে তাকায়। বাইরে তখন বেশ জোরে বৃষ্টি পড়ছিল। সে পেছন ফিরে একদৃষ্টে সেই ধোঁয়াশা প্রেক্ষাপটের দিকেই তাকিয়েছিল। ডঃ চ্যাটার্জীর কথা শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেলল, “আই হেট হার। আই জাস্ট হেট হার!”

– “হেট শব্দটার ওপর একটু বেশিই জোর পড়ল। ডঃ চ্যাটার্জী চোখ টিপে হাসলেন “সকাল থেকে এই নিয়ে আটবার বলল! মালটার ইগোতে হেবি লেগেছে!” তারপরই গলাটা একটু চড়িয়ে বলেন, “হেটটা একটু পরে কোরো ভাই। এদিকে আমাদের এখনও পেট গুড়গুড় করছে। একটু পরেই আবার আহেলিকে নিয়ে চাইনিজ খেতে যাবে। তার আগে একটু খোলসা করে বলবে প্লিজ?”

-অধিরাজ ঘাড় ঘুরিয়ে তার দিকে তাকায়। দুষ্টু হাসিটা ফের তার মুখে ঝিলিক মেরে উঠেছে, “কোনটা খোলসা করে বলব উড্ বি ডক্টর নরমুন্ড?”

ডঃ চ্যাটার্জী লাফিয়ে ওঠেন, “হতভাগা, বাঁ..দ..র ছেলে! কুৎসিত কদাকার ডাইনোসোর কোথাকার! খবর্দার বলছি। ভদ্রমহিলার পদবী নিয়ে ফাজলামি করবে না। মেরে ফেলব, কেটে ফেলব, খু..উ..ন করে ফেলব!”

“এবার কার ইগোতে লাগল?”

তার দুচোখে কৌতুক! সে ডঃ চ্যাটার্জীর সিগারেটের প্যাকেটের দিকে হাত বাড়িয়েছে দেখে খপাৎ করে সেটাকে সরিয়ে নিলেন তিনি।

“ওসব ধান্দাবাজি পরে করবে।” ডঃ চ্যাটার্জী কড়া স্বরে বললেন, ‘নো স্মোকিং! ফোকাফুঁকি কেস এখন একদম চলবে না! ডাক্তারদের বারণ আছে।”

“বিরক্তিকর!”

অধিরাজ ফের ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে, “একটা সিগারেটও খেতে পারছি না! আর প্যাকেটটা আস্তে করে সরালেই তো চলত। হাত খামচে দেওয়া জরুরি ছিল?”

- "ওটা ফাউ। তিনি গরগর করেন— "শোনো ম্যান ইন ব্ল্যাক আমার অ্যাসিস্ট্যান্টকে ডিনারে নিয়ে যাচ্ছ যাও। বদমায়েশ ছোঁড়া কালো ব্লেজারে একটু বেশিই হ্যান্ডসাম আর ইয়ে লাগছে। তাও ঠিক আছে। কিন্তু দয়া করে আহেলিকে আস্ত ফেরত দিও। ওর মাথা ঘুরিয়ে স্পয়েল করবে না। তোমায় বিশ্বাস নেই। এই কেসে যা দেখলাম, জন্মজন্মান্তরে ভুলব না! কাল সকালে ল্যাবে অনেক কাজ। বাইরে বেশ বৃষ্টি পড়ছে। দুজনে আবার নার্গিস আর রাজকাপুর হয়ে যেও না! ফের জ্বরে পড়ে যদি ভুলভাল বকো, আমি দেখতে যাব না।"

অধিরাজ ফের ছেলেমানুষের মতো হাসল। এই পরিচিত হাসিটা শেষপর্যন্ত ফিরেছে! এবং বলাইবাহুল্য ডিপার্টমেন্টের সকলেই হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। অফিসার ব্যানার্জীর তিরিক্ষি মেজাজ দেখতে কেউই অভ্যস্ত নয়। বেশ কয়েকদিন আগেই সে অফিসে জয়েন করেছে। সর্বনাশিনীর কেসফাইল ক্লোজড। সি আই ডি এখন চার্জশিট তৈরি করছে। পাওয়া গিয়েছে উমঙ্গ অ্যান্ড্রু বাজাজের কঙ্কালটাও। ফরেনসিক সেটার ডি.এন.এ টেস্ট করে কঙ্কালটাকে উমঙ্গ অ্যান্ড্রু বাজাজের বলে কনফার্ম করেছে। প্রিয়া এস্থার বাজাজ সবই বলেছে। শুধু অ্যামাটক্সিন এক্স কোথায় পেল, সেই তথ্যটা কিছুতেই বলেনি । মিডিয়াও আপাতত গুণগান গাইছে। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে।

কিন্তু আহেলিকে 'সরি' বলাটাই বোধহয় সবচেয়ে বড় বিপজ্জনক কাজ ছিল। বেচারা অধিরাজ একচোট ঘেমে-নেয়ে, লজ্জায় লাল হয়ে, কয়েক গ্যালন জল খেয়ে, মাথা চুলকে-টুলকে শেষপর্যন্ত যেই তাকে 'সরি' বলেছে, অমনি আহেলি একেবারে মিনি বিড়ালের মতো পিঠ বেঁকিয়ে, রোঁয়া ফুলিয়ে ফ্যাস করে উঠল, "আমায় পেয়েছেনটা কী? মন্দিরের ঘণ্টা? যে কেউ এসে যখন খুশি ঢং করে বাজিয়ে যাবে! যখন খুশি পাবলিকলি ইনসাল্ট করবেন! যখন খুশি সরি বলবেন!" সে ঘাবড়ে গিয়ে অস্থিরভাবে বুক পকেটে হাতড়াচ্ছে দেখে আহেলির ভ্রুকুটি আরও ভয়ঙ্কর হল, "ওটা কী হচ্ছে? ওটা ওখানে নেই।"

"ওঃ! সরি! সরি! আই সিন্সিয়ারলি অ্যাপোলোজাইজ!" অধিরাজ নার্ভাস হয়ে গিয়ে আরও ঘেঁটে 'ঘ' হয়ে গেল, "থ্যাঙ্কস ফর দ্য ফ্লাওয়ারস্!" বলতে বলতেই অপরাধীর মতো

মাথা হেঁট করে ফেলেছে, "মানছি আমি আপনার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করিনি.... মানে, খুবই খারাপ ব্যবহার করেছি... আমার উচিত হয়নি... আমি... মানে...যদি আপনার আপত্তি না থাকে...তবেই...।"

"তবেই কী?"

"যদি আপনাকে ডিউটি আওয়ার্সের পর একটা ট্রিট দিতে চাই... আপনি কি কিছু মনে করবেন?"

"ইউ মিন, ডিনার ডেট?" আহেলির ভুরুটা ধনুকের মতো বেঁকে যায়।

"ইয়েস!" সে কথাটা বলে ফেলে সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারল কী ভুলটা করেছে। "নো... আই মিন্, নো...! নট ডেট। আমি তা বলছি না!"

"ইয়েস... নো! বলতে চাইছেনটা কী আপনি?"

বাপ্ রে! ডঃ চ্যাটার্জীর সুযোগ্য সহকারীই বটে। অধিরাজ কী বলবে ভেবে পেল না। সে অবিকল বকা খাওয়া শিশুর মতো মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে। আহেলি খানিকক্ষণ কড়া দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর হেসে ফেলে বলল, "ওকে। অ্যাপোলজি অ্যাক্সেপ্টেড। চাইনিজ চলবে।"

বলেই জুতো খটখটিয়ে চলে গেল আহেলি মুখার্জী। অধিরাজ এবার স্বস্তির নিঃশ্বাস নিয়ে ধপ্ করে নিজের চেয়ারে বসে পড়ল, "উঃ! মা তারা!"

আর আজকেই তাদের ডিনারে যাওয়ার প্রোগ্রাম। সকাল থেকেই পবিত্র আর ডঃ চ্যাটার্জী তার পেছনে লেগেছেন। এমনকি অর্ণবকেও ছাড়ছেন না। পবিত্র তো বলেই দিল, "রাজা আহেলিকে নিয়ে একা যাবে? তুমি পাহারা দিতে যাচ্ছ না! সে কী!"

– "দেখো বস্, আহেলিকে আমি তোমার কথামতো আধঘণ্টা আগে ছেড়েছি। একটুও ট্যাঁ ফোঁ করিনি...।" ডঃ চ্যাটার্জী বললেন, "ও চেঞ্জ করতে গিয়েছে। আশা করি মাঞ্জা দিতে একটু সময় লাগবে। সেই ফাঁকেই একটু বুঝিয়ে বলো না ভাই যে ধরলে কী করে? আমাদের তো পুরো মাথার ওপর দিয়ে গেল! পুরো নর্ম্যাল্ডিক্যালি গর্ম্যান্ডেড!"

"অর্ধেক কথা তো প্রিয়া বাজাজই বলে দিয়েছে। বাকিটা বলছি শুনুন।" সে মৃদু হাসল, "প্রিয়া বাজাজকে একদম শুরুতেই সন্দেহ করেছিলাম। ক্রাইমের প্যাটার্নটা দেখুন। টাকা-

পয়সার কোনও গল্প নেই। একজন গুপ্ত প্রেমিকা আছেন ঠিকই, কিন্তু তিনি প্রেমিকদের পকেট ফাঁকা করেননি। আর বেছে বেছে কাদের মারছে? যাদের ঘরে বৌ-বাচ্চা আছে, স্ত্রী কৃষ্ণবর্ণা বা অসুন্দর, ঠিক তাদেরই মারছে সে। কেন? এটা মোটেই কোনও প্রেমিকার কাজ নয়। বরং সাইকোকিলারের কাজ হতে পারে। কিন্তু মোটিভ কী?

এদিকে সর্বনাশিনীর প্রোফাইল থেকে দুটো ক্লু পেয়েছিলাম। প্রথমত, কালো রঙ এবং নিগ্রোবটু চেহারা তার চূড়ান্ত অবসেশন! নয়তো সবাইকে ছেড়ে হ্যালি বেরি, লুপিতা নঙিয়ো, জ্যানেট জ্যাকসন বা মেগান গুডই তার মনে এল! সে নিজে কালো নয়। নয়তো কালো মেয়ের ছবি পোস্টই করত না। কিন্তু তার কোনও প্রিয়তম মানুষের গায়ের রঙ কালো হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা। কোনও না কোনও কানেকশন তো আছেই। দ্বিতীয়ত তিনি বাংলা সাহিত্য পড়েন। আরও স্পেসিফিক্যালি বলতে গেলে তিনি ভৌতিক গল্প পড়তে খুব ভালোবাসেন।”

“ভৌতিক গল্প?” ডঃ চ্যাটার্জী অবিকল গারফিল্ড নামক হুলো বিড়ালের মতো চোখ করেছেন, “সেটা কী করে বোঝা গেল?”

‘হরর স্টোরি পড়ে বলেই প্রোফাইলটার নাম সর্বনাশিনী রেখেছে।”

সে বুঝিয়ে বলে, “আমার মাথাতেই এই নামটাই প্রথমে স্ট্রাইক করেছিল। নামের পেছনে যে নারী আছেন তাঁর যুবতী ও আধুনিকা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তার প্রোফাইল নেম কি না ‘সর্বনাশিনী’! আপনারা জানেন কি না জানি না, প্রবাদপ্রতিম সাহিত্যিক পাঁচকড়ি দে’র একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ভৌতিক গল্পের নাম ‘সর্বনাশিনী'। আর আশ্চর্যের বিষয় যে সেই গল্পটিতেও একজন সুন্দরীর বিদেহী আত্মা প্রেমের জালে ফাঁসিয়ে বিবাহিত পুরুষদের শেষপর্যন্ত খুন করে বা আত্মহত্যা করতে বাধ্য করায়। সেম প্যাটার্ন। আমি তখনই বুঝেছিলাম— এ মাল নির্ঘাৎ প্রচুর ভূতের গল্প পড়ে। নয়তো পাঁচকড়ি দে'র এই গল্পটা তার চোখে পড়ত না! কিন্তু নিঃসন্দেহে সে পড়েছে। সেইজন্যই প্রোফাইলটার নাম ‘সর্বনাশিনী’।” এত কিছু “শুধুমাত্র একটা ফেক প্রোফাইলের নাম আর ছবি দেখেই বুঝলে!” ডঃ চ্যাটার্জী বললেন, “ধন্যি ছেলের অধ্যবসায়! ওটা তো পবিত্র, অর্ণব থেকে শুরু করে

সবাই দেখেছে। এমনকি আমি আর এডিজি সেনও দেখেছি। আমরা তো কই বুঝলাম না? আমাদের তো মনে হচ্ছিল যে কোনও ক্লু-ই নেই! পুরো ব্লাইন্ড কেস!"

-"আপনি গল্পের বই পড়েন যে বুঝবেন? নেহাৎ এখন হাইভোল্টেজ মিস্ অগ্নিকুন্ডের ঠ্যালায় পড়ে থ্রিলারপ্রেমী হয়েছেন। আর প্রেমে পড়লে লোকে 'ব্লাইন্ড'ই হয়!"

ডঃ চ্যাটার্জী 'গররঘ্যাক ঘ্যাক' মার্কা একটা শব্দ করে লাফিয়ে ওঠেন— "ওঁর নাম মোটেই অগ্নিকুন্ড নয়। ওঁর নাম...!"

— "আই নো! থ্যাঙ্ক ইউ।" অধিরাজ তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলতে শুরু করে, —"আপাতদৃষ্টিতে দেখলে সত্যিই কোনও ক্লু নেই। কিন্তু কোনও ক্রাইমই পারফেক্ট নয়। খুনীর অবচেতন মন সবসময় নিজের অজান্তে কোনও না কোনও ক্লু দিয়েই দেয়। যা সে সজ্ঞানে গোপন করছে, তা তার অবচেতন মন সবসময়ই প্রকাশ্যে আনতে চায়। আমি সেই অবচেতন মনকেই ট্র্যাক করছিলাম। তাই হ্যাকারদের লিস্টে যখন রিয়া বাজাজের নাম এল, তখনই প্রিয়ার ওপর সন্দেহ গেল। রিয়া হ্যাকিং এক্সপার্ট হলেও অ্যাবনর্মাল। কিন্তু তারও রাগের বহর কম নয়। তার ব্যাকগ্রাউন্ডের ট্র্যাজেডিটাও মারাত্মক। মায়ের গায়ের রঙ কালো হওয়ার জন্য কী পরিমাণ লাঞ্ছিত হয়েছেন তিনি, তা সে শুনেছে মাত্র। তাতেই কী রি-অ্যাকশন হয়েছিল তা সর্বজনবিদিত। তাহলে একবার প্রিয়ার অবস্থা ভাবুন! কী প্রচণ্ড যন্ত্রণায় তার মায়ের মৃত্যু হয়েছিল তা নিজের চোখেই দেখেছেন। কিন্তু তখন কিচ্ছু করতে পারেননি! তার দুজন প্রিয়তম মানুষ অহল্যা বাজাজ আর রিয়া বাজাজই নিগ্রোবটু চেহারার মালিক। আর যাঁরা সর্বনাশিনীর ভিক্টিম হয়েছেন তাঁদের প্রত্যেকের প্রোফাইল উমঙ্গ অ্যান্ডু বাজাজের সঙ্গে খাপ খায়! আমার প্রথমেই মনে হয়েছিল যে এই সাইবার ক্রাইম, হত্যা এবং রিয়া বাজাজ ও প্রিয়া বাজাজের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ক থাকার সম্ভাবনা জোরালো। অন্তত স্পষ্ট একটা সাইকোলজিক্যাল মোটিভের প্যাটার্ন দেখা যাচ্ছিল। অপরাধী যেভাবে একটার পর একটা চাল দিচ্ছিল, তাতে এটাকে ক্রাইম কম, দাবাখেলাই বেশি মনে হয়। অন্তত এর পেছনে কোনও ওস্তাদ দাবাড়ুর মস্তিষ্ক থাকার প্রব্যাবিলিটি ছিল। অ্যান্ডু বাজাজ অসাধারণ দাবাড়ু ছিলেন। উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর মেয়েদেরও দাবা খেলার টেন্ডেন্সি থাকা অস্বাভাবিক নয়। তাই প্রিয়া বাজাজই আমার

প্রথম সাসপেক্ট ছিলেন। কিন্তু মাঝখানে বিজয় জয়সওয়াল আর মানসী জয়সওয়াল টপ্‌কে পড়লেন। কেস এবার মানসীর দিকে ঘুরল। কিন্তু মানসীকে সন্দেহ করলেও ক্লিনচিট দিয়ে দিয়েছিলাম। কেন, সেটা আগেই বলেছি। অ্যাডেলিন বাজাজকেও ছাড়িনি। একেই বাজাজ, তার ওপর তাঁর হাতে আবার মাকড়সার ট্যাটু। মাকড়সা মানেই জটিল মনস্তত্ত্ব! মহিলা তুখোড় দাবাড়ুও বটে। তাই অর্ণবকে বসিয়ে দিলাম তার সঙ্গে দাবা খেলতে। এবং তিনিও ক্লিনচিট পেলেন।" অর্ণব চোখ কপালে তুলে বলল, "তিনি আবার কী করে ক্লিনচিট পেলেন! আমি তো কিছুই বুঝলাম না!"

"বুঝিয়ে দিলেই বুঝবে।" অধিরাজ মৃদু হাসল, "আমাদের সর্বনাশিনীর স্বভাবটা দেখো। কালো রঙের প্রতি যার এত অবসেশন সে কখনও সাদা ঘুঁটি নিয়ে খেলবে? কখনও না! লক্ষ্য করো, শেষে যখন ডঃ বিজয় জয়সওয়ালের বাড়ির চেসবোর্ডে ফিঙ্গারপ্রিন্ট খোঁজা হল, তখন সাদা ঘুঁটি আর কালো খুঁটিতে মোটামুটি সবারই হাতের ছাপ পাওয়া গেল। ব্যতিক্রম শুধু অহল্যা আর শিনা। ওদের ফিঙ্গারপ্রিন্ট শুধু কালো খুঁটিতেই আছে। অহল্যা আগেই বাদ গিয়েছেন। তার মানে শিনা কখনও সাদা ঘুঁটির পক্ষে খেলেননি, অলওয়েজ কালো ঘুঁটিতেই খেলেছেন।"

"এটা আমাদের মিসগাইড করার জন্যও তো হতে পারতো ।"

"পারত যদি তুমি পনেরোবারই না হারতে। যে কালো মেয়েদের উদ্ধার করার জন্য নেমেছে, কালো রঙ যার সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে আছে সে কি কখনই কালো রানিকে হারতে দেবে? অ্যাডেলিন যদি সর্বনাশিনী হতেন তবে হয় সাদা ঘুঁটি নিয়ে খেলতেনই না, নয়তো প্রত্যেকবারই তোমাকেই জিততে দিতেন। কারণ তুমি কালো রানিকে নিয়ে খেলছিলে। জাস্ট সাইকোলজি বস্।"

অর্ণব কপালে চোখ তুলে ফেলেছে! বাপ্ রে! কী ইকোয়েশন। ডঃ চ্যাটার্জী শ্রাগ করলেন, "দম আছে।"

"সাসপেক্টদের মধ্যে দুজন কমল। এবার ডঃ বিজয় জয়সওয়ালদের দিকে তাকানো যাক। তাদের পরিবারে অলরেডি হয়তো একটা খুন হয়ে গিয়েছে। অহল্যা জয়সওয়াল কৃষ্ণাঙ্গী, তুখোড় চেসপ্লেয়ার, অসম্ভব ব্যক্তিত্ব, বাংলা সাহিত্য পড়েন, বোটানিস্ট না হলেও

ডাক্তার ছিলেন, তার ওপর গার্ডেনিংও করেন! যদিও তখনও বিষটার নাম আমরা জানতাম না, কিন্তু সেটা অ্যাকর্ডিং টু ডঃ চ্যাটার্জী, ভেষজ বিষ হওয়ার চান্স ছিল। সবই ঠিক আছে, কিন্তু আমার মনে হয়েছিল অহল্যা ঠান্ডা মাথার খুনী হতে পারেন, কিন্তু গৌরব জয়সওয়ালকে বিষ দিয়ে মারতে পারেন না। তাঁকে যথেষ্টই স্নেহময়ী বলে মনে হয়েছিল। লক্ষ্য করে দেখো, যে রাধিকার সঙ্গে তাঁর স্বামীর অবৈধ সম্পর্ক, যে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী, তাকেও যথেষ্টই স্নেহ করেন। অর্থাৎ রাধিকাকে ক্ষমা করার শক্তি আছে তাঁর। সেই ক্ষমাসুন্দর মহিলা কখনও বিষ দিয়ে ছেলেকে বা স্বামীকে মারবেন? বরং রাধিকাকে -

মারলে তবু সন্দেহ হয়। কিন্তু নিজেরই স্বামী ও ছেলে তাঁর ক্ষমা পাবে না? পরে তো প্রমাণই হয়ে গেল যে তিনি কখনই তা পারতেন না।”

“শিনা জয়সওয়ালকে কখন সন্দেহ হল?”

—“প্রথম দেখাতেই। তিনি গোটা ঘটনায় চুপচাপ থাকলেও প্রথমেই মিস্ ঘোষকে বলে বসলেন, ‘আই ডি কার্ড আছে?’ বোঝো ঠ্যালা! ‘সি.আই.ডি’ থেকে আসছি' বললেই বেশিরভাগ লোকের, বিশেষ করে মেয়েদের মুখ শুকিয়ে যায়। তারপর আর কোনও কথা বলার সাহস থাকে না। কিন্তু শিনা তো রীতিমতো পালটা টেনশন দিয়ে দিলেন। সাহসটা কোন লেভেলে একবার ভাবুন! তখনই বুঝেছি, এ পাবলিক পুরো আইসবার্গ! যতটা জলের ওপরে ঠিক ততটাই, বা তারও বেশি জলমগ্ন। ওদিকে আবার তিনি আবার ভূতের গল্প পড়তেও ভালোবাসেন! সে অবশ্য রাধিকা আর অহল্যাও পড়েন। কিন্তু তারপরই চোখ পড়ল ওর হাতের ট্যাটুতে। রেড-ব্ল্যাক স্পাইডারম্যান। তখনই বুঝেছি এ বেটি সাঙ্ঘাতিক! সর্বনাশিনী হওয়ার প্রবল চান্স!”

– “কেন? মাইলস্ মরালস কৃষ্ণাঙ্গ বলে?” অর্ণব ফের অবাক, “কিন্তু শিনা তো কমিকস পড়েন না বলেছিলেন। তবে কি স্টেটমেন্টটা মিথ্যে?”

“না। সত্যি। তোমরাও জয়সওয়ালদের বাড়ি সার্চ করেছ। শিনার ঘরও নিশ্চয়ই দেখেছ। সেখানে কোনও কমিকস পেয়েছিলে কি? আমি অন্তত লিস্টের মধ্যে মার্ভেল কমিকসের নাম পাইনি।”

— “না। ছিল না। তার মানে শিনা সত্যিই মাইলস্ মরালসকে চেনেনই না। তবে?”

– "এইখানেই আসল প্যাঁচ! ফের অবচেতন মনের কারিকুরি। যে অবচেতন মন সবসময়ই জানান দেয়, তুমি আমায় চিনতে পারছ না ঠিকই, কিন্তু আমি এখানে আছি। আমিও ব্যাপারটা তখনই ধরতে পারিনি। কিন্তু যখনই মানসী আর অ্যাডেলিনের নাম কাটা গেল তখনই বুঝলাম। সেই মুহূর্ত থেকেই আমি নিশ্চিত হলাম যে শিনা জয়সওয়ালই আসলে সর্বনাশিনী।"

"সেটা বুঝলে কী করে?" অধিরাজ স্মিত হাসল, "ইজি। শুধু কয়েকটা অঙ্ক মেলাতে হয়েছে স্টেপ বাই স্টেপ। প্রথমতা, শিনা জয়সওয়াল মাইলস মরালসকে চেনেন না, তবে মাইলস মরালসের লাল-কালো স্পাইডার অবতারের ট্যাটু করিয়েছেন কেন?"

"কেন?" এবার অর্ণব আর ডঃ চ্যাটার্জী একসঙ্গে বলে ওঠেন। 'একবার স্পাইডারম্যানের কনসেপ্ট থেকে বেরিয়ে আসুন তবেই বুঝবেন। স্পাইডার ম্যান সুপারহিরো। কিন্তু যদি তাকে নজর আন্দাজ করেন তবে কী পাবেন? একটা লাল কালো রঙের মাকড়সা! লাল কালো কম্বিনেশনের অনেক মাকড়সাই আছে। কিন্তু আমার পাপী মনে একটা বিশেষ মাকড়সার কথাই এল। ব্ল্যাক উইডো স্পাইডার! এই জাতীয় ফিমেল মাকড়সারা পুরুষ মাকড়সাদের সঙ্গে সেক্স করে মেরে ফেলে! আমাদের সর্বনাশিনীও ঠিক সেই কাজটিই করছেন! তার প্যাটার্নও সেই এক। পুরুষদের সঙ্গে সেক্স এবং খুন! ইঙ্গিতটা সরাসরি না হলেও আমার মাথায় ঢুকেছিল।"

"কী সাঙ্ঘাতিক!" ডঃ চ্যাটার্জী হেঁচকি তুললেন, "কী ভয়ঙ্কর!"

"গোল্ডেন মুনে গিয়েও বেশ কিছু তথ্য পাওয়া গেল। যেমন কথাপ্রসঙ্গে মানসী জয়সওয়াল জানিয়েছিলেন, রিসর্টে অনেক ছেলে ছেলেদের সঙ্গে ও অনেক মেয়ে মেয়েদের সঙ্গে রাত্রিবাস করতে আসে। তাঁর এই কথাটাকেই আরও সূচীমুখ করে করোবরেট করলেন অ্যাডেলিন বাজাজ। তিনি জানালেন যে শিনা জয়সওয়াল লেসবিয়ান এবং কোনও মুসলিম মেয়ের সঙ্গে তাঁর অ্যাফেয়ার চলছে। প্রশ্ন হল, অ্যাডেলিন এই তথ্যটা পেলেন কোথায়? তার মানে তিনি নিশ্চয়ই শিনাকে কোনও মেয়ের সঙ্গে রিসর্টে ঢুকতে স্বচক্ষে দেখেছেন। কিন্তু মেয়েটি যদি সাধারণ পোষাকে থাকত তবে সে কোন্ ধর্মের তা অ্যাডেলিন বুঝলেন কী করে? ওঁদের তো কোনওরকম ডকুমেন্টসও

মেইনটেইন করা হয় না। করলে তবু নাম দেখে ধর্ম বোঝা যেত। শুধু মুখ দেখেই কোনও মেয়ে হিন্দু, মুসলিম না ক্রিশ্চান তা বোঝা যায়? একটাই সম্ভাবনা! বোরখা বা হিজাব! অ্যাডেলিনের খেয়ে দেয়ে কাজ নেই যে উনি হিজাব সম্পর্কে রিসার্চ করবেন। তার মানে শিনার সঙ্গী যে ছিল সে বোরখা পরেই ছিল। আর বোরখার একটাই সুবিধা। তার নীচে নারী আছে না পুরুষ বোঝাই যায় না। শিনার সঙ্গে প্রত্যেকবারই পুরুষ সঙ্গীরা বোরখা পরে রিসর্টে এন্ট্রি মেরেছিল। যখন পুলিস সঞ্জীব রায়চৌধুরী ও অর্জুন শিকদার মৃত্যুর আগে কোথায় ছিলেন তা তদন্ত করে দেখার জন্য সব রিসর্টে তাঁদের ছবি রোটেট করিয়েছিল, তখন গোল্ডেন মুন ক্লাব অ্যান্ড রিসর্টেও সেই ছবি গিয়েছিল নিশ্চয়ই। তখন কেউ তাদের মেম্বার হিসেবে শনাক্ত করলেও বোর্ডার হিসাবে চিনতে পারেনি। কারণ তেনারা তো বোরখার তলায় পর্দানসীন ছিলেন! ইনফ্যাক্ট আমরা ডঃ বিজয় জয়সওয়াল ওখানে চেক ইন করেছেন কিনা সে প্রশ্ন করলেও কেউ বলতেই পারত না। কারণ ডঃ বিজয় জয়সওয়াল চেক ইন করেনইনি। চেক ইন করেছেন তো লেসবিয়ান শিনা জয়সওয়াল উইথ বোরখাধারী বান্ধবী!"

"উঃ! পুরো জ্বালিয়ে দিয়েছে মেয়েটা।" ডঃ চ্যাটার্জী বললেন, "কী বদমায়েশি বুদ্ধি!"

"যে মাথা থেকে এই বুদ্ধিটা বেরিয়েছে সে মস্তিষ্কটাকে আন্ডার এস্টিমেট করবেন না ডক্! পুরো কলকাতা পুলিস, সি.আই.ডি হোমিসাইডকে এরকমভাবে নাকে দড়ি দিয়ে আর কেউ ঘোরায়নি।" তারপর?"

"তা বটে।"

"তারপর অর্ণব কামাল করল। অর্জুন শিকদার আর অহল্যা জয়সওয়ালের ম্যাচের স্কোরশিটগুলো হাতসাফাই করে দিল। সেই স্কোরশিট দেখলেই বোঝা যায় যে অর্জুন শিকদার রীতিমতো ভালো খেলোয়াড় হয়েও পুরো উলটো-পালটা চাল খেলেছেন! গেমে মনই ছিল না। তবে মন কোথায় ছিল? সম্ভবত অহল্যা জয়সওয়ালের পাশে যে সুন্দরীটি বসেছিলেন তার দিকেই নজর আর মন দুইই ছিল। সে সুপর্ণা জয়সওয়াল হতে পারে না। রাধিকাও না।"

"রাধিকা কেন নয়?"

“আবার অ্যাডেলিন বাজাজের কাছেই ফিরে যাই। তাঁর স্টেটমেন্ট অনুযায়ী অহল্যার বড় বৌ শ্বশুরের সঙ্গে ঘোরে। অর্থাৎ দুজনের সম্পর্ক সর্বজনবিদিত। এবার অহল্যার চরিত্র দেখুন। আপনার মনে হয়, যে বিশ্বাসঘাতিনী তাঁরই স্বামীর সঙ্গে প্রেম করছে, তাকে ট্যাকে করে তিনি ঘুরে বেড়াবেন? অহল্যা রাধিকাকে ক্ষমা করতে পারেন। কিন্তু তাকে নিজের আনন্দের সঙ্গী করতে পারেন না। তাঁর ব্যক্তিত্বে আটকায়। সুতরাং রাধিকা নয়, তাঁর সঙ্গে যে সুন্দরী বসে অর্জুন শিকদারকে সম্মোহিনী হাস্যে, লাস্যে বিভ্রান্ত করছিলেন, তিনি শিনাই। একে তাঁর শাশুড়ির নামও অহল্যা, তিনিও কৃষ্ণবর্ণা, তার ওপর কালো ঘুঁটি নিয়ে খেলছিলেন! তাঁকে কখনও হারতে দিতে পারেন শিনা! তাই অর্জুন শিকদারকে পটলচেরা চোখ দিয়ে এইসান চাকু মারলেন যে লোকটা দাবা খেলার বদলে লুডো খেলতে শুরু করে দিল!

আমার এদিকে তখন চাপের চোটে গলদঘর্ম অবস্থা! শিনা জয়সওয়ালকে সর্বনাশিনী মনে হচ্ছে তো মোটিভ পাচ্ছি না! অন্য দিকে প্রিয়া বাজাজের মোটিভ আছে, কিন্তু বাজাজ ফ্যামিলি হাওয়া! আবার অন্যদিকে আহেলি যে ডোরপেইন্টের লিডটা দিল, সেটা জুয়েলার বিজয় জয়সওয়ালের ঠিক উলটোদিকের ফ্ল্যাট! জনৈক অহনা ভট্টাচার্যের ফ্ল্যাট! এখানেও দেখো, অহনা নামটা অহল্যার খুব কাছাকাছি। আমার মনে হয়েছিল, মেরিলিন প্ল্যাটিনামের মধ্যেই কিছু গোলমেলে ব্যাপার আছে। সেইজন্যই সেদিন যখন অর্ণব আর পবিত্র মিলে গগনকে তাড়া করেছিল, তখনই বুঝেছিলাম সে ব্যাটা নির্ঘাৎ মেরিলিন প্ল্যাটিনামেই যাচ্ছে। তার পেছন পেছন গিয়ে দেখতে চেয়েছিলাম ঠিক কার সঙ্গে ও দেখা করে। কিন্তু প্রিয়া বা শিনা সে সুযোগই দিলেন না। তিনি তখনই লোকটাকে শ্যুট করে দিয়ে কোথাও একটা লুকিয়ে বসেছিলেন। আমি তাকে ধরেও ফেলতাম। কিন্তু তার মধ্যেই বেচারি রিয়া তাকে খুঁজতে খুঁজতে অকুস্থলে পৌঁছল। লোকটাকে মরতে দেখল! এবং যখন আমি পৌঁছলাম, ও আমাকে মিঃ বাজাজ ভেবে শুধু ভয় পেয়ে আনতাবড়ি গুলি চালাল! আনতাবড়িই চালিয়েছিল! কারণ ও অ্যাকশনটা রিপিট করেছিল মাত্র। ওর এটাই সমস্যা। একই কাজ বারবার রিপিট করে। সেইজন্যই সম্ভবত প্রিয়া ওকে ভুলিয়ে ভালিয়ে

নীচে নামিয়ে আনার পরও ফের ও আমার কাছেই ফিরে গিয়েছিল। নয়তো ওর কী দায় পড়েছিল বন্দুক হাতে নিয়ে পোজ মেরে বসে থাকার!

– "গুলিটা তোমাকে তবে রিয়াই মেরেছিল?" ডঃ চ্যাটার্জী ভুরু কুঁচকে বললেন, "কিন্তু আগে অস্বীকার করলে যে!"

"সে তো আমাকে কোর্টে দাঁড় করালেও অস্বীকার করব। রিয়ার সাইকায়াট্রিস্ট দরকার, শাস্তি নয়।"

"আমি পড়ে যাওয়ার আগে রিয়া বাজাজকে চিনতে পেরেছিলাম। তখনই স্পার্ক করেছিল যে গোটা ঘটনার পেছনে কোথাও না কোথাও বিগ সিস্টারও আছেন। তারপর যখন হুঁশ এল ততক্ষণে আপনি আর অর্ণব নিজেদের অজান্তেই অনেকটা এগিয়ে গিয়েছেন। আপনি অ্যামাটক্সিন-এক্সকে বের করতে পেরেছিলেন! বিষটা কী দেখুন! সায়ানাইড নয়, থ্যালিয়াম নয়, আর্সেনিক নয়, স্ট্রিকনিও নয়! অ্যামাটক্সিন এক্স! বিষটার হাপিশ হয়ে যাওয়া ছাড়া আরও একটা বৈশিষ্ট্য আছে। অ্যামাটক্সিন তিলে তিলে যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু দেয়। ওদিকে অহল্যা বাজাজের মৃত্যুটাও দেখুন। একটু একটু করে যন্ত্রণা পেয়ে মরেছিলেন তিনি। সেই যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর সমান যন্ত্রণা দিতে পারত অ্যামাটক্সিন এক্স। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হল, এর মধ্যে কোথাও প্রিয়া বাজাজ তো আছেনই। এ তারই প্রতিশোধ। কিন্তু তখনও লিঙ্কটা বুঝিনি। অর্ণব আর পবিত্র যখন ইনভেস্টিগেশনকে এগিয়ে নিয়ে গেল। তখন বুঝলাম।"

-বেশ। তারপর?"

"সেটাও দয়া করে বলবে প্লিজ? না প্রত্যেকবারই তোমাকে ইনভিটেশন লেটার দিতে হবে গল্প পাঠ করার জন্য?" ডঃ চ্যাটার্জী ফের অধৈর্য।

অধিরাজ স্মিত হাসল, "এর পেছনে খানিকটা আপনার অবদান আছে। আপনি অর্জুন শিকদারের চামড়ায় যে বিশেষ ধরনের ল্যাভেন্ডার অয়েল পেয়েছিলেন, সেই অয়েল শুধুমাত্র মানসী জয়সওয়ালের ল্যাবে তৈরি হয়। গোল্ডেন মুনের স্পা স্যালোনেও ইউজড হয়। অন্যদিকে মৃত্যুর আগে অর্জুন শিকদার একটা ম্যাসাজ নিয়েছিলেন। আমি নিজে

ম্যাসাজ নিতে গিয়ে হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছি সেখানে আর কী কী হতে পারে! অর্থাৎ, অর্জুন শিকদার বা সঞ্জীব রায়চৌধুরীর মতো লম্পটের হাতবাক্স ম্যাণ্ড্যজকে আস্ত ছাড়বেন না! ওটাও সেক্সের আরেকটা আর্ট। সর্বনাশিনীও এই কাজে এক্সপার্ট। এখন প্রশ্ন হল, সে 'নিশানের' প্রোডাক্টটা পেল কোথা থেকে? ওটা বাইরে কিনতে পাওয়া যায় না। আর নিশান নিজেদের প্রোডাক্ট কাউকে দেয় না। তবে কন্যে সেটি জোটালেন কোথা থেকে? এর একটাই সহজ উত্তর। স্বয়ং মালকিনের ঘর, তথা ফ্ল্যাট থেকে। তিনি ম্যাসাজ দেওয়ার সময় কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন তাঁর পাশের ফ্ল্যাটেই একটি গোয়ানিজ মহিলা থাকে। উনি নিজের ম্যাসাজ আর স্পা ওকে দিয়েই করান। এত সুন্দর ম্যাসাজ করে যে ঘুম এসে যায়। প্রশ্ন হল ওখানে একটিই গোয়ানিজ ক্রিশ্চানকে পেয়েছি আমরা। অ্যালিস! এবং তার ম্যাসাজের চোটে যখন মানসী ঘুমিয়ে পড়েন, তখন একটা ল্যাভেন্ডার অয়েল হাপিশ করে দেওয়া এমন কিছু ব্যাপারই নয়! এই স্কোপটা শুধু তারই ছিল। কিন্তু তার স্বার্থ কী! আমি তো শিনা জয়সওয়াল আর প্রিয়া বাজাজের মধ্যেই পিংপং বলের মতো লাফাচ্ছি। এবার অ্যালিসকে নিয়ে কী করব? আবার কনফিউশনে পড়লাম। কিন্তু অর্ণব আর পবিত্রর দেওয়া সমস্ত ফুটেজ দেখে বুঝলাম, খামোখাই ফুটেজ খাচ্ছি! অ্যালিস নামের কোনও ক্যারেক্টার বাস্তবে এক্সিস্টই করে না। তার গল্প প্রিয়ার ষোল বছর বয়েসেই শেষ।"

"হে ভগবান! সেটাই বা কী করে বুঝলে! সবই কেন তুমি একাই বুঝবে! আশ্চর্য!" ডঃ চ্যাটার্জী চটে লাল। "আমরা কিছু বুঝব না কেন?" "বুঝিয়ে বললে আপনিও বুঝবেন। প্রিয়ার ছবিটা দেখেছিলেন আপনি? তিনি একটা কালো ফ্রক পরে 'ক্রিশ্চিয়ান বারিয়াল গ্রাউন্ড' এর সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। ক্রিশ্চানরা কালো পোষাক পরে কখন? যখন সে মোর্নিং এ থাকে। হয় কাউকে কবরস্থ করতে যায়, অথবা কারোর কবরে ফুল দিতে। প্রিয়া তবে ক্রিশ্চিয়ান বারিয়াল গ্রাউন্ডের সামনে কালো পোষাকে দাঁড়িয়ে কী করছিলন? কাকে কবরস্থ করতে বা কার কবরে শোকপ্রকাশ করতে গিয়েছিলেন তিনি? অ্যান্ড্রু বাজাজ তখনও জীবিত। আর মরলেও প্রিয়া তার কবরে থুতু ফেলতেও যাবেন না। তবে কে?"

"অহল্যা?" -

"ওঃ! অর্ণব, তুমি কোনকথাই ঠিকভাবে শোনো না। অহনা 'শ্মশান' থেকে ফিরে প্রিয়া সোজা পুলিস স্টেশনে গিয়েছিল। অর্থাৎ অহল্যাকে হিন্দুমতে দাহ করা হয়েছিল। তিনি ধর্মান্তরিত হননি।" -

- "অ্যান্ড্রু বাজাজের ধর্মপিতা?"

"এটা অবশ্য খানিকটা কাছাকাছি গেস্। কিন্তু তিনি চার্চের ফাদার ছিলেন। সচরাচর চার্চের ফাদাররা মারা গেলে চার্চের সংলগ্ন জমিতেই সমাধিস্থ করা হয় তাঁদের। একজন ফাদার খামোখা 'ক্রিশ্চিয়ান বারিয়াল গ্রাউন্ড' এর মতো পাবলিক বারিয়াল গ্রাউন্ডে থাকবেন কেন? এক্ষেত্রে আরেকজনই বাকি থাকে যে বাজাজ ফ্যামিলির অংশ ও একটি কবরের দাবিদার। অ্যালিস ! প্রিয়া অ্যালিসের মৃত্যুর জন্যই মোর্নিঙে ছিলেন। এবং সেজন্যই ব্যাকগ্রাউন্ডে 'ক্রিশ্চিয়ান বারিয়াল গ্রাউন্ড' এর দরজা দেখা যাচ্ছে। তার মানে অ্যালিসের মৃত্যু হয়েছে অনেক আগেই। তবে যিনি এখন আমাদের সামনে বসে আছেন, তিনি কে? একমাত্র তিনিই অ্যালিসের মতো সামলাতে পারেন রিয়াকে। রিয়ার মাসিও যা পারেন না, তিনি তা পারেন! রিয়াকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসত এমন শুধু দুজনই আছেন। স্বয়ং অ্যালিস, আর প্রিয়া বাজাজ। অ্যালিসকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন প্রিয়া। দেখেছেন সে কীভাবে রিয়াকে ট্রিট করত। সবচেয়ে বড় কথা এক অনন্ত স্নেহময়ীর জায়গা শুধু আরেক অনন্ত স্নেহময়ীই পূরণ করতে পারেন। অ্যালিসের শূন্যতা পূর্ণ করতে পারতেন একমাত্র প্রিয়া। এবং সম্ভবত তিনিই করেছেন।

এছাড়াও আরেকটা গোলমাল করেছিল অর্ণবরা। সমস্ত সন্দিগ্ধদের একটা ভাঙা চেয়ারে বসিয়ে ইন্টারোগেট করেছিল। আমিই ঐ চেয়ারটা প্রথম ভেঙেছিলাম।" অধিরাজ হেসে ফেলল, "ভেবে দেখুন ডক, আমার ওয়েট প্রায় ছিয়াশি থেকে সাতাশি কেজি! চেয়ারটা সেই ভারটা নিতে না পেরে আমাকে নিয়েই এক পা ভেঙে উলটে পড়েছিল। অন্যান্য মহিলারা ক্ষীণাঙ্গী। কিন্তু অ্যালিস! আমার তিনগুণ চেহারা ওর! ওজনও আমার থেকে বেশিই হওয়া উচিত। অথচ চেয়ারটা ভাঙা তো দূর, একটুও নড়েনি চড়েনি! মানেটা কী! অ্যালিস আমার থেকে হাল্কা! ইমপসিবল!"

"ব্রিলিয়ান্ট!"

"থ্যাঙ্কস।" ডঃ চ্যাটার্জীর প্রশংসাবাক্য নম্রভাবে গ্রহণ করল অধিরাজ, – "ব্যস। তখন থেকেই বুঝলাম অ্যালিস আদৌ অ্যালিস নয়। উনিই আসলে প্রিয়া বাজাজ! প্রিয়া বাজাজ যে একজন এক্সপার্ট হ্যাকার এবং মেরিলিন প্ল্যাটিনামে রীতিমতো সশরীরে উপস্থিত তারও ক্লু ছিল।"

"কীরকম?"

"রিয়ার বাড়ি থেকে কম্পিউটার সায়েন্সের বই, হ্যাকিং সম্পর্কে প্রচুর বই পাওয়া গিয়েছে। তার সঙ্গে ভৌতিক সমগ্র, থ্রিলারও আছে। সেগুলোর ওপরে রিয়া বাজাজের নামের স্টিকার সাঁটা। মজার কথা, কিছু বইয়ে রিয়ার 'আর' টা ক্যাপিটাল। কোথাও সেই 'আর' স্মল লেটারে! কিন্তু 'বাজাজের' 'বি' টা কনস্ট্যান্টলি ক্যাপিটাল। প্রথমে ভেবেছিলাম রিয়ারই বোধহয় মাথার ঠিক নেই। পরে বুঝলাম ওর মাথা যথেষ্টই ঠিক আছে। আমিই একখানা গবেট।"

"যাক, তবু এতদিনে বোধোদয় হয়েছে।" ডঃ চ্যাটার্জী ফোড়ন কাটলেন, – "কিন্তু তুমি যে গবেট সেটা প্রমাণ করল কে?" -

অধিরাজ মোলায়েম হাসল, "স্মল লেটারের 'আর'। রিয়া বাজাজ 'বি'টা কনস্ট্যান্টলি ক্যাপিটাল লিখল। অথচ 'আর' একবার ক্যাপিটাল, একবার স্মল কেন? রিয়া বাজাজের স্টেটমেন্টের নীচে মেয়েটা যখন সাইন করেছিল, তখন 'আর' এবং 'বি' দুটোই ক্যাপিটালে ছিল। অর্থাৎ ওর

এইটুকু সেন্স আছে। নামটা কীভাবে লিখতে হয়, তা ওর জানা। তবে 'আর' বারবার ভ্যারি করছে কেন? এর একটাই উত্তর। যেগুলো স্মল লেটারের আর, সেগুলোর 'আরে'র আগে একটা ক্যাপিটাল লেটার ছিল। কেউ সেটা চালাকি করে কেটে সরিয়েছে বা তুলে নিয়েছে। কী লেটার হতে পারে? অবভিয়াসলি ক্যাপিটাল 'পি'। ঐ বইগুলো রিয়ার নয়, প্রিয়ার ছিল। এবং সেগুলো যথেষ্ট আপডেটেড, নিউ এডিশনের! প্রিয়া বাজাজের নামওয়ালা নতুন বই যখন ওখানে আছে, তার মানে স্বয়ং প্রিয়া বাজাজও ওখানেই আছেন। তিনি কম্পিউটার সায়েন্স এবং হ্যাকিং সংক্রান্ত বই পড়েন! ফুল চান্স আছে যে তিনি রিয়ার থেকেও বড় হ্যাকার। আরও মজার কথা, ওখানেও ভূতের বই উপস্থিত!"

“বেশ। আগে?”

– “সবই বোঝা গেল। কিন্তু শিনার সঙ্গে যোগসূত্র কোথায়? লক্ষ্য করে দেখো, গোটা ইনভেস্টিগেশনে আরেকটা প্যাটার্ন আছে। যতক্ষণ অ্যালিস আমাদের চোখের সামনে আছে, ততক্ষণ শিনা সিনে নেই। তিনি ট্যুরে গিয়ে বসে আছেন। যেই অ্যালিস সিন থেকে সরল অমনি শিনা জয়সওয়াল হাজির হলেন। তাছাড়া শিনা মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ হওয়ার দরুণ সকালে বেরিয়ে যান, অনেক রাতে ফেরেন। মাঝেমধ্যে ট্যুরেও চলে যান। এই পেশাটাই এমন যে গভীর রাতে বাড়ি ফিরলেও কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করবে না। এখন যদি তার অফিসে গিয়ে খোঁজ নেওয়া হয় তবে জানা যাবে তিনি অফিসে ঠিকমতো যেতেনও না। ওদিকে অ্যালিসও একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর রিয়ার কাছে থাকে না। যদি থাকত তবে তার সতর্ক প্রহরার মধ্যে রিয়া মিঃ বাজাজের লাশ ভেবে ম্যানিকুইনটাকে টেনে বারবার ফেলে দেওয়ার মতো ব্লান্ডার করত না। কিন্তু সে করেছে। আর সবসময়ই অ্যাকশনটা রাতে হয়েছে। তার অর্থ ঐ সময়টা অ্যালিস ছিল না। ইনফ্যাক্ট রিয়াও কিন্তু বুঝতে পেরেছে যে অ্যালিস একটি মানুষ নয়, দুজন! সে পবিত্রকে কী বলেছিল মনে আছে। ওয়ান প্লাস ওয়ান ইকোয়ালটু ওয়ান। আর কত স্পষ্ট করে বলবে মেয়েটা?”

অর্ণব স্তম্ভিত! তাই তো! সত্যিই এই কথাটাই বলেছিল রিয়া বাজাজ। কিন্তু তার মানে এই!

—“এরপর যখন লিখিত স্টেটমেন্ট দিতে বললাম, তখন অ্যালিস আর শিনা, দুজনেই বিজয়কে ‘ভিজয়’ লিখল। এছাড়াও কিছু ইশারা ছিল। বাপের মতো দেখতে বলে প্রিয়া কসমেটিক সার্জারি করেছিল। উঁচু দাঁত সুন্দর করে সেট করেছিল। কিন্তু সে চশমা পরত। বড় হলে অনেকেরই চেহারা পালটে যায়। কিন্তু যার অত ভারি পাওয়ারের চশমা, তাকে লেন্স পরতেই হবে। আর আমাদের সমস্ত সাসপেক্টদের মধ্যে একমাত্র শিনাই লেন্স পরেন! মনে আছে অর্ণব, ওর চাউনিটা একটু অদ্ভুত ছিল? দেখলে মনে হত চমকে উঠেছেন বুঝি। আসলে ঐ চমকে ওঠা অভিব্যক্তিটাই লেন্সের সাইড এফেক্ট! লেন্স এদিক ওদিক সরলে অনেকেই চোখটাকে বড় বড় করে লেন্সটাকে অ্যাডজাস্ট করে নেয়। শিনাও সেটাই করছিলেন। আর আমাদের মনে হচ্ছিল, চমকে উঠছেন বুঝি! ওদিকে অ্যালিস থাকতেই

পারে না, অথচ আছে। প্রিয়ার থাকার সম্ভাবনা নেই, অথচ তার অস্তিত্ব টের পাওয়া যাচ্ছে। স্রেফ দুয়ে দুয়ে চার।”

“ওঃ!”

বিস্ময়ে অর্ণব কী বলবে বুঝে পায় না। কোনোমতে বলল, “কিন্তু মিঃ বাজাজ মারা গিয়েছেন সেটা কী করে বুঝলেন?”

“রিয়ার কাণ্ডটা শুনে। মিঃ অ্যান্ড্রু বাজাজের চেহারা দেখেছ? রীতিমতো টল, হ্যান্ডসাম। লম্বা ও সুগঠিত চেহারা ছিল বলেই রিয়া ভুল করে আমাকেই গুলিটা করেছিল। আর প্রিয়ার চেহারা দেখো! রোগা-প্যাকাটি মার্কা। ঐ রকম একটা মেয়েকে অ্যান্ড্রু বাজাজ মাটিতে ঘষে, টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাবেন না! প্রিয়াকে একহাতে তুলে নিয়ে ডাম্প করার ক্ষমতা তাঁর ছিল। কিন্তু যদি প্রিয়া অ্যান্ড্রু বাজাজকে মারেন, একমাত্র তখনই ঐ ভারী বডিটাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন পড়বে। আর রিয়া ম্যানিকুইনটাকে এত লোক থাকতে অ্যান্ড্রু বাজাজ ভাবত কেন? তাকে স্ট্যাবই বা করত কেন? কারণ সে স্বচক্ষে অ্যান্ড্রু বাজাজকেই খুন হতে দেখেছে। আর সেই অ্যাকশনটাকেই রিপিট করছে মাত্র। অ্যালিস ওরফে প্রিয়াও মুখ ফসকে বলে ফেলেছিল, ভুল সময়ে ভুল জায়গায় পৌঁছে যাওয়া রিয়ার ব্যাডলাক। একবার তো আমার ক্ষেত্রে ও ভুল সময়ে ভুল জায়গায় পৌঁছেছিল। কিন্তু অ্যালিসের কথা শুনে মনে হয় না এর আগেও ও কখনও ভুল সময়ে ভুল জায়গায় পৌঁছেছে? সেটা কখন? অবভিয়াসলি অ্যান্ড্রু বাজাজের হত্যাকাণ্ডের সময়ে।”

“বুঝলাম।” ডঃ চ্যাটার্জী ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললেন, “কিন্তু আমার একটা প্রশ্ন এখনও আন আনসার্ড রয়েছে। মিঃ বাজাজ তো আগেই টপকে গিয়েছিলেন। তবে তারপরে আবার কেন? মিঃ বাজাজকে মেরে শান্তি হয়নি?”

“হয়েছিল। সাময়িক শান্তি তিনি পেয়েছিলেন।” অধিরাজ বলল, “কিন্তু কপালে সুখ নেই মেয়েটার। বিয়ের পর ওর সামনে এসে দাঁড়ালেন অহল্যা জয়সওয়াল! প্রিয়া মা’কে অসম্ভব ভালোবাসতেন। তার মায়ের নাম অহল্যা। কী কপাল দেখো, এবার ওর জীবনে আরেক অহল্যা এলেন। সেই একইরকম! ব্যক্তিত্বময়ী, কৃষ্ণাঙ্গী, গভীরমনস্ক, সুনিপুণ

গৃহিনী। প্রিয়া বা শিনা জীবনে দুটি লোককে আপ্রাণ ভালোবেসে ছিলেন। সেই ভালোবাসায় কোনও খাদ নেই। একজন ওর বোন রিয়া বাজাজ। অন্যজন অহল্যা বাজাজ। মাকে হারিয়েছিলেন। তখন তাঁকে বাঁচানোর জন্য কিছু করতে পারেননি। কিন্তু এবার ওর জীবনে তৃতীয় ভালোবাসার মানুষটি এলেন। ওর মায়ের সমনামী, সমগুণসম্পন্না আরেকজনকে যখন দেখলেন, তখন মায়ের প্রতি যত সহানুভূতি, যত মমতা, যত ভালোবাসা ছিল, সব এসে পড়ল অহল্যা জয়সওয়ালের ওপরে। প্রিয়ার প্রকাশ কম ছিল। কিন্তু ভালোবাসার ক্ষেত্রে অসম্ভব প্যাশনেট। নিজের ভালোবাসার মানুষের জন্য সবকিছু করতে রাজি। আর কিছুদিনের মধ্যেই টের পেলেন যে এই অহল্যাও তার মায়ের মতোই যন্ত্রণাভোগ করছেন। সেই একই ট্র্যাজেডি। এইবার তিনি ঠিক করলেন কিছুতেই সেই একই অন্যায় হতে দেবেন না। অহল্যা জয়সওয়ালকে অহল্যা বাজাজের নিয়তি যাতে না গ্রাস করে সেজন্যই ফের ঘাতকের রোলে ফিরে গেলেন প্রিয়া। ঠিক করলেন ডঃ বিজয় জয়সওয়ালকে মারবেন। কিন্তু তার আগেও আরেকটি অপরাধী ছিল। গৌরব জয়সওয়াল। তিনি বিজয়ের থেকেও বড় অপরাধী। সন্তান হয়ে মায়ের সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। তাই তার নম্বরই প্রথমে এল। কী অদ্ভুত বুদ্ধি দেখো, প্রিয়া জানতেন, গৌরবের পরই যদি ডঃ বিজয় জয়সওয়াল মারা যান, তবেই সন্দেহ হবে ডাক্তারদের। তাই তৈরি হল সর্বনাশিনীর প্রোফাইল! গোটা ব্যাপারটাকেই একটা সিরিয়াল কিলিঙের রূপ দেওয়ার তালে ছিলেন। এবং সেটাই করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই যখন ডঃ বিজয় জয়সওয়ালের মতোই সঞ্জীব রায়চৌধুরী ও অর্জুন শিকদার একটি কালো মেয়েকে অপমান করলেন, তখনই তাদের ভাগ্য স্থির হয়ে গিয়েছিল। প্রিয়া ওখানেই ঠিক করেছিলেন এই দুটোকেই যমের বাড়ি পাঠাবেন। এর পেছনে তার পার্সোনাল ফিলিংসও ভীষণভাবে ছিল। তিনি অ্যান্ড্রু বাজাজের প্রায় নব্বই লাখ টাকা এবং গয়নাগাঁটিও হাপিশ করেছিলেন। তার টাকার অভাব কী? অতএব বোড়েও চলে এল। মেরিলিন প্ল্যাটিনামের গেটকীপার ও গোল্ডেন মুনের রেস্টোর‍্যান্টের ম্যানেজার। তারপর আর কী? শুরু হয়ে গেল সর্বনাশিনীর সর্বনেশে খেলা! সুপর্ণা জয়সওয়ালের মতো ক্রাইম রিপোর্টার ননদ থাকার দরুণ ক্রিমিনাল কেস, তদন্ত পদ্ধতি সব গুলে খেলেন। সুপর্ণা জয়সওয়ালের সবই ঠিক

আছে, কিন্তু চরম উদাসীন। তার ব্যাগ থেকে পুলিস কেস ফাইল উড়িয়ে নিয়ে পড়ে ফেলা কোনও ব্যাপারই নয়। হয়তো অনেক ক্রাইম সিনে সুপর্ণার সঙ্গে উপস্থিতও ছিলেন। তাই এমনভাবেই এগিয়েছেন যাতে পুলিস নর্মাল ইনভেস্টিগেশনে কোনও ক্লু না পায়। এই প্ল্যান তার একদিনের নয়। বরং বহুদিন ধরে ভেবেচিন্তেই প্ল্যানটা ফুলপ্রুফ বানিয়েছেন। একজন মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ বোটক্স থেকে শুরু করে রোহিপুল অবধি সব কিছু সম্পর্কেই জানবে। সবই তার হাতের কাছেই আছে। তারপর কী হয়েছে তা তো জানোই। তবে ডঃ বিজয় জয়সওয়ালের ক্ষেত্রে পুলিস আগেই স্টেপ নেবে সেটা জানতেন। তাই আমাদের ভুল দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য গগনের সঙ্গে যোগ সাজশ করে বেচারি জুয়েলার বিজয় জয়সওয়ালকে রোহিপ্পিল্ দিয়ে নিজেদের ফ্ল্যাটের স্টোররুমে বন্দী করে রাখলেন। ডঃ বিজয় জয়সওয়াল এক পুত্রবধূর সঙ্গে অলরেডি চক্কর চালাচ্ছিলেন। আরেক পুত্রবধূ দুরন্ত সুন্দরী শিনা যখন তাঁকে সিডিউস করল তখন প্রেমে লাউঘণ্ট হয়ে গেলেন। রাধিকার চেয়ে শিনা বেশি অ্যাগ্রেসিভ। বেশি সেক্সি। ছলা-কলায় এক্সপার্ট। সুতরাং তিনি স্বাভাবিকভাবেই রাধিকাকে ছেড়ে শিনার প্রেমে পাগল হলেন। বেচারা জুয়েলার বিজয় জয়সওয়াল! খায়া পিয়া কুছ নেহি, গ্লাস তোড়া চাল্লিস লাখকা কেস।"

"এত কাণ্ড হয়ে গেল অথচ অহনা জানতে পারলেন না?" অর্ণবের প্রশ্নের উত্তরে সে হাসল, "কে বলেছে জানেন না? প্রিয়া অ্যামাটক্সিন-এক্স কোথা থেকে পেয়েছিলেন সেটা বলছেন না কেন? সিম্পল! তার 'মাউ' কে বিপদে ফেলতে চান না। অহনা গোটাটাই জানতেন। তাঁর সমর্থনও হয়তো ছিল। তিনি ছাড়া আরেকজনও অবশ্য জানেন। অন্তত আন্দাজ করতে পেরেছেন।"

"কে?"

"অহল্যা জয়সওয়াল। অত্যন্ত বুদ্ধিমতী মহিলা। আমার আগেই মনে হয়েছিল তিনি কিছু সন্দেহ করেছেন। ভদ্রমহিলা শিনার ঘরে চুপিচুপি সার্চ অপারেশন চালালেন। এবং অ্যামাটক্সিন-এক্স ও মাউথওয়াশটাও পেলেন। বুঝতে পারলেন— কে এবং কেন? ভালোবাসাটা একতরফা ছিল না। শাশুড়িও বৌমাকে ভালোবাসতেন। কিন্তু তাঁর চরিত্রেও

আতিশয্য জিনিসটা ছিল না। তিনি শিনাকে গার্ড করার জন্য নিজের ওপর দায় নিয়ে নিলেন। শিনা তখন অ্যালিসের ভূমিকায় রিয়াকে সামলাচ্ছিলেন। শাশুড়িকে ব্যুরোয় দেখে লজ্জায় মরে গেলেন। হয়তো তখনই আত্মহত্যা করতেন। ভাগ্যিস্ আমি অহল্যাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ফেরত পাঠাতে পেরেছিলাম। নয়তো শিনা তখনই আত্মহত্যা করতেন।"
"তবে একমাস পরে ফের কেন?"

"প্ল্যানিং তেমনই ছিল।" অধিরাজ বলল, "কেন মরতে চেয়েছিলেন তা স্পষ্টই বলেছেন। সেখানে প্রশ্নের জায়গাই নেই। কিন্তু ফের আমাদের একটু ঘোল খাওয়ানোর লোভ সামলাতে পারেননি। এই ডেথ ফোরকাস্টের পেছনে যেমন সর্বনাশিনীকে প্রতিষ্ঠা করার তাগিদ ছিল, তেমনি পুলিস প্রশাসনকে ঘোল খাওয়ানোর ইচ্ছেটাও প্রবল। শিনা বা প্রিয়া স্পষ্ট বলেছিলেন, 'আপনার আইন কী ছিঁড়েছে?' দ্যাটস্ দ্য অ্যাটিটিউড! সত্যিই তো! তার সঙ্গে যা ঘটেছে সেটা অন্যায়। কিন্তু আইনের কিছু করার ছিল না। দশ বছরের এক মাইনর মেয়ে বারবার বলেছিল, 'এটা খুন'। আইন তার কথা শোনেনি। আইন-পুলিস-প্রশাসনে তার ঘেন্না ধরে গিয়েছিল। এবার তিনিও সেই আইনকেই চ্যালেঞ্জ করলেন, দ্যাখ তোদের নাকের সামনে দিয়ে একটার পর একটা খুন করছি, কী ছিঁড়তে পেরেছিস তোরা? মরার আগেও সেই একই কাজ করলেন। কারণ আমি তাকে নিশ্চিন্ত করতে পেরেছিলাম যে আমরা কিছুই বুঝিনি। ভুল লিড দিয়ে আনন্দ বাজাজের দিকে দৌড় করানোর জন্য আনন্দ বাজাজের ফেরার অপেক্ষা করলেন। সম্ভবত মানসী জয়সওয়ালের কাছ থেকেই খবরটা পেয়েছিলেন। মানসী জয়সওয়ালের সঙ্গে অ্যালিসের ভালো সম্পর্ক। অতএব ওখান থেকেই খবরটা লিক হল। এইবার তিনি ফের আমাদের নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরানোর জন্য আর.আই.পি পোস্ট মারলেন। কিন্তু এইবার প্যাঁচটা আমি বুঝেছিলাম। ইন ফ্যাক্ট, আর.আই.পি পোস্টটা ভীষণভাবে এক্সপেক্ট করছিলাম। কারণ তার হাতে আর কোনও চয়েজই ছিল না। কতদিন আর এই বিদ্বেষ বয়ে বেড়াবেন? তার ওপর অহল্যা তাকে স্বামী-পুত্রের হত্যাকারী হিসাবে শনাক্ত করে ফেলেছিলেন। আর বাঁচার অবলম্বন ছিল না। এ ফর 'আনন্দ বাজাজ' নয় 'অ্যান্ডু বাজাজ'। অ্যান্ডু বাজাজ স্বয়ং না থাকলেও প্রিয়া তার

অস্তিত্ব বয়ে বেড়াচ্ছিলেন ভীষণভাবে। আর.আই.পি অ্যান্ড্রু বাজাজ মানে অ্যান্ড্রু বাজাজের চ্যাপ্টার ক্লোজড্। আর সেটা একমাত্র সম্ভব প্রিয়া ও রিয়ার মৃত্যুতে। গল্পটা যেখান থেকে শুরু হয়েছিল, সেখানেই শেষ হতে যাচ্ছিল। আমি মাঝখানে পড়ে ভেস্তে দিলাম।" অর্ণবের প্রিয়ার শেষ কথাগুলো মনে পড়ে যাচ্ছিল। কী ভয়ঙ্কর বিদ্বেষ ছিল তার আইনের বিরুদ্ধে! সে কথা বলতেই অধিরাজ ফের জানলার দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অস্ফুটে বলল, "ভুল কী বলেছেন? ওর দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখলে সেটাই মনে হওয়া স্বাভাবিক!" - "আমি রেডি।"

মেয়েলি মিষ্টি স্বরে তিনজন পুরুষই সচকিত হয়ে ওঠে। আহেলি চেঞ্জ করে এসেছে। তার পরণে কালো রঙের শিফনের শাড়ি। গম রঙের মসৃণ বাহু দুটি নিরাভরণ, কিন্তু দারুণ অভিজাত। চুল খোলা। বর্ষার জলভরা মেঘের মতো ঘন চুলে খালি একটি সাদা রঙের অর্কিড! চোখদুটোয় বুদ্ধির দীপ্তি চকচক করছে । পানপাতার মতো মুখমন্ডলে প্রজ্ঞা ও শান্তশ্রীর অপূর্ব মিশ্রণ। তার প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই যেন কোথাও বাঁশি বেজে উঠল।

ডঃ চ্যাটার্জীর চোখ ধাঁধিয়ে গেল। তিনি অর্ণবকে ফিসফিস করে বললেন— "এ মেয়েটা যে এত মিষ্টি দেখতে তা আগে জানতে?"

অর্নব ততোধিক চাপা কণ্ঠস্বরে বলল, "ও যে একজন মেয়ে, সেটা এতদিন ধরে জানতেন আপনি!"

ডঃ চ্যাটার্জী ফের চাপা স্বরে 'গরর' করলেন ঠিকই কিন্তু চেপে গেলেন, "যথেষ্ট হয়েছে।" তিনি মুখ গম্ভীর করে বললেন, "আহেলি, কাল সকাল আটটার মধ্যে ঢুকবে। আরেকটা কেস আসছে। রাজারই আন্ডারে পড়বে।"

"সে কী!" অধিরাজ ডঃ চ্যাটার্জীর দিকে অবাক হয়ে তাকায়, "কে বলল? এ.ডি.জি সেন তো বলেননি কিছু!"

"আজ বলেননি। কাল বলবেন।" ডঃ চ্যাটার্জী জানালেন, "তোমাকে একটু রেস্ট দিতে চেয়েছিলেন এ.ডি.জি সেন। কিন্তু উপায় নেই। বত্রিশ বছর আগের একটা আনসলভড্ মাস-মার্ডার মিস্ট্রির কেসফাইল রি-ওপেন্ড হচ্ছে। তখন কেসটা শহরের সবার ঘুম উড়িয়ে দিয়েছিল! মারাত্মক ঘটনা! পুলিস, সি.আই.ডির বাঘা বাঘা অফিসাররাও ফেল

করেছিলেন। তৎকালীন ফরেনসিক এক্সপার্ট রিপোর্টে লিখেছিলেন এরকম ব্রুটাল মার্ডার তিনি সারাজীবনের কেরিয়ারে দেখেননি। সত্যি বলতে কী আমিও দেখিনি। এই কেসটা শহরকে ভয়ে কাপিয়ে দিয়েছিল। অবশ্য তোমার জানার কথা নয়। তখন তো তুমি বোধহয় হামাগুড়ি দিচ্ছ।"

"আজ্ঞে না!" অধিরাজ শুধরে দেয়, "আমার বাবা-মার তখনও বিয়ে হয়নি! আমার হামাগুড়ি দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। আমি ঠিক দু বছর পরে হামাগুড়ি দিয়েছি।"

"ভালো। এখন ফোটো তো! কাল তো ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে এসে কোয়েশ্চেনেয়ার খুলে বসবে। আমি তার প্রস্তুতিটা করে রাখি।"

– "তাহলে আমি কি এ.ডি.জি শিশির সেনের সঙ্গে আজই দেখা করে নেব?" অধিরাজ চিন্তিত মুখে বলে, "আমাকেও তো ডিটেলস্ জানতে হবে।"

– "হ-ত-চ্ছা-ড়া!" ডঃ চ্যাটার্জী দাঁত কিড়মিড় করে একখানা বীকার ঠাঁই করে ছুঁড়ে মারলেন তাকে লক্ষ্য করে, "বেরোও এখান থেকে অসভ্য, পা-য-ণ্ড, ব-ব-র! মেয়েদের খাওয়াতে নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফের এ.ডি.জি সেনের কাছে যাওয়ার তাল করা হচ্ছে। বদমাশ ছোঁড়া কোথাকার!"

অধিরাজ দ্রুত ডাক্ করে সবিস্ময়ে বলল, "আরে! কী করছেন! ডক্.....।"

"আহেলি! এক্ষুনি এই অপদার্থটাকে এখান থেকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাও। নয়তো আমি ল্যাবের সমস্ত টেস্টটিউব-বীকার-বার্ণার ওর মাথাতেই ভাঙব! এ.ডি.জি সেন কি তোমার প্রেমিকা যে এখনই তাঁর মুখ না দেখলে চলছে না তোমার! যেই এ.ডি.জির নাম শুনল, অমনি সব ভুলে সেদিকেই দৌড় মারল ! গর্দভ, রামছাগল কোথাকার!" ডঃ চ্যাটার্জী আবার একটা বীকার ছুঁড়লেন— "ফোটো বলছি। শুঃ... শুঃ...!" -

অধিরাজ কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই তার হাত ধরে টানল আহেলি, "আসুন... শিগ্‌গির চলে আসুন। পরে ঠিক করা যাবে কোথায় যাবেন।"

"কোথাও যাবে না। একদম ডাইরেক্ট চায়না টাউনে যাবে। সেখানে গিয়ে চাউমিন, চাউ চাউ, চিলি চিকেন সব খাবে। এটা আমার অর্ডার! বেরোও এখান থাকে।"

অধিরাজ আর আহেলি প্রায় উর্দ্ধশ্বাসে পালাল সেখান থেকে। এক কথায়, ভ্যানিশ হল!

—"হা-রা-ম-জা-দা!" হাতের টেস্টটিউবটা যথাস্থানে রাখলেন ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ। "এক নম্বরের ত্যাঁদড়! এত কিছু বুঝল, শুধু একটা কথাই বোঝেনি!"

"কী?" অর্ণব কৌতুহলী।

—"প্রিয়া বাজাজের ভালোবাসা মারাত্মক। এবং তার জীবনে ভালোবাসার মানুষ এখন তিনজন নয়, চারজন!" ডঃ চ্যাটার্জী লম্ফঝম্প করে হাঁফিয়ে গিয়েছিলেন। এবার চেয়ারে বসে পড়ে বললেন, "গাধাটা যেটাকে ইনসাল্ট ভাবছে সেটা যে কী তা আমার নিরেট মাথাতেও ঢুকেছে। কিন্তু এই বাঁদরটা বুঝবে না! কেন থেকে থেকে নিজেই 'আই হেট হার', 'আই হেট হার' বলছে, কেন ক্ষেপচুরিয়াস হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে অ্যালিসকে চেপে ধরল, তা বুঝতে গেলে আয়নার সামনে মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। এই গোঁয়ারটা জীবনেও প্রিয়ার শেষ কথাগুলোর মানে বুঝবে না! এ.ডি.জি শিশির সেনই ধ্যান-জ্ঞান-জীবনসর্বস্ব! আর প্রিয়ারই বা কী চয়েস? সব ছেড়ে শেষে এই আকাটটাকেই...!"

অর্ণব দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। তার মনে পড়ে গেল একটা হিন্দি সিনেমার বিখ্যাত গানের লাইন!

"কুছ রিশতোঁ কা নমক্ হি দূরি হোতা হ্যায়/ না মিল্না ভি বহোত জরুরি হোতা হ্যায়....!"

ধুরন্ধর অপরাধী আর দুঁদে পুলিশ অফিসারের সম্পর্ক অনেকটা দাবাখেলার প্রতিযোগীদের মতো। চালের উপর নির্ভর করে, কে জিতবে কে হারবে! এরকমই এক অপরাধের দাবার ছকে জড়িয়ে পড়ছে সবাই...

এক রহস্যময় ফেসবুক প্রোফাইল... মৃত্যুর আগেই হচ্ছে ডেথ ফোরকাস্ট... একমাত্র ক্লু, এক অপূর্ব সুন্দর কৃষ্ণাঙ্গীর ছবি...

শহরে ইতিমধ্যে ঘটে যায় দুই ধনকুবেরের রহস্যময় মৃত্যু। ফরেনসিক বলছে স্বাভাবিক মৃত্যু, তবুও...

তদন্ত বলছে এদের দু'জনেরই জীবনে সম্প্রতি আবির্ভাব ঘটেছিল এক গোপন প্রেমিকার। কে সে?

অনুতাপে দগ্ধ হচ্ছে মেয়েটি... কীসের অনুতাপ? কেন সে ভয় পায় অন্ধকারকে?

চক্রব্যূহে অভিমন্যুর মতো অসংখ্য প্রশ্নের সামনে দাঁড়িয়ে অসহায় অধিরাজ। অদ্ভুত এক দাবাখেলার মতো দুই দিকে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী! অপরাধী ও অধিরাজ! শেষপর্যন্ত কি সমাধান হবে এই হত্যা-রহস্যগুলির? বোঝা যাবে কি খুনের পদ্ধতি? কেই বা খুনী? কেন খুন করছে সে? কীভাবেই বা ফরেনসিক ও সাইবার সেলকে বিভ্রান্ত করছে সে? কী আছে এই খুনীর জটিল মনের কেন্দ্রে?

www.bivapublication.com